২৩ জুলাই ১৯৮৯ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

আনন্দমেলা

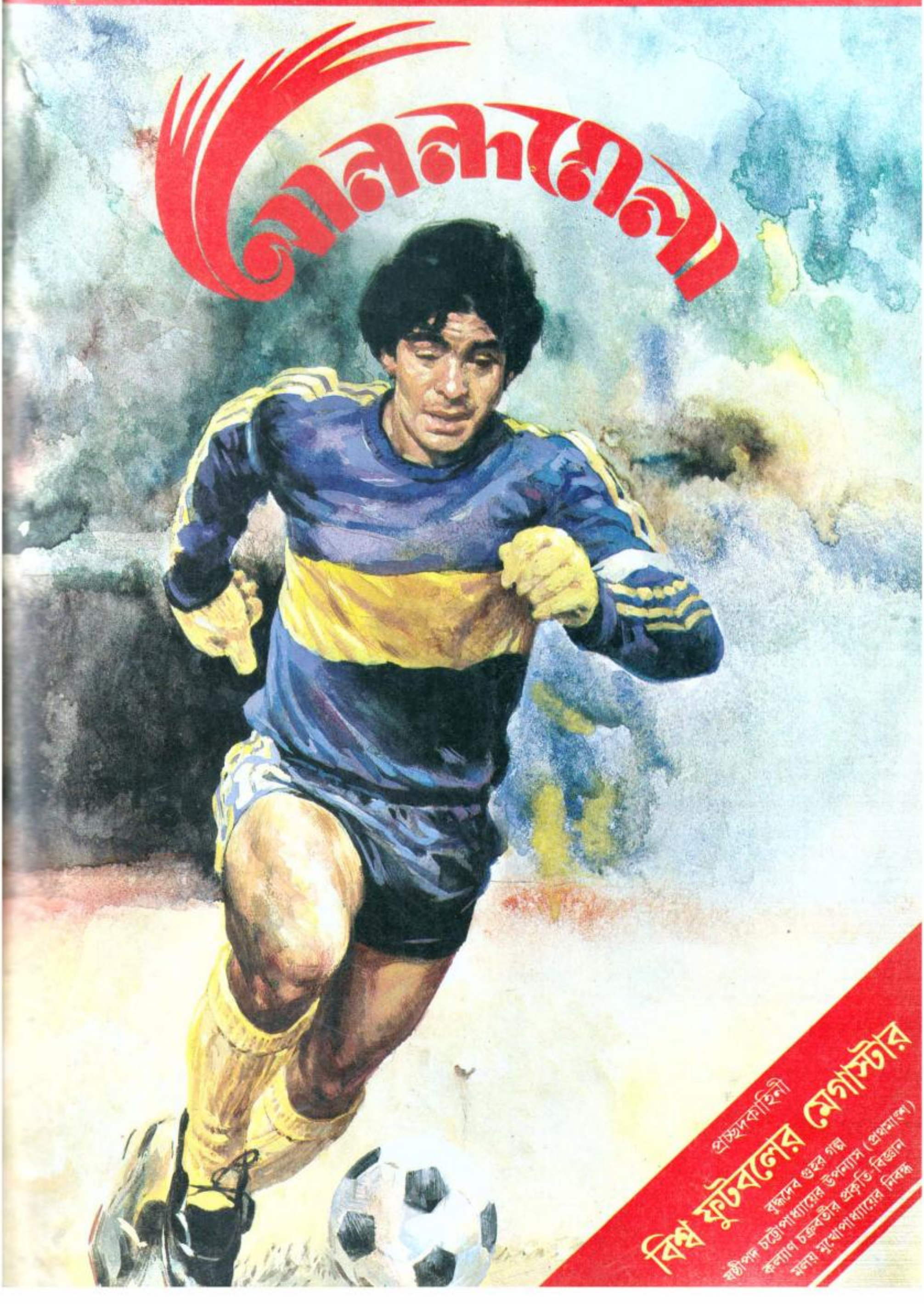

প্রচ্ছদকাহিনী

বিশ্ব ফুটবলের মেগাস্টার

বুদ্ধদেব গুহর গল্প

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস (প্রথমাংশ)

কল্যাণ চক্রবর্তীর প্রকৃতি-বিজ্ঞান

মলয় মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধ

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - বুকলাভার

স্ক্যান করেছেন - বুকলাভার

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

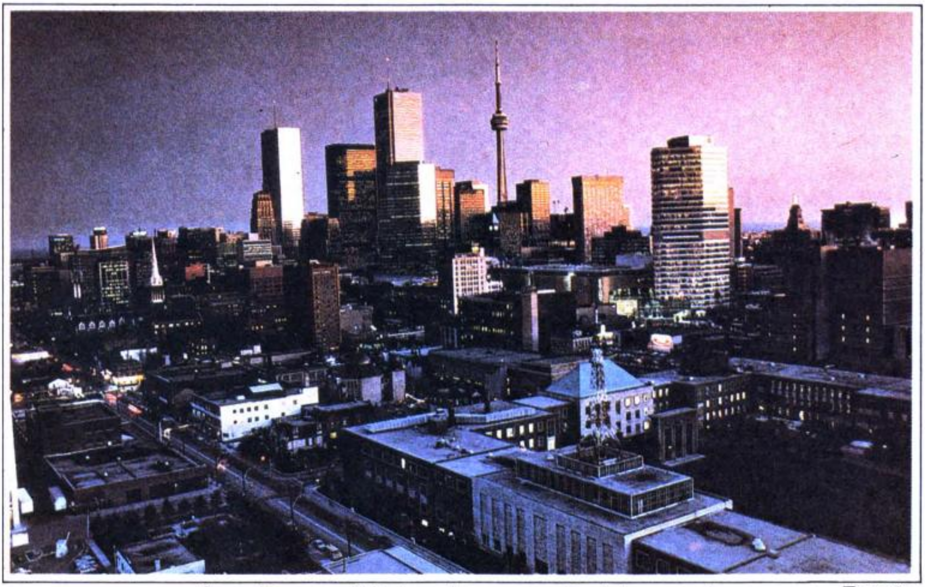

Toronto

Any Bengali living here probably reads
Prabasi Anandabazar every week.

Prabasi Anandabazar was created exclusively
for the Bengalis living abroad.
Every week, we lead our readers to places of great interest.
We give them a complete package of news and features.
With topics ranging from politics to recipes; from
beauty-tips and fashion to literature and sport.
Thirty two pages with offset-printing clarity—
including eight pages in sparkling colour.
We sell the kind of quality that's tried and true.
We give advertisers an exclusive, affluent clientele
and a perfect environment.

Prabasi Anandabazar: The international weekly from The Ananda Bazar Group of Publications.

প্রবাসী আনন্দবাজার

বনি মিক্স ®

নতুন রকমের নিমেষে তৈরীর পরিজ।
শস্যদানা, ফলমূল আর কাজুবাদামের পুষ্টিগুণে ভরপুর আহার।

বনি মিক্স –
গম, ভুট্টা, চাল, নারকেল, আপেল, খেজুর, কিশমিশ আর কাজুবাদামের খাদ্যগুণে ভরা স্বাস্থ্যকর এক সম্পূর্ণ আহার।

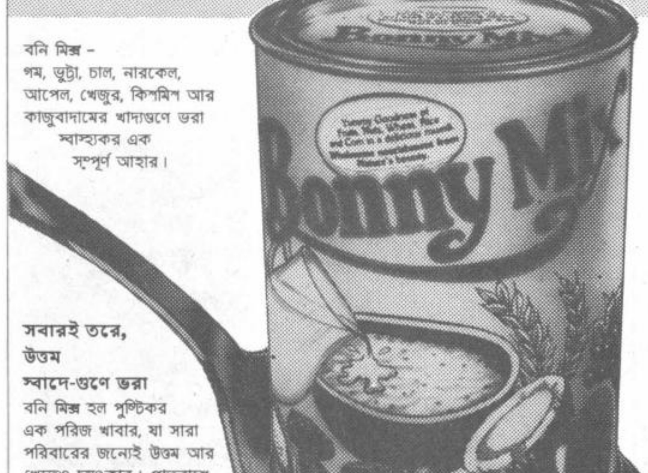

সবারই তরে, উত্তম স্বাদে-গুণে ভরা

বনি মিক্স হল পুষ্টিকর এক পরিজ খাবার, যা সারা পরিবারের জন্যেই উত্তম আর খেতেও চমৎকার। প্রাতরাশে বা স্কুল বা অফিসের সারাদিনের ক্লান্তির পর শরীর-মন চাঙ্গা করতে এক উত্তম ও উপাদেয় আহার। অতি সহজেই হজম হয় বলে এটি বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে আর স্বাস্থ্য ফেরানোর জন্যেও এক আদর্শ খাদ্য।

কয়েক মিনিটেই তৈরী

বনি মিক্স এত চটপট আর সহজেই তৈরী হয় বলে আজকের ব্যস্ত গৃহিণীদের জন্যে এক বরদান স্বরূপ বলা চলে। আপনাকে শুধু করতে হবে কি :

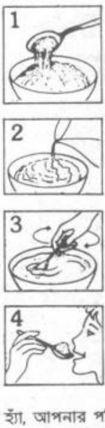

1. একটা কাঁচের বাটিতে প্রয়োজনমত বনি মিক্স ঢালুন।
2. অল্প অল্প করে যথেষ্ট পরিমাণ আগে থেকে ফোটানো দুধ মেশান।
3. আলতো নেড়ে-নেড়ে মিহি ক্রীমওলা মালাইয়ের মত পরিজ বানান।
4. দেখবেন, আপনার পরিবারের সকলে আহলাদে চেটেপুটে খাবে চামচ ভরে-ভরে।

হ্যাঁ, আপনার পরিবারের সবারই জন্যে স্বাদ ও পুষ্টির আশ্চর্য সমন্বয়গুণে ভরা এক নতুন জগতের আশ্চর্য খাবার দিন এনে। ওদের নিয়মিত দিন – বনি মিক্স!

বনি মিক্স ®

ভারতে এই সর্বপ্রথম!

প্রস্তুতকারকঃ গ্লিন্ডিয়া লিঃ (পূর্বকালীন গ্ল্যাক্সো)

সারা পরিবারের পুষ্টিকর আহারে সবচেয়ে বিশ্বস্ত নাম।

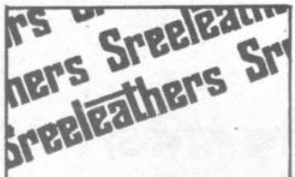

বাবু বিবি ছুট্‌ফটে
খেয়ালী ও মজারু
বুদ্ধিমান প্রমাণ করে
পিঠে রেখে ক্যাঙারু

Kangaroo
School Bag,

- ওয়াটার প্রুফ
- শক্তপোক্ত
- সুন্দর দেখতে
- টেকসই
- টিফিন বক্স আর ওয়াটার বট্‌লের জন্য দু'টি আলাদা পকেট

A Quality Product of—
Sreeleathers
3, Lindsay Street, Calcutta-700 087
Phone : 29-9611

Sanchar

For trade enquiries write to :
SANCHAR
MEDIA COMMUNICATIONNETWORK
6A, Metropolitan Bldg
7, J. L. Nehru Road CAL-13 Tel: 28-8268

আনন্দমেলা

সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)

গোয়েন্দা তাতারের দ্বিতীয় অভিযান
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৭০

গল্প

অজগরের দেশে বুদ্ধদেব গুহ ১৪

কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী

মহাকাশ-দৈত্য, একটি স্বপ্ন ও বিজ্ঞানের ক্লাস
সতীশ অগ্নিহোত্রী ৬১

প্রচ্ছদকাহিনী

বিশ্ব ফুটবলের মেগাস্টার রাতুল ঘোষ ৩৬

ধারাবাহিক উপন্যাস

উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৭
ঝিন্নির খই, লাল বাতাসা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৫

স্বদেশ ও সংস্কৃতি

পুরুলিয়ার ছো-নাচ শান্তি সিংহ ১১

প্রকৃতিবিজ্ঞান

বাঘ কী করে গোনা হয় কল্যাণ চক্রবর্তী ২৫

এই দেশ এই বিশ্ব

বেশি বৃষ্টির গ্রাম মৌসিনরাম মলয় মুখোপাধ্যায় ৩২

কবিতা

নাম দিতে চাই সুদেব বক্সী ২১
কই সে বালক আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১

কমিক্‌স

টারজান ৩১, রোভার্সের রয় ৫৯, গাবলু ৬৯, টিনটিন ৮৭
পঙ্করাজ ৮৯

কেরিয়ার গাইড

ডিফেন্স সার্ভিসে যেতে হলে অমর দাশ ২২

বিদ্যালয়-পরিচিতি

জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল নীরদ রায় ৮৫

খেলাধুলো

স্টেফি গ্রাফ ৪৯
মার্কো ভ্যান বাস্তেন ৫০
রুড গুলিট ৫২
মাঝমাঠের লড়াই গৌতম সরকার ৫৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিচাপাটি ৬, কে প্রথম ১০, আবিষ্কারের নেপথ্যে ২৯, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৫৪, শব্দসন্ধান ৬৭, আকাশে ওড়ার কথা ৮৩, কুইজ ৯১, নানারকম ৯৬, বইয়ের খবর ৯৮

প্রচ্ছদ

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ প্রবীর সেন, দেবাশিস সেনগুপ্ত

১১

পুরুলিয়ার ছো-নাচের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। মুখোশ পরে নৃত্যশিল্পীরা যখন খোলা আকাশের নীচে কিংবা মঞ্চে নাচেন, তখন তাঁদের নাচের ছন্দে ও ব্যঞ্জনায় সৃষ্টি হয় অপূর্ব এক শিল্পকলা। এ

৩৬

এখন ফুটবলের মরসুম। কলকাতার মাঠে-ময়দানে যখন দর্শকরা ভিড় করছেন তাঁদের প্রিয় খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখার জন্য, তখন বিদেশের নানা প্রান্তে জমে উঠেছে বিশ্বকাপ ফুটবলের কোয়ালিফাইং রাউন্ডের খেলা। ফুটবলের তারকারা এইসব খেলায় অংশ নিচ্ছেন। এবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে অতীত ও বর্তমানের এরকমই কয়েকজন তারকার কথা আলোচনা করা হয়েছে। আলফ্রেডো ডি স্তেফানো থেকে শুরু করে মারাদোনা— অনেকেই স্বমহিমায় জায়গা করে নিয়েছেন এই আলোচনায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার। দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

এমন এক নাচ, যার সঙ্গে আর কোনও কিছুরই তুলনা চলে না। নাচের আসরে বসে মুগ্ধ হয়ে শুধু নৃত্যশিল্পীদের তারিফ করতে হয়। একটি নিবন্ধ।

২৫

বাঘকে কে না ভয় পায়? তার ওপর আবার সুন্দরবনের বাঘ, মানুষখেকো বলে যাকে সবাই এক ডাকে চেনে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বাঘ গোনা হয় কী করে। গোনার প্রয়োজনই বা কী! কারণ যা'ই থাক, বাঘ গোনার ব্যাপারটি অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। এই রোমাঞ্চেরই কিছুটা পরিচয় দেওয়া হয়েছে একটি নিবন্ধে।

১৪

ঋজুদা বলল, "জানো, মাঝে-মাঝেই ভাবি, প্রকৃতি বড় সুন্দর। কিন্তু মানুষও কম সুন্দর নয়।" বুদ্ধদেব গুহর গল্প 'অজগরের দেশে'।

৩২

এক সময় চেরাপুঞ্জিতেই সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হত। আর এখন চেরাপুঞ্জির কাছে মৌসিনরাম গ্রাম পেয়েছে বৃষ্টির দেবতার অকৃপণ স্নেহ। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় যে গ্রামে, সেই মৌসিনরামের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনজীবনের কথা লেখা হয়েছে একটি নিবন্ধে। ছোট এই গ্রামটি এখন সারা বিশ্বের নজর কেড়ে নিয়েছে।

আগামী সংখ্যায়

স্বপ্নাতীত সরকার ও গৌতম চক্রবর্তীর প্রচ্ছদকাহিনী

মাইকেল জ্যাকসন

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্প

জ্যোৎস্নারাতের বিপদ-আপদ

সলিল লাহিড়ীর বিজ্ঞান-নিবন্ধ

মহাকাশ-দূষণ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস (শেষাংশ)

গোয়েন্দা তাতারের দ্বিতীয় অভিযান

বরিস বেকারের পোস্টার

Disproportionate Returns for SMALL INVESTMENTS & What more & Old age Pension too.

INVEST in your CHILD'S STUDIES.

In doing so:

1) You have done your duty to your child.
2) You have assured him good future too.
3) You have insured your future too.

What steps You have to take?

ADMISSION TO TURNING POINT SCHOOL

Can be a TURNING POINT in the life of your child.

* **An Exclusively English Medium Boarding School**

Admission open from Class I to VII.
One class will be added each year till Class X.
(CBSE syllabus)
It is a SCHOOL Sponsored & run by

LINKMAN INSTITUTE

52/B Rash Behari Ave Jn.
(Lane opp. Gurudwara)
Calcutta 700 026
Mon-Sat: 6 am—8 pm. Sun: 12 noon—6 pm

Enquiries: Phone: 46-5137.

* The School is within greater Calcutta.

চ্যাপলিন বলেছিলেন, কাজ করার নামই বাঁচা

'আনন্দমেলা'র ৩১ মে সংখ্যায় চার্লি চ্যাপলিনকে নিয়ে লেখা প্রচ্ছদকাহিনীর দু'টি নিবন্ধই পড়লাম। খুব ভাল লাগল। ছেলেবেলা থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে চার্লির বড় হওয়ার কাহিনী জানতে পারলাম। তাঁর জীবনপঞ্জী থেকেও এই অসামান্য প্রতিভাধর মানুষটির সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য জানা গেল। তিনি একবার বলেছিলেন, "কাজ করার নামই বাঁচা। আমি বাঁচতে ভালবাসি।" কাজের মধ্যে দিয়েই তিনি বেঁচে ছিলেন এবং তাঁর কাজের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন চিরকাল। জন্মশতবর্ষে তাঁকে জানাই আমার গভীর শ্রদ্ধা।

সুপ্রতিম সরকার
কাঁকুলিয়া রোড, কলকাতা-২৯

আমি নিয়মিত 'আনন্দমেলা' পড়ি। ৩১ মে সংখ্যায় অনিরুদ্ধ ধরের লেখা প্রচ্ছদকাহিনী 'অদ্বিতীয় চার্লি' পড়ে খুব ভাল লাগল। লেখককে ধন্যবাদ জানাই। চার্লির জীবনপঞ্জী পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি।

রাজকুমার সরকার
মোক, ধানবাদ

'আনন্দমেলা'য় চার্লি চ্যাপলিন-সংক্রান্ত দু'টি লেখাই অসাধারণত্বের দাবি করতে পারে। মঞ্চ-গায়িকা লিলির পুত্র চ্যাপলিন বলতে গেলে আকস্মিকভাবেই চলে এসেছিলেন চলচ্চিত্রজগতে এবং সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেছেন। চার্লির জীবনের অনেক কিছুই পরবর্তীকালে তিনি নিজে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছিলেন। তাঁর জীবনে একটাই দুঃখ ছিল যে, তাঁর মা ছেলের অসামান্য খ্যাতি দেখে যেতে পারেননি। চরম দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার সঙ্গে লড়াই করে কীভাবে এক কিশোর বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা হয়ে উঠলেন—সেটা এক আশ্চর্যের বিষয়। চার্লির জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা কিশোরদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। হাসির ভেতরে যে অনেক সময় বেদনা লুকিয়ে থাকে, তা চার্লি-অভিনীত চলচ্চিত্রগুলি না দেখলে বোঝা যায় না। ভাবতে অবাক লাগে, সারা পৃথিবীকে সারা জীবন যিনি হাসিয়ে গিয়েছেন, এখনও যিনি হাসাচ্ছেন, তাঁর জীবনের প্রথম ভাগ কত দুঃখে কেটেছে! 'আনন্দমেলা'কে ধন্যবাদ, এই পৃথিবীবিখ্যাত মানুষটিকে নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনী করবার জন্য।

অশোককুমার কুণ্ডু, কলকাতা-২৫

চার্লি চ্যাপলিন বিষয়ে অনিরুদ্ধ ধর ও সুব্রত ঘোষের লেখা পড়ে ভাল লাগল। অনেক অজানা বিষয় জানতে পারলাম।

সঞ্জীবকুমার দে
টাকি রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়

চার্লি চ্যাপলিন সম্বন্ধে লেখা দু'টি (৩১ মে সংখ্যায়) বেশ মনোগ্রাহী, তবুও আরও কিছু যেন বাকি থাকল। চার্লিকে নিয়ে আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই। অনিরুদ্ধ ধরের লেখায় চার্লির শৈশবকাল সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছি তাতে মন ভরানো গেল না। তবে সুব্রত ঘোষের লেখায় দু' একটা টুকরো ঘটনা বেশ চিত্তাকর্ষক। অবশ্য তাঁর কর্মজগৎ সম্বন্ধে অনিরুদ্ধ ধরের লেখাটি বেশ ভাল লেগেছে। চার্লির চলচ্চিত্রে প্রবেশের সময়টা আরও একটু বিশদভাবে লিখলে ভাল লাগত।

রুবি পাল
বারাসাত, ২৪ পরগনা (উত্তর)

আনন্দমেলা
গ্রাহকদের জন্য বিশেষ ছাড়
এক বৎসর — ১৮২·০০ টাকার পরিবর্তে ১৫৫·০০ টাকা (২৬ সংখ্যা)
দুই বৎসর — ৩৫৪·০০ টাকার পরিবর্তে ৩০০·০০ টাকা (৫২ সংখ্যা)
আপনি যদি গ্রাহক হতে ইচ্ছুক হন তবে সত্বর আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় ড্রাফ্‌ট আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের নামে নিচের ঠিকানায় পাঠান :
সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১
ডাক মাশুল লাগবে না

গোপাল হালদার

'আনন্দমেলা' ১৪ জুন সংখ্যায় গোপাল হালদারের বিষয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে কিছু ভুল আছে। গোপাল হালদার কলকাতা ছেড়ে পাটনা চলে যাননি। গোপাল হালদার বা অরুণা হালদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রতিবেদক বারিদবরণ ঘোষ যে তথ্য সংগ্রহ করেননি এটা স্পষ্ট। দ্বিতীয় ভুল, 'রূপনারায়ণের কূলে' নয়, উনি জন্মেছেন অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা-বিক্রমপুরের বিদগাঁও-এ।

দীপেন রায়
কলকাতা-৯

বারিদবরণ ঘোষের উত্তর : আমার খবরে সত্যিই কিছু ভুল থেকে গেছে। যে সূত্রটি থেকে ওই সংবাদটি পেয়েছিলাম তা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না বুঝতে পারছি। আমি দুঃখিত।

সবচেয়ে ছোট মাপের লেমুর

গৌতম ঘোষদস্তিদারের 'লুপ্তপ্রায় লেমুর' প্রচ্ছদকাহিনী খুব ভাল লেগেছে। তবে এক জায়গায় দেখলাম, সবচেয়ে ছোট মাপের লেমুরের ওজন তিন আউন্সেরও কম। আমি যতদূর জানি, ওদের সর্বনিম্ন ওজন প্রায় চার আউন্স।

সানজু দেওয়ান
কলকাতা-২

ম্যাসকিন-এর নাম নেই কেন

'লুপ্তপ্রায় লেমুর' প্রচ্ছদকাহিনীতে ম্যাসকিন জাতের লেমুরের কথা উল্লেখ করা হয়নি। মাদাগাস্কার দ্বীপেই এদের বাস। লেমুর জাতির মধ্যে ম্যাসকিন জাতির লেমুররাই সংখ্যায় সবচেয়ে কম।

অভীক চক্রবর্তী
রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন

উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মহামন্ত্রী জীবককে কারাগারে নিক্ষেপ করে মহারাজ মহাচূড়ামণি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে গেলেন। তিনি জাগালেন পরদিন বিকেলে। এর মধ্যে যে কত কাণ্ড ঘটে গেল, তার কিছুই তিনি টের পেলেন না। সকালবেলা রাজকুমার দু'জন চলে গেল অস্ত্রশিক্ষা করতে। রানি তলতাদেবী স্নান সেরে নিয়ে কিছুক্ষণ দেবতাদের পূজা করলেন। তারপর তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে নেমে এলেন উদ্যানে।

এই উদ্যানের এক কোণে আশ্রয় নিয়েছে শিল্পী জয়পাল। এর মধ্যেই সে একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে নিয়েছে। একটা বড় পাথরের চাঁই কেটে কেটে সে বানাতে শুরু করেছে রানির মূর্তি।

তলতাদেবী সেখানে এসে একটুক্ষণ দাঁড়ালেন। এ-রাজ্যের যে-কোনও প্রজাই রানিকে দেখলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে। কিন্তু শিল্পী জয়পাল নিজের কাজে এমনই নিমগ্ন যে, সে মুখ ফিরিয়ে রানিকে একবার দেখল বটে, কিন্তু কাজ থামাল না।

রানি একটু হাসলেন।

তারপর তিনি বললেন, "শিল্পী জয়পাল, তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। শব্দ বন্ধ করে একবার একটু শোনো।"

জয়পাল পাথরের ওপর লোহার বাটালি রেখে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকছিল। লোহা আর পাথরের সংঘর্ষে মাঝে-মাঝে ফুলকি দিয়ে উঠছে আগুন। শব্দও হচ্ছে খুব।

কাজ থামিয়ে অবাকভাবে সে বলল, "কী আজ্ঞা, মহারানি?"

তলতাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এই পাথর কেটে কার মূর্তি গড়ছ?"

জয়পাল বলল, "কেন, আপনার? ভুরুঙ্গা গ্রামে বসে আমি আপনারই মূর্তি গড়ছিলাম। আগুনে সেটা নষ্ট হয়ে গেল। এবার, এখানে আপনার আশ্রয়ে বসে আরও সুন্দর মূর্তি গড়ব।"

রানি তলতাদেবী বললেন, "তুমি আমার মূর্তি গড়ছ কেন?"

জয়পাল এবার খানিকটা যেন ধাঁধায় পড়ে গেল। আমতা-আমতা করে বলল, "আপনার মূর্তি গড়ছি, কারণ, আপনি এই রাজ্যের মহারানি, আপনাকে একবার দেখেই আমার মনে হয়েছিল, আপনার খুব সুন্দর একটা মূর্তি গড়িয়ে রাখলে প্রজারা সবাই দেখবে।"

রানি তলতাদেবী বললেন, "আমার বদলে তুমি দেবতাদের মূর্তি গড়ছ না কেন? মানুষের মূর্তি দিয়ে কী হবে? দেবতাদের মূর্তি গড়লে প্রজারা তা পূজা করতে পারবে?"

জয়পাল বলল, "দেবতাদের মূর্তি? কোন দেবতার মূর্তি?"

রানি বললেন, "ইন্দ্র, মহাদেব, বিষ্ণু এইসব দেবতার মূর্তি বানাতে পারো।"

জয়পাল বলল, "মহারানি, সেই দেবতাদের তো কখনও আমি চোখে দেখিনি। কী করে তাদের মূর্তি বানাব?"

রানি বললেন, "দেবতাদের কি সামনাসামনি কখনও চোখে দেখা যায়? দেবতাদের দেখতে হয় মনের চোখ দিয়ে। কল্পনায়। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুর মূর্তি তুমি কল্পনা করতে পারো না? কিংবা বাঘছাল-পরা শিব?"

জয়পাল বলল, "নাঃ, ওসব আমার দ্বারা হবে না। বানিয়ে বানিয়ে দেবতাদের মূর্তি গড়ে, এমন শিল্পী অনেক আছে। আমি ওসব পারি না।"

রানি বললেন, "ঠিক আছে, তুমি যদি চোখে দেখে মানুষেরই মূর্তি গড়তে চাও, তা হলে আগে মহারাজের মূর্তি গড়োনি কেন?"

জয়পাল এ-প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারল না। চুপ করে রইল।

রানি আবার বললেন, "মহারাজের মূর্তি আগে না গড়ে তুমি আমার মূর্তি গড়তে পারো না। সেটা অন্যায়?"

জয়পাল একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নোখ খুঁটতে-খুঁটতে লাজুকভাবে বলল, "ন্যায়-অন্যায়ের কথা চিন্তাই করিনি, মহারানি। আমি তো টাকা-পয়সার জন্য মূর্তি গড়ি না। আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল..."

রানি এবার দৃঢ় গলায় বললেন, "আগে তুমি মহারাজের মূর্তি গড়ায় মন দাও। খুব সুন্দর করে, খুব বড় করে মহারাজের একটা মূর্তি বানাও। মহারাজকে আগে কিছু জানানো হবে না। কাজটা শেষ হলে হঠাৎ একদিন মহারাজকে চমকে দিতে হবে। সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে নগরের ঠিক মাঝখানে।"

এই কথা বলে রানি তলতাদেবী পেছন দিকে ফিরতেই দেখতে পেলেন, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন রাজ পুরোহিত ছন্তী।

তলতাদেবী এগিয়ে গিয়ে রাজ পুরোহিতের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন।

ছন্তী হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন রানিকে। তারপর হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, "ওই শিল্পী মহারানির মূর্তি গড়ছিল, তাকে নিষেধ করলেন কেন?"

তলতাদেবী বললেন, "আগে মহারাজের মূর্তি হবে। এই শিল্পী যদি মহারাজের মূর্তি খুব সুন্দরভাবে গড়তে না পারে, তা হলে এখানে ওর স্থান হবে না। আমার মূর্তি গড়ার কোনও প্রয়োজন নেই এখন।"

রাজপুরোহিত ছন্তী দু'বার মাথা নাড়লেন। তারপর একটু দূরে সরে গিয়ে একটি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মহারাজ নাকি কাল রাত্তিরে খুব রাগারাগি করছিলেন?"

তলতাদেবী বললেন, "হ্যাঁ, তিনি কোনও কারণে আমার ওপরে রেগে গিয়েছিলেন।"

একদিকের ভুরু তুলে তিনি বললেন, "আপনার ওপরে? শুনলাম, তিনি মহামন্ত্রী জীবককে প্রহার করে কারাগারে পাঠিয়েছেন?"

তলতাদেবী মৃদু কণ্ঠে বললেন, "মহামন্ত্রী মিথ্যে কথা বলেছিলেন মহারাজের কাছে। তাই মহারাজ ওঁর ওপর খুব ক্রুদ্ধ হয়েছেন।"

রাজপুরোহিত ছন্তী মহারানির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন, "সেনাপতি চম্পককে মহারাজ তাড়িয়ে দিয়েছেন। মহামন্ত্রী জীবককে প্রাণদণ্ড দিয়েছেন। এই রাজ্যে এই মুহূর্তে সেনাপতিও নেই, মন্ত্রীও নেই।"

তলতাদেবী বললেন, "সেনাপতি চম্পককে আমি অভয় দিয়েছি। তাকে বলেছি, কয়েকদিনের জন্য গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে।

এবার এল
সেরা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য হালফ্যাশনের স্ট্রাইপড্ ১০০% সুতী
আপনার ত্বককে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে বাছাই করা স্ট্রাইপড্ ১০০% সুতীর
belle
পালোমা
প্যান্টি
অভিনব, নরম স্ট্রাইপড্ ১০০% সুতীর কাপড়
সূক্ষ্মতম সুতীতে বোনা—তাই যেমন নরম—পরেও তেমন আরাম। আপনার ত্বককে দেবে স্বাচ্ছন্দ্য—দেখতেও দারুণ।
পা ও কোমর ঘিরে ইলাসটিকের স্বাচ্ছন্দ্য
এই কাজকরা, নরম ইলাসটিক দেখতেও ভালো—পরতেও ভালো। পরে দেখুন, মাপও একেবারে ঠিকঠাক।
মেয়েদের গঠন অনুযায়ী সুন্দর, আধুনিক কাট
এই প্যান্টি আপনার শরীরের আকার নেবে। বেশী আঁটো বা বেশী ঢিলে হবে না। চলতে ফিরতে কত আরাম!
দাম মাত্র ১৬ টাকা
বেল মানেই ভালো জিনিষ, ঠিক দাম
বাছাই করা সেরা উপাদান, বিদেশী মেশিনে সেলাই করা—বেল্ পালোমা প্যান্টি যেমন আরামদায়ক তেমন টেকসই।
পালোমা স্ট্রাইপ্স—১৬/-
পালোমা রিবড—১৪/-
পালোমা ডোরি—১১/-
যে সব কমিশন এজেন্ট/রিটেলাররা আমাদের সেরা মানের জনপ্রিয় অন্তর্বাস বিক্রী করতে চান, তাঁদের আমরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। এ ছাড়াও কলকাতার বড়বাজারে পাইকারী হারে পাওয়া যায়।
Belle Wears Private Ltd
54B Suburban School Road
Calcutta 700 025
Phone : 48-3708
belle
দেখতে ভালো, পরতে ভালো, মন ভরালো বেল্
Paloma

মহারাজের রাগ বেশিদিন থাকে না। রাগ পড়ে গেলেই আমি মহারাজকে বুঝিয়ে বলব। তিনি তখন চম্পককে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নেবেন। চম্পক খুবই যোগ্য সেনাপতি।"

রাজপুরোহিত ছন্তী বললেন, "হুঁ!"

তলতাদেবী বললেন, "অল্প দোষে মহারাজ বেশি শাস্তি দিয়ে ফেলেন। মহামন্ত্রীকে তিনি শূলে চড়াবার আদেশ দিয়েছেন। মহারাজ তো এখন ঘুমোচ্ছেন। তাঁর ঘুম ভাঙলে আপনি আর আমি দু'জনে মিলে অনুরোধ করলে তিনি নিশ্চয়ই মহামন্ত্রীকে ক্ষমা করে দেবেন।"

রাজপুরোহিত ছন্তী বললেন, "মহামন্ত্রী আর সে সুযোগ পাবেন না। তিনি আর বেঁচে নেই।"

দারুণ চমকে গিয়ে তলতাদেবী বললেন, "অ্যাঁ? এ কী বলছেন আপনি? মহামন্ত্রী জীবক বেঁচে নেই?"

ছন্তী দু' দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "সেই সংবাদ শুনেই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আজ ভোরেই কারাগারের মধ্যে কেউ মহামন্ত্রীর গলা টিপে হত্যা করেছে। আমি নিজে দেখে এসেছি তাঁর মৃতদেহ। অবশ্য এমনও হতে পারে, লজ্জায়, দুঃখে মহামন্ত্রী নিজেই আত্মহত্যা করেছেন।"

অবিশ্বাসের সুরে তলতাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, "নিজের গলা টিপে কেউ কি আত্মহত্যা করতে পারে? না, তা সম্ভব না।"

ছন্তী বললেন, "তা হলে নিশ্চিত কোনও অপদেবতার হাতে মহামন্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর মুখে অস্বাভাবিক ভয়ের চিহ্ন দেখেছি।"

তলতাদেবী আবার অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "অপদেবতা?"

তলতাদেবী ভুরু কুঁচকে ভাবলেন, রাজপুরোহিত যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই মহামন্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এ-ঘটনা ছন্তী তাঁর আগে জানলেন কী করে? মহারাজ যখন ঘুমন্ত থাকেন, তখন রাজ্যের সব ঘটনা আগে মহারানিকেই জানানো হয়।

ছন্তী বললেন, "আরও একটা দুঃসংবাদ আপনাকে জানাতে এসেছি, মহারানি।"

তলতাদেবী মুখ তুলে উদ্বিগ্ন চোখে তাকালেন।

ছন্তী বললেন, "সেনাপতি চম্পককে আপনি একটা গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে বলেছিলেন, সে সেই গ্রামে নেই। আমার গুপ্তচরেরা পাকা খবর নিয়ে এসেছে।"

তলতাদেবী বললেন, "চম্পক সেখানে নেই? তা হলে সে কোথায় আছে?"

ছন্তী বললেন, "সে একটা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। মহারাজ তাকে জুতো পরাবার কাজ দিতে চেয়েছিলেন বলে সে দারুণ অপমানিত বোধ করেছে। সেও তো উচ্চ বংশের সন্তান। শোনা যাচ্ছে, সে একটা দলবল জুটিয়ে মহারাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।"

তলতাদেবী দারুণ হতাশভাবে চেয়ে রইলেন রাজপুরোহিতের দিকে।

ছন্তী বললেন, "এর ফলাফল কী হবে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মহারানি? চম্পকও আত্মহত্যা করতে চলেছে। এই বিদ্রোহের সংবাদ পেলেই মহারাজ দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন। সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে পড়বেন যুদ্ধযাত্রায়। মহারাজ যুদ্ধ করতে ভালবাসেন। সামান্য-কিছু সৈন্য নিয়ে চম্পক মহারাজ মহাচূড়ামণির বিরুদ্ধে লড়াই করে কতক্ষণ টিকতে পারবে? চম্পকের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে মহারাজ ফিরে আসবেন রাজধানীতে। এ-দৃশ্য আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আহা, চম্পক ছেলেটি বড় ভাল ছিল!"

তলতাদেবী ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, "চম্পককে বাঁচাবার কোনও উপায়ই কি নেই?"

রাজপুরোহিত ছন্তী কয়েকবার নিঃশব্দে পদচারণা করলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "চম্পককে একমাত্র আপনিই রক্ষা করতে পারেন।"

তলতাদেবী বললেন, "আমি? আমি এই অবস্থায় কী করে তাকে বাঁচাব?"

ছন্তী বললেন, "চম্পক আপনাকে শ্রদ্ধা করে। আপনার কথা মানে। সে যে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে, তা অশ্বারোহণে মাত্র দু' ঘণ্টার পথ। মহারাজের ঘুম ভাঙার আগেই আপনি যদি সেখানে গিয়ে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেন, তা হলেই সে প্রাণে বাঁচতে পারে।"

তলতাদেবী বললেন, "চম্পক আমার কথা শুনবে কি না জানি

না। তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু আমি ফিরে আসার আগেই যদি মহারাজ জেগে ওঠেন ?"

ছন্তী বললেন, "মহারাজ কাল অনেক রাতে ঘুমিয়েছেন। আজ সন্ধ্যার আগে তাঁর জেগে ওঠার সম্ভাবনা খুবই কম। তবু যদি দৈবাৎ জেগে ওঠেন, আমি তাঁকে ভুলিয়ে রাখব।"

তলতাদেবী তবু দ্বিধার সঙ্গে বললেন, "আমি একা যাব চম্পকের কাছে ?"

ছন্তী বললেন, "আপনি সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে নিয়ে গেলে চম্পক সন্দেহ করবে। সে সহজে ধরা দেবে না। আগেই যুদ্ধ লেগে যাবে। তাতে কোনও লাভ নেই। আপনি বড়জোর আপনার দু-চারজন নারী দেহরক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। আর-একজন গুপ্তচর আপনার পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আপনি আর দেরি করবেন না, মহারানি। আপনাকে কিন্তু যেতে হবে খুব গোপনে।"

তলতাদেবী একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই। চম্পক বিদ্রোহ করলে মহাচূড়ামণির হাতে সে নিহত হবেই। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর অনেকেই চম্পককে খুব ভালবাসে। বিদ্রোহের আগুন একবার জ্বলে উঠলে সহজে থামবে না। তা ছাড়া চম্পকের কোনও দোষ ছিল না। বিপদের সময় সে রাজাকে জুতো পরিয়ে দিতে গিয়েছিল, সেটা তো কিছু অন্যায় নয়।

চলে যেতে উদ্যত হয়েও তলতাদেবী ফিরে দাঁড়ালেন।

দ্বিধার সঙ্গে বললেন, "কিন্তু যদি মহারাজের ঘুম ভেঙে যায়, যদি তিনি জানতে পারেন যে আমি চম্পকের সঙ্গে দেখা করতে গেছি, তা হলে তিনি ভাবতে পারেন যে আমিও বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছি ?"

হা-হা করে প্রবলভাবে হেসে উঠে ছন্তী বললেন, "এ কী কথা বলছেন, মহারানি ? মহারাজ মহাচূড়ামণি সন্দেহ করবেন আপনাকে ? তিনি আপনাকে অবিশ্বাস করবেন ? তা কখনও হতে পারে ? আপনি এই রাজ্যের সৌভাগ্যলক্ষ্মী। আপনার বুদ্ধিতেই তো এই রাজ্য চলে। আপনি যা-কিছু করবেন, তা সবই এই রাজ্যের মঙ্গলের জন্য। মহারাজ কি তা বোঝেন না ?"

তলতাদেবী আর দেরি করলেন না। তিনি দ্রুত চলে গেলেন প্রস্তুত হবার জন্য।

অল্পক্ষণ পরেই চারজন নারী-রক্ষী সঙ্গে নিয়ে অশ্বারোহণে যাত্রা করলেন তলতাদেবী। রওনা হবার আগে তিনি ছন্তীকে আবার প্রণাম করে বললেন, "গুরুদেব, আশীর্বাদ করুন যেন সার্থক হয়ে শীঘ্র ফিরে আসতে পারি।"

রাজপুরোহিত ছন্তী তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন, "আপনি অবশ্যই সার্থক হবেন। আপনি সর্বত্র জয়ী হবেন।"

তলতাদেবী চলে যাবার পর ছন্তী কিছুক্ষণ একা একা ঘুরতে লাগলেন রাজ-উদ্যানে। তাঁর মুখে খুশির আভা।

এক জায়গায় রাজকুমার দৃঢ় আর তীক্ষ্ণ অস্ত্রশিক্ষা করছে। ছন্তী একটুক্ষণ দেখলেন ওদের। এক সময় তিনি ছোটকুমার তীক্ষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করলেন।

ছন্তী বিবাহ করেননি। এই দুই রাজকুমারকে তিনি নিজের সন্তানের মতো ভালবাসেন। (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

কে প্রথম

জলপথে ভূপ্রদক্ষিণ

জলপথে প্রথম একা ভূপ্রদক্ষিণ করেন কানাডার জশুয়া স্লোকাম, তাঁর 'স্প্রে' নামে ৩৬ ফুট লম্বা সুলুপে। স্লোকামের বয়স তখন ৫১ বছর। সুলুপটি তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু এমন জীর্ণ অবস্থায় যে, প্রকৃতপক্ষে এটি তাঁকে নতুন করে তৈরি করে নিতে হয়।

১৮৯৫ সালের ২ এপ্রিল ম্যাসাচুসেট্‌সের বস্টন থেকে রওনা হয়ে তিনি প্রথমে পুব দিকে গিয়ে আজোরস্ এবং জিব্রালটারে পৌঁছে সুলুপটি মেরামত করে নেন। আগে সুয়েজ খাল দিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকলেও পরে মত বদলে আবার অতলান্তিক পার হয়ে ব্রাজিলের পাবনামবাকোতে পৌঁছে গেলেন।

উরুগুয়ের উপকূলে চড়ায় আটকে গেলে সুলুপ ভাসিয়ে তুলতে যখন জলে ঝাঁপ দিলেন তখন তাঁর মনেই ছিল না যে, তিনি সাঁতার জানেন না। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে ম্যাগেলন প্রণালী পার হয়ে সুলুপ নোঙর করলেন শত্রুভাবাপন্ন ইন্ডিয়ানদের এলাকায়। ইন্ডিয়ানরা সুলুপে হানা দেবার চেষ্টা করলে স্লোকাম ডেকের ওপর পেরেক ছড়িয়ে দিলেন। পেরেকের খোঁচায় অতিষ্ঠ হয়ে হানাদাররা পালাল। নিরুপদ্রবে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে তিনি সামোয়ায় পৌঁছে গেলেন, সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে। অতঃপর ধীরেসুস্থে ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে। কয়েক মাস বিশ্রাম নিয়ে ফিরতি পথে অতলান্তিক পার হয়ে সমুদ্রপথে একা ৪৬০০০ মাইল ভ্রমণ করে রোড দ্বীপের নিউ পোর্টে পৌঁছে গেলেন ১৮৯৮ সালের ২৭ জুন।

পুরুলিয়ার ছো-নাচ

শান্তি সিংহ

পুরুলিয়ার ছো-নাচ সারা ভারতের গর্ব। শুধু ভারতে নয়, বিদেশেও এই নাচ ব্যাপকভাবে সমাদৃত। ছো-নাচে মিশেছে বীরত্বের ব্যঞ্জনার সঙ্গে আশ্চর্য শিল্পসুষমা। প্রচলিত পুরাণকথার সঙ্গে একেবারে বর্তমানকালের সামাজিক বিষয়ও আজকাল ছো-নাচের অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়। এ এমন এক শিল্পকলা, যা সহজেই সবার মন জয় করে নেয়।

ফোটো : দীপক ভট্টাচার্য

লাল মাটির দেশ পুরুলিয়া। সারাদিন গনগনে রোদ। সঙ্গে গরম হাওয়া। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। তবু রোদের তাপ কমে না। আড়শার হেঁটজাড়ি গ্রাম। গ্রামের প্রান্তে খোলামেলা বিশাল মাঠ। রাত প্রায় দশটা। ছো-নাচের আসর। লোক গিজগিজ করছে। জেনারেটরের আলোয় চারদিক ঝলমলে। শতরঞ্চের ওপর বসেছে বাজনাদারেরা। বাজছে ঢোল। সানাই, ক্ল্যারিওনেট, মেরাকশ, ধামসা। গমগম করছে দশদিক। রাতভর অনেকগুলো নামকরা ছো-পার্টির নাচ হবে। পনেরো-ষোলো হাজার দর্শক অপেক্ষা করছেন অধীর আগ্রহে।

শুরু হল সামাজিক পালা। পুরুলিয়া সাঁওতালডি কারখানা গড়ে-ওঠার ইতিহাস। এ-জেলার বহু আদিবাসী মানুষ এখনও বাইরে-থেকে-আসা বাবুদের বলে 'দিকু'। একদা সেরকমই কিছু দিকু এসেছিল। তারা সাঁওতালডি অঞ্চলের বহু গ্রামের মানুষকে সাতপুরুষের ভিটেবাড়ি থেকে উৎখাত করে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মাপজোখ চালিয়ে গড়ে তোলে বিজলি কারখানা। ছো-নাচের ছন্দে কুলিরা গাঁইতি-কোদাল দিয়ে মাটি কাটে। কামিনরা ঝুড়িভর্তি মাটি ফেলে। ক্লান্ত শরীরে তারা খায় 'বাস্যাম', অর্থাৎ, পানতা ভাত। মানবিকভাবে সব দৃশ্যই ছো-নাচে জীবন্ত। দর্শকরা শোষণের রূপ দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েন। তখনই লোককবি বাজনদারদের পাশে বসে ঝুমুরের সুরে গেয়ে ওঠেন :

মু' ধুবে সকালে, বাস্যাম খাবে বিকালে।
কম কম খাবে বঁধু ই বছরের আকালে॥

সাঁওতালডি কারখানা গড়ে উঠল যাদের জমির বুকে, সেইসব আদিবাসী মানুষ হল সামান্য শ্রমিক। তাদের স্ত্রী কামিন। সরলতা এবং দারিদ্র্যের জন্য তারা কীভাবে শোষিত হচ্ছে ছো-নাচের তীক্ষ্ণ-তীব্র সামাজিক পালায় তা অভিনবভাবে ফুটে ওঠে। পরিচালক অনিল মাহাতর পালা দেখে দর্শকরা অভিভূত।

এবার পৌরাণিক পালা। কুশটাঁড়, আড়িতার বসন্ত মাহাতর ছো-পার্টি। পালার নাম মহিষাসুর বধ। শুরুতে গণেশবন্দনা :

সিঁদুর বরন অঙ্গ মূষিক বাহন।
নমো নমো গৌরীর নন্দন॥

ধামসা আর ঢোলে ওঠে বোল—গিডি-গিডি-ধো। গুড়-গুড়-ঝাগিন, গেঝাগিন ঝাঁ...

আসরে গজমুণ্ডধারী গণেশের প্রবেশ। বাজনার তালে নধর শুণ্ডধরের নাচ। বীরত্বব্যঞ্জক। অতর্কিতে ঢাল-তরোয়াল হাতে

কৃষ্ণলীলা

ভয়ঙ্কর অসুরের প্রবেশ। রণহুঙ্কার। বীরদর্পে গণেশের সঙ্গে যুদ্ধ। সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ পরাজিত। লাঞ্ছিত হয়ে আসরের একপ্রান্তে তাঁর উপবেশন।

তারপর আসরে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দেবসেনাপতি কার্তিকের প্রবেশ। শূরনৃত্য। স্পর্ধিত অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু। বাজনার শব্দ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। শিবের বরে শক্তিমান অসুরের হাতে হতচেতন হন বীর সেনাপতি কার্তিক। তখন পরাক্রান্ত অসুরের তাণ্ডবে আসর গমগম হয়ে ওঠে। অবশেষে সিংহবাহিনী দেবী দুর্গার আগমন। দেবী দুর্গার সঙ্গে হয় মহিষাসুরের আসর-কাঁপানো যুদ্ধ। ছো-নাচে মেয়েরা থাকে না। তাই পুরুষরাই নারীর অভিনয় করে। সে-সময় দেবী দুর্গার পাশে এসে দাঁড়ান লক্ষ্মী-সরস্বতী এবং কার্তিক-গণেশ। ছো-নাচের সেই অপরূপ দৃশ্য দেখে মনে হয়, সত্যি যেন জীবন্ত দুর্গাপ্রতিমার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

পদ্মশ্রী নেপাল মাহাতর দল নাচেন কিরাত-অর্জুন পালা। ঢোল-ধামসার ছন্দে পৌরাণিক কাহিনী দৃশ্যময় হয়ে ওঠে।

বামনিয়ার বীণাধরকুমারের দল দেখালেন রাজা হরিশ্চন্দ্রের শ্মশানমিলন পালা। ভাগ্যবিড়ম্বিত শ্মশানচণ্ডাল হরিশ্চন্দ্র। কিশোর রোহিতাশ্বের ঠাকুর পুজোর ফুল তুলতে গিয়ে সাপের কামড়ে মৃত্যু। মৃত পুত্র কোলে দুখিনী মা শৈব্যার শ্মশানে গমন। শ্মশানচণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রের কর্তব্যবোধ। শিব-দুর্গার আগমন। মৃত রোহিতাশ্বের জীবনদান। বহু ভাগ্যবিড়ম্বনার শেষে পুত্রসহ হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যার পুনর্মিলন। সবই ছো-নাচের নাটকীয় ছন্দে রূপ পায়।

পাঁঞ্জনবেড়ার গোপাল মণ্ডলের দল দেখালেন অভিমন্যুবধ পালা। অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর শৌর্যদৃপ্ত নাচ। ওলিম্পিকের জিমনাস্টদের মতো শূন্যে 'ভল্ট' দেওয়ায় অদ্ভুত শারীরিক কসরত দেখানো হল। সপ্তরথীর সঙ্গে বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধ। চক্রব্যূহের মধ্যেও তার বীরত্ব দর্শকদের মনে শ্রদ্ধা জাগায়।

নলকূপির হংসবাহিনী ক্লাব ছো-নাচের মাধ্যমে দেখালেন শ্রীকৃষ্ণের মকরস্নান।

পলমার হেমচন্দ্র মাহাতর দল দেখালেন কৃষ্ণলীলা। বালিগাড়ার সূর্য সহিসের দল দেখালেন মেড্রাসুরবধ পালা। এসব ছো-নাচে হিন্দি সিনেমার প্রভাব পড়েছে। ছো-নৃত্যবিশারদ পদ্মশ্রী নেপাল মাহাত কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "ছো-নাচ শাস্ত্রীয়। তার মধ্যে সিনেমার বাণিজ্যিক ছোঁয়া আনা উচিত নয়। অথচ শস্তা জনপ্রিয়তার লোভে অনেক দল ওই দিকে ঝুঁকছেন।"

পুরুলিয়ার চড়িদা বা চোড়দা গ্রাম মুখোশশিল্পের পীঠস্থান। ওই গ্রামে বহু শিল্পী পরিবার বংশপরম্পরায় মুখোশ গড়েন। তাঁরা

ছো-নাচের মুখোশ তৈরি হচ্ছে

ছো-নাচের একটি দৃশ্য: সাঁওতালডি

প্রধানত সূত্রধর সম্প্রদায়ের। নকুল, মনবোধ, সাধু প্রভৃতি শিল্পী নামকরা। চৈত্র মাসে শিবের গাজন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ তারিখ 'রোহিন' অবধি ছো-নাচের সময়। ওই সময়ের আগে বা পরেও অনেকে শখ করে নেচে থাকেন। তবে মুখোশের চাহিদা প্রধানত চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ অবধি। ওই সময় চড়িদার মুখোশশিল্পীরা একেবারে ফুরসত পান না। অনেকে তাই সরস্বতী পুজোর পর থেকেই মুখোশ-গড়ার কাজে হাত দেন।

মুখোশ তৈরির কয়েকটি পর্যায় থাকে। প্রথমে 'মাটি গাড়া'। কাঠের পাটাতনে মাটি দিয়ে গড়া হয় একটি মুখ। তার নাম ছাঁচ। গণেশের ছাঁচ হলে, প্রথম থেকেই তা হাতির শুঁড়ের মতো হবে। রাক্ষসের মুখের ছাঁচ হবে ভয়ঙ্কর, দাঁতাল।

মাটি গাড়া-র পর 'থাপি'। চামচের মতো একটি কাঠের টুকরো। তা দিয়ে অসমান মাটি খাঁজ করে কেটে সমান করা হয়। তারপর মাটির মুখটিকে ভালভাবে শুকিয়ে মিহি ছাইয়ের হালকা প্রলেপ দিয়ে ভেজানো কাগজ সেই মুখে লাগানো হয়। তার নাম কাগজ-চিটানো। পরে সামান্য রোদ লাগিয়ে, আঠা-লাগানো কাগজ ও পাতলা কাপড়ের টুকরো কয়েক স্তর দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে চলে শিল্পীর আঙুলের কাজ আর থাপি। তারপর মুখোশটি শুকিয়ে, ছাঁচ থেকে বের করে নেওয়া হয়। দেওয়া হয় খড়িমাটির দু-তিন কোট সাদা রং। শামুক পুড়িয়ে যে চুন পাওয়া যায়, তা দিয়ে আগে সাদা রঙের কাজ হত। নীল গাছ থেকে পাওয়া যেত নীল। সিঁদুর থেকে লাল রং। হলুদ বেটে হলদে রং। এখন বাজারে অনেক নতুন রং উঠেছে, শিল্পীরা সেসব রং ব্যবহার করেন।

সব মুখোশে ইচ্ছেমতো রং ব্যবহার করা যায় না। নিয়ম আছে। দুর্গার মুখোশের রং হবে গাঢ় হলুদ। লক্ষ্মীর মুখোশের রং অনুরূপ। শিব, গণেশ, সরস্বতীর মুখোশ মূলত সাদা রঙের। কৃষ্ণের মুখোশ নীল। রামের হালকা নীল বা সবুজ। হনুমানের গোলাপি। পরশুরাম কমলা-লাল। রাক্ষসের মুখোশ কালো বা গাঢ় সবুজ। মোটা কালো গোঁফ। ভয়ঙ্কর দাঁত। কিরাত-কিরাতিনীর মুখোশের রং মেটে-খয়েরি।

মুখোশ অলঙ্করণেরও রীতি আছে। চিকন রুপোলি রাংতা কাগজ, যাকে মুখোশশিল্পীরা বলেন সাদা জামির পাতা, তা প্রথমে কুচি করা হয়। তারপর সরু তারে পুঁতি মালা গাঁথা হয়। ক্রমে গঙ্গাযমুনা মালা, রোলেক্স মালা, রোলেক্স টিকলি, শোলা ও কাগজের কারুকার্যময় ফুল, সাদা-সোনালি কিরণ, এমনকী, রঙিন মুরগির পালকও দেওয়া হয়। সবশেষে ঘাম-তেল।

ছো-নাচের জন্য চোড়দায় অর্ডার দিয়ে মজবুতভাবে বানানো মুখোশ প্রায় হাজার টাকা জোড়া পড়ে। সেসব-মুখোশে শিল্পীরা ২৫-৩০ বার নাচতে পারেন। কিন্তু ঘরের শোভা বাড়ানোর জন্য শৌখিন বাজারি মুখোশ একশো টাকা জোড়াও পাওয়া যায়।

ছো-নাচের সুবাদে পুরুলিয়ার ছো-শিল্পীরা আমেরিকা-লন্ডন-প্যারিস প্রভৃতি দেশ ঘুরেছেন। ছো-মুখোশ আজ পৃথিবীবিখ্যাত। কিন্তু ঝলমলে মুখোশের আড়ালে ছো-শিল্পীদের করুণ মুখশ্রী আজও জেগে আছে। তাই 'মেডেল'-পাওয়া, পদ্মশ্রী গম্ভীর সিং মুড়ার অভুক্ত, রোগজর্জর শরীর। তাঁর অভিমানী, রুগ্ণ, ঝাপসা চোখে এখনও বুঝি ভাসে বিদেশের নানা রঙিন ছবি।

ফোটো : বিশ্বনাথ লাই

ভোমরা বলল, "ফোনটা ধরো তো একটু। খবরের কাগজটা সবে দিয়ে গেল আর সাতসকালে কুরুর-কুরুর। কোনও ভদ্রলোকে এত সকালে শীতের দিনে কাউকে ফোন করে!"

দৃপ্ত খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে চটি ফটফটিয়ে বিরক্ত মুখে ফোনটা ধরল। বলল, "হ্যালো!"

"ঋজুদা! হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ! কী খবর! তুমি যে একেবারেই ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ।"

ভোমরা বলল দৃপ্তকে। "ও ঋজুদা! তাই বলো! ঠিকই বলেছিলাম। ঋজুদা তো কোনওদিনও ভদ্রলোক ছিল না।"

অজগরের দেশে

বুদ্ধদেব গুহ

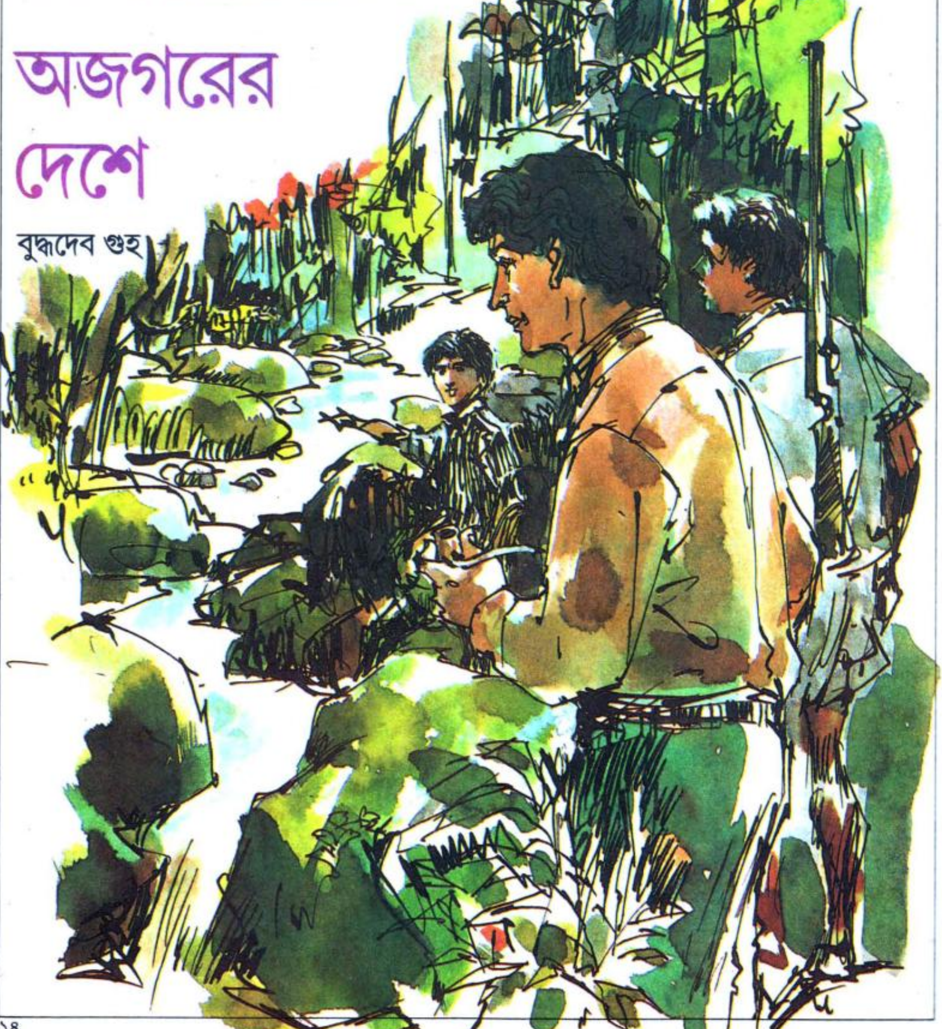

দৃপ্ত হেসে বলল, "দ্যাখো, তোমার অ্যাডমায়রার কী বলছে তোমাকে।"

"কে?"

ওপাশ থেকে ঋজুদা বলল।

"কে আবার! ভোমরা।"

"ওঃ। তা ঠিকই তো বলেছে। আমি ভদ্রলোক তো নই-ই! ভদ্রলোক হবার কোনওরকম বাসনাও আমার নেই।"

"তা সাতসকালে আমাদের মনে পড়ল যে! যাচ্ছ নাকি কোথাও? কোনও রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে? নাকি মানুষখেকো বাঘ কি পাগলা হাতি মারার অনুরোধ এসেছে কোনও জায়গা থেকে!"

"না, সেরকম কিছুই নয়। আর তা হলে তো আমার শাগরেদদের সঙ্গে নিয়েই যেতাম। রুদ্র, তিতির···।"

"তা বটে! নতুন এক শাগরেদ নাকি জুটেছে তোমার? মিস্টার ভটকাই? তাকে এখনও দেখা হয়নি আমাদের।"

"যেদিন দেখতে আসবে সান-গ্লাস পরে এসো। তার জেল্লাতে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে।"

হো-হো করে হেসে উঠল দৃপ্ত।

"ও কী! এ আবার কী হাসি! হাসছ কেন?" খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে ভোমরা বলল।

"পরে বলব।"

"পরের সপ্তাহে শনি-রবির সঙ্গে দু' দিন ছুটি নিতে পারবে কি তোমরা?"

"কেন? বলোই না কোথায় নিয়ে যাবে?"

"ওড়িশায়। কোনও কাজ অবশ্য নেই। অনেকদিন জঙ্গলে না গিয়ে মনটা বড় ক্লান্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছে। একটু পিওর অক্সিজেন নিয়ে আসতে চাই। থাকবার অসুবিধে বা অন্যান্য কোনওরকম অসুবিধেই নেই। শুধু 'বডি ফেলে' দিলেই হল।"

"আমার ছুটি পাওনা আছে অনেক। আগামী শুক্রবার থেকে পরের সোমবার ছুটি নেব তো? রাইট।"

"আমাদের অফিসের চারটে ফোনই খারাপ। তাই তোমাকে বাড়ি ফিরে ফোন করব। হয় আমি, নয় ভোমরা। ও· কে?"

"ও· কে।"

ঋজুদা বলল।

॥ ২ ॥

কটক স্টেশনে যখন নামল ওরা ট্রেন থেকে, তখন বেশ সকাল। ট্রেনটা লেট ছিল। ঋজুদার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে চান সেরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিল ওরা। তারপর সেখান থেকে জিপে চড়ে রওনা হল। নদী পেরিয়ে চৌদুয়ারের টিটাগড় পেপার মিলস-এর কাগজ-কল পেরিয়ে হিন্দোল, ঢেনকানল, অংগুল পেরিয়ে যখন টিকরপাড়ার পথে জিপ চলতে লাগল তখন দুপুর প্রায় শেষ। অংগুল থেকে ডাইনে চলে গেছে সম্বলপুরের পথ। দৃপ্তরা সোজা গেল।

"পথে কোন-কোন জায়গা পড়বে ঋজুদা? বাবাঃ,কী বড় বড় গাছ দু'পাশে। কী ঘন জঙ্গল।" ভোমরা বলল।

"এখনও আছে। তবে থাকবে না। আমাদের দেশের জঙ্গলকে এক সাঙ্ঘাতিক ক্ষয়রোগে ধরেছে। পথের পাশে চেয়ে কিছুই বুঝবে না। কিন্তু জঙ্গলের ভিতরে-ভিতরে তা প্রতিদিন কুরে-কুরে খেয়ে যাচ্ছে। পঁচিশ-তিরিশ বছর পরে দেখবে আমার কথা ঠিক কি না! জঙ্গল নষ্ট করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে আমাদের প্রত্যেককেই কত ভাবে করতে হবে, কী বিভীষিকাময় অবস্থাতে যে পৌঁছব আমরা, সে কথা আজকে দুঃস্বপ্নেও ভাবা শক্ত।"

"কারা নষ্ট করছে জঙ্গল?"

দৃপ্ত শুধোল।

"অনেকেই। আমাদেরও কিছু অবদান আছে বইকী! যারা সব দেখে, বুঝেও কোনওরকম প্রতিবাদ করছি না।"

ভোমরা বলল, "আমাদের নিজেদের পা যতক্ষণ কেউ মাড়িয়ে না দেয়, ততক্ষণ কোনও আন্দোলনই করি না আমরা। এইসব ইনট্যানজিবল ব্যাপার নিয়ে কে আন্দোলন করবে? মাইনে বাড়াবার বা বোনাস পাওয়ার জন্যে হলে মিছিলের বন্যা বয়ে যেত।"

"করে না কেন? করে। চিপ্‌কো আন্দোলনের নাম শোনোনি? দেশের কোনও-কোনও জায়গাতে এখনও মানুষের মতো মানুষ আছে। ভাবলেও ভাল লাগে।"

দৃপ্ত বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিপ্‌কো আন্দোলনের কথা শুনেছি।"

"এটা কী জায়গা?" ভোমরা শুধোল।

"এ জায়গার নাম করতপটা। এর পরই বাঁ দিকে পাহাড়ে পথ উঠে গেছে লবঙ্গির জঙ্গলে। ভারী সুন্দর জঙ্গল।"

তারপরই ঋজুদা বলল, "তোমরা তা হলে কী ঠিক করলে? টিকরপাড়ায় টিটাগড় পেপার মিলের বাংলোতেই থাকবে? না, পুরুনাকোটের ফরেস্ট-বাংলোতে? পুরুনাকোটে বিমলবাবুর তৈলাতেও থাকতে পারো। টিটাগড়ের বাংলোয় আরাম অবশ্য সবচেয়ে বেশি। কনক ঘোষ সাহেবের চিঠি তো আছেই আমার পকেটে।"

"আর তৈলাতে? তৈলা কী ঋজুদা?" দৃপ্ত শুধোল।

"তৈলা একটি ওড়িয়া শব্দ। জঙ্গল কেটে, জঙ্গলের মধ্যে যে চাষের জমি বের করা হয় তাকেই বলে তৈলা। মানে জঙ্গলের খামার আর কি! তবে ওই তৈলাতে দুটিমাত্র কাঠের ঘর আছে শুনেছি। তাতে শালকাঠের চৌকি পাতা। ঠাণ্ডাও হবে খুবই। এই তৈলাতে আমি কখনও থাকিনি। বিমলবাবুও সবে করেছেন। চলো দেখব, পথেই পড়বে। তোমাদের ভাল লাগলেই থেকো।"

সন্ধে হয়ে আসছিল। কটক থেকে বেরোতে-বেরোতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল ওদের। দু'পাশ খোলা জিপে ঠাণ্ডাও লাগছে বেশ। গায়ের শালটা ভাল করে টেনে জড়িয়ে ভোমরা বলল, "উ-হু-হু। কী শীত রে বাবা!"

ঋজুদা বলল, "এই তো এসে গেলাম পুরুনাকোট। ওই দ্যাখো ডান দিকে চলে গেছে মেরুন-রঙা মাটির পথ, বাঘমুণ্ডার বাংলোতে। আর একটু পরই বাঁ দিকে টুল্বকা বাংলোতে যাওয়ার পথ বেরিয়ে গেছে। এক সময়ে এই দুই জায়গারই পথে দিনের বেলাতেই হাতি আর গাউর, যাদের ওড়িয়াতে বলে 'গম্বু', তা দেখতে পাওয়া যেত। বাঘ যে কত ছিল এইসব ব্লকে, তার হিসেব ছিল না। এখনও যে একেবারেই নেই এমন নয়।"

"বাঁ দিকে দোতলা ওটা কী বাংলো? কাঠের? কী সুন্দর বারান্দটা!" ভোমরা শুধোল।

"ওটাই তো পুরুনাকোটের পুরনো ফরেস্ট-বাংলো।"

"আর নতুন বাংলো?"

"নতুন বাংলো ওই যে ডানে বাঘমুণ্ডার দিকে যে আর-একটি পথ চলে গেছে, তাতেই ঢুকে। ও পথের পাশে পাশে এবং এখান থেকে টিকরপাড়াতে যাবার পথেরও পাশে পাশে বোষ্টম-নালা বলে একটি পাহাড়ি নালা বয়ে গেছে। বড়-বড় কালো পাথরে ভর্তি। ভারী সুন্দর। সেখানে চানও করতে পারো ইচ্ছে করলে।"

দৃপ্ত বলল, "তুমিও যেমন ঋজুদা! গিজারের জল ছাড়া গ্রীষ্মেও যার চান হয় না, সে করবে চান—এই কনকনে শীতে পাহাড়ি নালাতে? তা হলে তো হয়েইছিল।"

"সামনে ডান দিকে ওটা কী?"

ভোমরা দৃপ্তর কথার প্রতিবাদ না করে বলল।

"ওই তো বিমলবাবুর তৈলা। এসে গেছি।"

জিপটা তৈলার সামনে এসে দাঁড়াল। ঋজুদা একবার হর্ন বাজাল। হর্ন বাজাতেই ভেতর থেকে একজন রোগা পাতলা কালো বেঁটে ভদ্রলোক, পায়জামার উপরে হাফশার্ট, তার উপরে একটি হাফ-হাতা ছাইরঙা সোয়েটার পরে, পায়ে বাথরুম স্লিপার গলিয়ে বেরিয়ে এলেন।

ভোমরা ভাবল, কী রে বাবা, শীত-টিত নেই নাকি ভদ্রলোকের ?

বিমলবাবু হাতজোড় করে নমস্কার করে বললেন, "আরে ঋজুবাবু ! সত্যি সত্যিই এলেন তা হলে ? কত্ত বছর পরে ! আপনার টেলিগ্রাম পেয়েও বিশ্বাস করিনি।"

"মিথ্যামিথ্যি কি এসেছি কখনও ?"

ঋজুদা হেসে বলল, "আর এই যে, আলাপ করিয়ে দিই। বিমল ঘোষ, বাড়ি অংগুলে। আর এই যে ভোমরা আর দৃপ্ত রায়। মেড ফর ইচ আদার। এমন সুন্দর দম্পতি কি দেখেছেন আগে ? ওদের আবার বিয়ে হয়েছে এই দু' মাসও হয়নি। হানিমুনেই এসেছে বলতে পারেন।"

বিমলবাবু জবাব দেওয়ার আগেই ভোমরা বলল, "বিমলবাবু, এখানে তো শুধু হাতি, বাঘ আর গন্ধ না কী বললেন, সেই সবই তো দেখেন, তাই আমাদের সুন্দর লাগতেই পারে ওঁর চোখে। তা ছাড়া ঋজুদার সার্টিফিকেট যখন আছেই।"

সকলেই ভোমরার কথাতে হেসে উঠলেন।

ঋজুদা বলল, "নাও, তোমারা নেমে দেখে নাও এখানে থাকতে পারবে কি না ! গিজার নেই। তবে চাইলেই গরম জল পাবে। বাথরুমটাও দেখে নাও।"

ভোমরা ও দৃপ্ত গিয়ে দেখল। চারপাশে জলের উপরে পাতার আড়াল দেওয়া চানঘর। উপরে আকাশ। গাছগাছালির ডাল ঝুঁকে পড়েছে তার উপর। দৃপ্ত বলল, "তুমি চান করার সময়ে মাথায় পুষ্পবৃষ্টিও হতে পারে। কে বলতে পারে !"

পাতার আড়াল শুকিয়ে গেছে। ঋজুদা বলল, "ভয় নেই, নতুন পাতা কাল সকালেই লাগিয়ে দেওয়া যাবে।"

বিমলবাবু বললেন, "সবই ভাল, কিন্তু প্রায় রোজ রাতেই হাতি আর গন্ধ আসছে। বিরি-ডাল, মানে কলাই-ডাল লাগিয়েছি তো, সবচেয়ে ক্ষতি করছে শুয়োরে। বেড়া গলে চলে আসছে। আছাড়ি পটকা ফাটিয়ে ফাটিয়ে সারারাত ঘুম হয় না। ভয়ও লাগে। যদি হাতি ঠেলা মেরে ঘর ফেলে দেয় ? তারপরে পা চাপালেই তো কম্ম ফতে !"

দৃপ্ত বলল ভোমরাকে, "এই যে শুনছ, হাউ অ্যাডভাঞ্চারাস। আমরা কিন্তু এখানেই থাকব ঋজুদা। অন্য কোথাওই যাচ্ছি না। এখানে দু'দিন দু' রাত্তির থাকলেই ফিরে গিয়ে 'দ্য স্নোজ অব কিলিমানজারো'র মতো 'দ্য তৈলা অব পুরুনাকোট' বলে একটি বই লিখে ফেলব। ফুল অব অ্যাডভেঞ্চারস।"

ঋজুদা হাসল দৃপ্তর কথা শুনে।

দৃপ্ত বলল, "এখান থেকে পাদমেকং ন গচ্ছামি। কী বলো ভোমরা ? এমন অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ কি কেউ ছাড়ে ?"

"নিশ্চয়ই।" ভোমরা বলল।

"তা হলে জিনিসপত্র সব নামিয়ে নিই জিপ থেকে ?" বিমলবাবু খুবই খুশি হয়ে বললেন।

তারপরই ভোমরাকে বললেন, "ঋজুদার সঙ্গে থাকলে আপনাদের কোনওরকম ভয়ই নেই। বরং আনন্দই সব সময়।"

ঋজুদার দিকে ফিরে বললেন, "আপনার সঙ্গে সেই কামানটা এনেছেন তো ?"

ঋজুদা হাসল। বলল, 'ফোর সেভেনটি ফাইভ ডাবল ব্যারেল রাইফেলটার কথা বলছেন তো ? নাঃ, শিকার তো ছেড়েই দিয়েছি কত্ত বছর। তবে সঙ্গে পিস্তলটা আছে। ভয় তো বনের জন্তুদের থেকে নয়, শহরের জন্তুদের থেকেই।"

"তা যা বলেছেন !"

বিমলবাবু ডাকলেন, "টুনা ?"

একটি ফরসা রোগা না-খেতে পাওয়া চেহারার ছেলে এসে দাঁড়াল। বয়স হবে পনেরো-ষোলো। টকটকে ফরসা রং কিন্তু রোদে পুড়ে অনাহারে তামাটে হয়ে গেছে। চোখ দুটো কোটরে বসা। কিন্তু মায়াবী। সে খুব নরম মিষ্টি বিনয়ী গলায় বলল, "আইজ্ঞা ?"

"মালগুলো নামিয়ে নিয়ে বড় ঘরে রাখ বাবা।"

ছেলেটিকে দেখেই মায়া পড়ে গেল ভোমরার। ভারী দুঃখী-দুঃখী চেহারা। কিন্তু স্বভাবটি বড় সম্ভ্রান্ত।

টুনা মাল বয়ে নিয়ে গেল ভিতরে। মাল বইতে বেঁকে গেল যেন। এতক্ষণে জিপের এঞ্জিনের গরমে শীতটা ঠিক মালুম হয়নি। এখন ভালমতো বোঝা যাচ্ছে শীতের প্রকোপ।

ঋজুদা বলল, "ও বিমলবাবু ! এদের তাড়াতাড়ি আদা তেজপাতা, গোলমরিচ দিয়ে চা খাওয়ান। দেখছেন না মাখনের বাবু-বিবি সব, কলকাতার।"

ভোমরা অপদস্থ ও লজ্জিত হয়ে বলল, "এরকম বলা উচিত নয় ঋজুদা। আমাদের কী ভাল যে লাগছে তা কী বলব ! মনে হচ্ছে, এখানেই থেকে যাই সারা জীবনটা।"

ঋজুদা হেসে উঠে বলল, " প্রথম প্রথম এরকম রোম্যান্টিসিজম সকলেরই থাকে। জঙ্গলে সারা জীবন থাকাটা কীরকম ঝক্কির, তা বিমলবাবুকে জিজ্ঞেস করলেই বুঝবে।"

দৃপ্ত বলল, "আমিও কিন্তু ভোমরার সঙ্গে একমত। জঙ্গলকে তেমন করে ভালবাসতে হবে। তা হলে বোধ হয় ভাল না-লাগার কোনওই কারণ থাকবে না।"

বিমলবাবু বললেন, "আমরা এখানে পড়ে থাকি দুটো পয়সা কিসে করা যায় সেই ধান্দায়। আমাদের তো ঋজুবাবুর মতো দেখার চোখ নেই, বোঝার মনও নেই।"

তারপরই বললেন, "রাতে কী খাওয়া হবে ? নিশ্চয়ই খিচুড়ি ?"

"নিশ্চয়ই। সঙ্গে কড়কড়ে করে নতুন আলুভাজা, বেগুনি, পেঁয়াজি, বেশি করে কাঁচালঙ্কা আর কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে সামান্য দুধ মিশিয়ে একটু নরম করে ওমলেট।"

"আর শুকনো লঙ্কাভাজা ?"

বিমলবাবু বললেন হাসতে-হাসতে।

"রাইট।" ঋজুদা বলল। বলেই, ভোমরাদের দিকে ফিরে বলল, "এনি অবজেকশান ?"

দৃপ্ত কী যেন-একটা বলতে যাচ্ছিল, ভোমরা বলে উঠল, "অবজেকশান ওভাররুলড।"

॥ ৩ ॥

খুব ভোরে ওরা উঠবে ভেবেছিল। ওরা দুজনে বড় ঘরের খাটে শুয়ে ছিল। ঋজুদা আর বিমলবাবু রান্নাঘরের তক্তার উপরে। ওদের আপত্তিতে কোনও কর্ণপাতই না করে।

খুব ভোরে ওঠা হল না। অভ্যেসও নেই। ওরা উঠতেই, যে-বুড়োমতো মানুষটি খিচুড়ি রান্না করে খাইয়েছিল গত রাতে, সে-ই চা নিয়ে এল। জিজ্ঞেস করাতে বলল যে, বিমলবাবু গেছেন কাবাড়িদের কাছে, যেখানে গাছকাটা হচ্ছে, আর ঋজুদা জঙ্গলে।

চা খেয়ে ওরাও বেরোল। মহান্তিকে জিজ্ঞেস করল,"ভয়-টয় নেই তো কোনও ? পথে ?"

মহান্তি ফোকলা দাঁতে হেসে বলল, "নাই আইজ্ঞা ! কিচ্ছি ভয় নাস্তি।"

তখনও কুয়াশা ছিল। সোঁদা-সোঁদা গন্ধ উঠছিল তৈলার মাটি থেকে।

কাল শেষরাতে গুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওদের। বিমলবাবু পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, "আপনারা ঘুমোন। কিছু না। শুয়োরে এসে বিড়ি খাচ্ছিল। তাই ঋজুবাবু আকাশে গুলির শব্দ করে ওদের ভাগালেন।"

দৃপ্ত ঘুমচোখে ভোমরাকে বলেছিল, "কীরকম শুয়োর যে বিড়ি খায় ?"

ভোমরা বলেছিল, "আঃ। বিড়ি নয়, বিরি। কলাইকে ওড়িয়াতে বলে বিরি। শুনলে না কাল বিমলবাবুর মুখে।"

"ওঃ।"

ভারী চমৎকার লাগছিল ফ্যাকাসে লাল ধুলোর রাস্তায় হাঁটতে, এই নিবিড় শান্তির ভোরের জঙ্গলে। ধুলো এখনও শিশিরে ভিজে। শুকনো হতে-হতে বেলা দশটা। তারপর দুপুরের দিকে বোধ হয় ওড়াউড়ি শুরু করবে ধুলোকণারা। গাছপালার পাতাতে লালচে সরের মতো থিতু হবে। পথের দু' পাশেই মস্ত বড়-বড় গাছ। ঋজুদা সঙ্গে থাকলে নাম বলতে পারত।

হঠাৎ ভোমরা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "ও মা ! দেখেছ ! লজ্জাবতী-লতার ঝাড়। বাঁশবনের পাশে-পাশে। জলপাইগুড়িতে মামাবাড়িতে চা-বাগানের বাংলোতে ছিল। দেখবে ?" বলেই যেই হাত ছোঁয়াল ভোমরা, অমনি জমে-থাকা টলটলে শিশির ঝরিয়ে পাতাগুলি কুঁচকে গেল। লজ্জায় শুয়ে পড়ল যেন !

"দেখলে !" ভোমরা বলল সগর্বে। যেন ওই লজ্জাবতী-লতার প্রথম আবিষ্কারক !

কী-সুন্দর গন্ধ উঠছে দু' দিকের বন থেকে। একটু এগোতেই ঝরঝর করে জল বয়ে যাওয়ার শব্দ পেল ডান দিকে। কিছুটা যেতেই সেই বোষ্টম-নালাটা চোখে পড়ল। কী চমৎকার যে দেখাচ্ছে ! সূর্যটা সবে এখন উঠছে। ঘন, ভিজে সবুজ অরণ্যের দিগন্তের উপরে। গাছগাছালির ফাঁক-ফোকর দিয়ে যাত্রার রাজার ঝলমলে সোনালি পোশাক পরে যেন অরণ্যচারী এই সূর্য এগিয়ে আসছে পুষ্পক রথে চড়ে, ধীরে-ধীরে আরও উপরে উঠবে বলে। স্পষ্ট হয়ে দেখা যাচ্ছে এখন, ভীমধারার সাদা আর গেরুয়া বালির কোল। কতরকম গড়নের সব কালো কালো পাথর। ভীমধারা বয়ে গেছে এখানে পথ থেকে তিন মিটার মতো নীচ দিয়ে। গাছগাছালির সবুজ ঝালরের ফাঁকে ফাঁকে। ওরা দু'জনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সেই সময়ে একটা বড় বাঘ ভেজা জঙ্গল ফুঁড়ে নালার ওপাশের একটি বড় পাথরের উপর এসে দাঁড়াল। তার শরীরও ভেজা। তার গায়ে রোদ পড়ে এমন দেখাচ্ছিল, এমনই রাজকীয় তার ব্যক্তিত্ব যে বাক্‌রোধ হয়ে গেল ওদের দু'জনেরই। তার গায়ে যে শিশির পড়েছিল গাছের পাতা থেকে, তা বেড়াল যেমন করে গা-ঝাড়া দেয় জলে ভিজলে, তেমন করেই গা-ঝাড়া দিয়ে সব সিক্ততা গা থেকে ঝেড়ে ফেলেই তিন লাফে পাথরে পাথরে পা ফেলে অতখানি চওড়া নালাটি টপকেই রাস্তা পার হয়ে বাঁ দিকের গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেল। বাঘটা যেখানে জঙ্গলের ভিজে সবুজ ঝালর ভেদ করে ঢুকল, ঠিক সেখান থেকেই টুনা বেরোল জঙ্গল ফুঁড়ে।

ভোমরা চেঁচিয়ে উঠল, "এই। বাঘ। বাঘ ! সাবধান।"

নির্লিপ্ত টুনা বুঝতে পেরেও উত্তেজিত হল না, নয় বুঝলই না। ওর পরনে ছিল হাঁটুর কাছে ঠেকে যাওয়া একটি মোটা ধুতি। সাজিমাটিতে কাচায় লালচে হয়ে গেছে সেটা। একটি হলুদরঙা ছেঁড়া হাফশার্ট। তার উপরে একটি পাতলা গামছা। গায়ে আলোয়ানের মতো জড়ানো। খালি পা।

দৃপ্ত বলল, "ঠাণ্ডাতে তো নিউমোনিয়া হবে বেচারির। আর বাঘটা যদি ...।"

টুনা আরও এগিয়ে আসতেই ভোমরাদের দেখতে পেল।

একগাল হেসে বলল, "দণ্ডবৎ আইজ্ঞা।" বলেই মাথা নুইয়ে নমস্কার করল।

দৃপ্তর বড় ভাল লাগল এই বিনয় আর সহবত।

ভোমরা আতঙ্কিত গলায় বলল, "বাঘটা যদি ফিরে আসে ?"

টুনা হেসে বলল, "বাঘটা গল্বা তাংকু ঘরু, কাঁই আসিবে সে ফিরি এট্টি ?"

একটা এত বড় বাঘ এই দুবলা-পাতলা পনেরো বছরের ছেলেটির মনে কোনও দাগই কাটল না দেখে ওরা বড় আশ্চর্য হল।

"তুমি থাকো কোথায় টুনা ?" ভোমরা বলল।

"টিকরপাড়ার কাছে, জঙ্গলের ভিতরের গ্রামে।"

"কাল তুমি রাতের বেলা এই পথ দিয়েই হেঁটে ফিরেছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কী গো ! ভয়ডর নেই ? রাতে টর্চ নিয়ে এসেছিলে ?" বিস্ময়াভিভূত হয়ে ভোমরা শুধোল।

"টর্চের অনেক দাম। টর্চ কোথায় পাব ?"

"তবে ? অন্ধকারে এসেছিলে ?"

"না। হাতে লণ্ঠন ছিল। এই যে। ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। লণ্ঠনটা তো তৈলারই। আমাদের বাড়িতে কেরোসিনের কুপি আছে। তাও বিশেষ দরকারে ছাড়া জ্বালান হয় না। রান্না করে তো মা সন্ধে লাগার সঙ্গে-সঙ্গেই। সেই আগুনেই ঘর আলো হয়ে থাকে। একটি ঘরেই তো থাকি আমরা। তারই মধ্যে একটি খোঁড়া গোরু আর একটি সাদা ছাগল। ছাগলটা বাচ্চা দেবে ক'দিন পরেই ! সকলেই এক ঘরে থাকাতে শীত কম লাগে। রান্নাও সে-ঘরে হওয়াতে ঘরটা প্রথম রাতে গরমও হয়ে থাকে। তারপরই তো খেয়েদেয়ে সকলে শুয়েই পড়ি। চাঁদ সূর্যের আলো ছাড়া আমাদের আলোর আর দরকারই বা কী ?"

"তোমার বাড়িতে আর কে আছেন ?"

"মা আর ছোট বোন। দশ বছর বয়স বোনের।"

"বাবা ?"

"বাবা গাছ কাটতে গিয়ে গাছ-চাপা পড়ে মারা গেছেন আজ দু' বছর হল। সামনের পূর্ণিমাতে ঠিক দু' বছর হবে।"

"তুমিই একমাত্র রোজগেরে ? তোমাদের পরিবারে ?"

"হ্যাঁ।"

"জমিজমা তো নিশ্চয়ই কিছু আছে। কী চাষ করো সেখানে ?"

টুনা এক স্বর্গীয় হাসি হাসল। বলল, "আমরা গরিব মানুষ। জমিজমা তো বড়লোকদের থাকে।"

"মাইনে যা পাও তাতে চলে যায় তো তোমাদের ?"

প্রশ্নটা করেই ভোমরা বুঝল যে,বড় বোকার মতোই হল প্রশ্নটা। অর্থহীন।

"এখানকার যা রেট তাই পাই। তা ছাড়া সকালে-বিকেলে চা আর মুড়ি খেতে পাই। দুপুরের খাওয়াও। আমি তো ভালই আছি। কষ্ট মা আর বোনের।"

"তিনজনের চলে তো যায় ! কী বলো ?"

টুনা হেসে বলল, "চলে যায়। ওই! সকলের চলা কি আর একরকম ?"

"কী খাও ? তোমরা ?"

"ভাত।" ভোমরার অমন ঔৎসুক্যে টুনা হেসে ফেলে বলল।

"সঙ্গে ?"

"নুন।"

"শুধু নুন ?"

"এক-আধদিন মহান্তিদাদা একটু সবজি দেয়। বেশি থাকলে। কখনও বোষ্টম-নালায় মাছ ধরতে পারলে কুচোমাছও খাই। তা ছাড়া জঙ্গলে অনেকই রকম ফলমূল তো হয়। আম, পনস, জাম, কন্দমূল, কচু, তেঁতুল, আরও কত কী!"

"পনস কী ?"

"কাঁঠাল। আমরা কাঁঠালকে পনস বলি। বর্ষাকালে অর্গুনগাছের ফল হয়। টক-টক লাগে। ওই যে দেখুন অর্গুনগাছ।"

"বাঃ। ভারী সুন্দর তো গাছের পাতাগুলো দেখতে।"

"এখানে সাপ-টাপ নেই ?" ভোমরা শুধোল।

"হ্যাঁ। তবে বর্ষাকালে আর গরমকালেই বিছে আর সাপের ভয় বেশি। এখানে খুব বড়-বড় সাপ আছে। রাতের বেলা খুব সাবধানেই পথ দেখে চলতে হয়। তবে রাতের বেলা কেউ চলেই না। শীতকালে সেসব ভয় নেই।"

"বাঘকে ভয় পাও না ?"

"বাঘ তো বনের রাজা। সে কিচ্ছু বলে না। সে থাকে তার মনে। তবে কখনও-কখনও এড়িয়েও তাকে চলতে হয়। যখন সঙ্গে বাচ্চা থাকে, বা জুড়ি।"

এমন সময় মাথার উপর থেকে চিক-চিক শব্দ হল। আর বড় গাছগুলোর উপরের ডালে ডালে বাদামি সোনালিতে মেশানো আলোর চমকের মতো কী যেন সব জানোয়ার ঝাঁপাঝাঁপি করতে লাগল। ডাল বেয়ে তাদের দ্রুত দৌড়োদৌড়িতে শিশির ঝরতে লাগল নীচে, বৃষ্টির মতো। অবাক হয়ে দৃপ্ত আর ভোমরা সেদিকে তাকিয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পরে বলল, "ওগুলো কী ?"

টুনা ভোমরার অজ্ঞতাতে হাসল। বলল, "জানেন না? এগুলো যে নেপালি ইঁদুর।"

"ইঁদুর ?" অবাক গলায় দৃপ্ত বলল। এগিয়ে এসে, ভাল করে উপরের দিকে চেয়ে।

"হ্যাঁ।"

"অত বড়-বড়। বনবেড়ালের মতো বড় যে! কী লম্বা-লম্বা লেজ!"

টুনা বলল, "হ্যাঁ। বুকের দিকটা আর লেজের ভিতর দিকটা সাদা। পিঠ আর লেজের উপরের দিকটা ঘন বাদামি আর সোনালি। এর মাংস বড় ভাল খেতে।"

"ইঁদুরের মাংস ? খাও তোমরা ?"

"আমরা সব খাই।" সুন্দর, রক্তহীন পাণ্ডুর মুখে হাসি এনে টুনা বলল। তারপর বলল, "আমরা আর খাসির মাংস কোথায় পাই বলুন ? কখনও কেউ কিছু শিকার করলে ন' মাসে ছ' মাসে বরা কি শম্বর কি কুটরা, যদি দেয়, তো একটু খাই। তাই মাংসকে আমরা বলি 'শিকার'। ঋজুবাবুকে বলুন না একটা মেরে দেবেন আমার জন্য। মা-বোন আর আমি তা হলে খেতে পারতাম।"

কথা ঘুরিয়ে দৃপ্ত বলল, "মাসে কতবার মাংস খাও ?

"মাসে ?"

বলেই, আবারও হাসল টুনা। এবারে দৃপ্তের অজ্ঞতায়।

বলল, "মাসে কী ? বছরের মধ্যে মাত্র এক-দু'বারই খাই। তাও সব বছরে হয় না। এখন তো শিকারই বন্ধ।" বলেই, তাড়াতাড়ি বলল, "এবার আমি যাই। বেলা হয়ে গেল। তৈলাতে অনেক কাজ আছে। আপনারা এখন কোথায় যাচ্ছেন ?"

"এই! একটু বেড়াতে।"

"বেড়িয়ে আসুন। আমি মহান্তিদাদাকে বলছি গিয়ে আপনাদের নাস্তা তৈরি করে রাখতে। কী খাবেন ?"

ভোমরা টুনার মুখে ওদের খাওয়ার কথা শুনে লজ্জায় আর নিজেদের খাওয়ার কথা উচ্চারণও করতে পারল না।

দৃপ্ত বলল, "যা দেবে তাই খাব। ঋজুদা কোনদিকে যেতে পারে জানো ?"

"না তো। উনি জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে যেসব জানোয়ার-চলা পথ আছে সেইসব পথ ধরে ঘুরে বেড়ান। আজ কোথায় গেছেন তা বলতে পারব না।

টুনা চলে যাচ্ছিল। যাওয়ার আগে আবার ও মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করল, 'দণ্ডবৎ আইজ্ঞা' বলে।

দৃপ্ত ডাকল ওকে। বলল, "টুনা, এই গাছগুলো কী গাছ ? এক বাঁশঝাড় ছাড়া তো কিছুই চিনি না আমরা।"

"কত্ত গাছ আছে বাবু! মিট্‌কুনিয়া, সাহাজ, রসসি, বন্ধন, শিমুল, শাল, সেগুন, আরও কত্ত হরজাই গাছ। জ্বাল-কাঠ সব।"

"জ্বাল-কাঠ মানে ?"

"মানে, যে কাঠ দিয়ে জ্বালানি হয়, রান্না হয়, দামি গাছ নয় সেগুলো। ওইসব গাছকে আমরা বলি হরজাই গাছ। আমি এখন যাই বাবু। খুবই দেরি হয়ে গেল।"

"আচ্ছা। তবে যাও।"

টুনা চলে যাওয়ার পরে ওরা দুজনেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। দু'জনে কী যে বলবে, ভেবেই পেল না। মন ভারী খারাপ হয়ে গেল টুনার কথা ভেবে।

ওরা আস্তে-আস্তে এগোল আবার। পথের ডান দিকে ভীমধারাকে রেখে। ক্রমশ রোদের তেজ বাড়তে লাগল। ঘাস-পাতার শিশির শুকোতে লাগল। নানান পাখি ডাকতে লাগল দু'পাশ থেকে। আধঘণ্টাটাক যাওয়ার পরে দূরে দেখতে পেল ওরা, একটি জিপগাড়ি আসছে উলটো দিক থেকে। কাছে আসতে নাম্বার-প্লেট দেখেই চিনতে পারল। এই জিপে করেই ওরা কাল এসেছে এখানে। কিন্তু ড্রাইভার বাইধর তো কাল রাতেই তার গ্রামে চলে গিয়েছিল। পুরুনাকোটেই তার বাড়ি। কালকে জিপ অবশ্য ঋজুদাই চালিয়ে এসেছিল সারাটা পথ। আর ওরা দু'জন সামনে বসে ছিল ঋজুদার পাশে। বাইধর পেছনে ছিল মালপত্র নিয়ে। কাছে আসতেই জিপটা থেমে গেল।

ঋজুদা বলল, "সুপ্রভাত। তোমরা কতক্ষণ ?"

ঋজুদাকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হল ওরা। সমস্বরে বলল, "মর্নিং, ভেরি গুড মর্নিং ইনডিড! কোথাও গিয়েছিলে ? আমরা বাঘ দেখলাম। বাঘ!"

"সত্যি ? কোথায় ?"

"এই তো, নালা পেরিয়ে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে গেল। এই একটু আগে।"

"তাই ? বাঃ। আর কী চাই ? একেই বলে টাইগার লাক!"

"তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?"

"টিকরপাড়ায়।"

"আমাদের নিয়ে গেলে না ?"

"যাব। তাড়া কিসের ? এখন তো ফিরে চলো। চানটান করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে তারপরই বেরনো যাবে। সব দেখিয়ে আনব। লাঞ্চও খেও টিটাগড় পেপার মিলের বাংলোতে। খুব ভাল বাবুর্চি

আছে। খাওয়ার কথা বলেও এসেছি। তোমাদের এখানে কষ্ট হচ্ছে, জানি। রাবার ফোমের ম্যাট্রেসে শোওয়া অভ্যেস, কাল রাতে তক্তার উপরে কি ঘুম হয়েছিল আদৌ ?"

"খুব। খুব। কী যে ভাল লাগছে কী বলব ! এ এক অন্য জগৎ !"

"এখানে খবরের কাগজ পাওয়া যায় না ?" দৃপ্ত শুধোল।

"এখানের খবর কাগজে ছাপা হয় না। গাছে-পাতায়, ফুলে-নদীতে, পাখির ডাকে, হরিণের চলার ছন্দে সব খবর লেখা থাকে, ঘোষিত হয় এই বোষ্টম-নালার ঝর-ঝরানিতে। এত শান্তির মধ্যে অশান্তির জন্য তুমি এত চঞ্চল হলে কেন দৃপ্ত ?"

"অশান্তি ?"

দৃপ্ত অবাক গলায় বলল।

"অশান্তি নয় ? গোর্বাচভ আমেরিকাকে কী বললেন ? খোমেইনি সালমন রুশদির মাথা চাইলেন, ফ্রান্সের মিতেঁর কোন সাগরের তলায় কত মেগাটন আণবিক বোমা ফাটালেন এসব জেনে আমাদের অশান্তি ছাড়া আর কী হয় ?"

"অজ্ঞ হয়ে থাকলেও কি ভাল হত, ঋজুদা ?"

ভোমরা বলল।

"বিজ্ঞ হয়েই কি লাভ হয়েছে খুব ? এসব ঠাণ্ডা মাথাতে ভেবে দেখার কথা। কিন্তু ভাবার সময়ই-বা কোথায় পাই আমরা ? 'ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস'—এইরকম একটা সত্যি কথা বোধ হয় আর বেশি হয় না।"

ভোমরা তখনও উপরের দিকেই চেয়ে ছিল।

ঋজুদা হেসে বলল, "তুমি দেখি এত কথার পরও উপরেই চেয়ে আছ। উপরে চাওয়ার শেষ নেই। নীচে তাকাও, শান্তি পাবে।"

দৃপ্ত আঙুল দিয়ে দেখাল উপরে। তারপরই মগডালে ঝাঁপাঝাঁপির আওয়াজ শোনা গেল। ঋজুদা ড্রাইভিং-সিট থেকে নেমে এসে উপরে চেয়ে বলল, "ওঃ। এ তো হিমালয়ান স্কুইরেল।"

"ফ্লাইং-স্কুইরেল ?" উত্তেজিত গলায় দৃপ্ত বলল।

"না-না। উড়ন্ত কাঠবিড়ালি এদের বলে না। আফ্রিকাতে আছে এক ধরনের। নিশাচর তারা। দেখে এসেছি। তাদের নামও অন্য। কিন্তু এমন ভাবেই এই কাঠবিড়ালিরা খুব উঁচু এক ডাল থেকে অন্য ডালে ঝাঁপায় যে, দেখে মনে হয় উড়েই যাচ্ছে যেন ! আসলে ওড়ে না। অপটিক্যাল ইল্যুশান হয়।"

ভোমরা বলল, "কিন্তু টুনা যে বলল ওগুলো নেপালি ইঁদুর।"

ঋজুদা হেসে ফেলল। বলল, "ওটা টুনাদেরই দেওয়া নাম। নেপালই ওদের কাছে হিমালয়। যেহেতু ইঁদুরের দৌড়াদৌড়ির সঙ্গে মিল আছে কিছু এদের দৌড়োদৌড়ির, তাই হয়তো বলে। কিন্তু কাঠবিড়ালি—কাঠবিড়ালিই ! এদের জায়ান্ট-স্কুইরেলও বলে। এদের চামড়া দিয়ে লেডিজ ওভারকোটের কলার হয়, সুন্দর হ্যান্ডব্যাগ হয়।"

ভোমরা বলল, "ওদের মাংস নাকি খুব ভাল খেতে। টুনা বলছিল।"

"তা হবে। আমি মেরেছি যদিও এক সময়, প্রেজেন্টও করেছি কাউকে কাউকে, যখন মারা নিষেধ ছিল না ; তবে কখনও মাংস খাইনি। ভাল অবশ্য হবারই কথা ! জংলি ও মেঠো ইঁদুর, কাঠবিড়ালি এসবের মাংস খেতে তো খুবই ভাল।"

"আপনি ইঁদুর খেয়েছেন ?"

"বহুবার। আমি শখ করেই খেয়ে দেখেছি, কিন্তু ভারতের সব জঙ্গলের গরিব অধিবাসী এবং আদিবাসীরাই এসব খায়। এইসবই তো একমাত্র প্রোটিন। টুনার চেহারাটা দেখেছ ? প্রোটিন জোটে না বলেই না বেচারার অমন চেহারা।"

বলেই ঋজুদা জিপ স্টার্ট করল।

বলল, "উঠে এসো।"

ওরা উঠে বসল।

ভোমরা বলল, "টুনারা, এখানের মানুষেরা খুবই গরিব, না ঋজুদা ?"

ঋজুদার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, "শুধু এখানেরই কেন ? ভারতবর্ষের সমস্ত বন-পাহাড়ের মানুষই বড় গরিব। সমতলের গাঁ-গঞ্জের মানুষও গরিব। কিন্তু তারা এদের তুলনাতে অনেকই বড়লোক। এই টুনারাই তো আমাদের আসল দেশ, ভোমরা।"

তৈলাতে পৌঁছেই চান সেরে নিল ওরা। ঋজুদা কুয়োর পাড়ে সরষের তেল মেখে চান করল। ওরা এক-এক করে ওই চানঘরে। নতুন পাতার আড়াল ছিল।

গরম-গরম পরোটা, ঝাল-ঝাল আলুর তরকারি, ঢেনকানল থেকে আনা ছানার পোড়-পিঠা এবং লেবুর আচার দিয়ে ওরা ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিল। টুনা তখন তৈলাতে কাজ করছিল। খেতে-খেতে ভোমরা বারবারই টুনার দিকে তাকাচ্ছিল। রোদ ঝকঝক করছে চারদিকে। গাছগাছালির পাতায়-পাতায়, বাঁশঝাড়ে তা প্রতিসরিত হয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে চারদিকে।

ঋজুদা একবার ভোমরার দিকে, আর একবার টুনার দিকে চাইল। তারপর বলল, "মহান্তি, তোমার আর টুনার জন্যও নাস্তা সব রেখেছ তো ? বিমলবাবু তো একেবারে এসে দুপুরের খাওয়াই খাবেন। আমরা কিন্তু দুপুরে খাব না। বাবুদের মহানদীর সাতকোশিরা গণ্ড দেখাতে যাব।"

মহান্তি বলল, "আমরা তো কখন খেয়ে নিয়েছি। মুড়ি আর চা।"

"তোমরা এসব খাবে না ? পরোটা-তরকারি ? পোড়-পিঠা ?"

মহান্তি ফোকলা দাঁতে হেসে বলল, "কুকুরের পেটে কি ঘি সহ্য হয় বাবু ? যাদের যেমন পেট।"

ঋজুদা ইংরিজিতে দৃপ্তকে বলল বিড়বিড় করে, "বিমলবাবুকে বলব। কিন্তু বলবটা কী ? বলার কিছু তো নেই। তা ছাড়া ব্যাপারটা একটু ডেলিকেটও। আমরা দু'দিনের জন্য এসে যদি পাকামি করি তো উনি ইনসালটেডও ফিল করতে পারেন। করাই স্বাভাবিক। আমরা ওঁর জায়গাতে থাকলেও করতাম। বিমলবাবু নিজেও তো আর তেমন কিছু বড়লোক নন ! তা ছাড়া সব জায়গাতেই পারিশ্রমিক ঠিক হয় চাহিদা আর যোগানের উপর। যদি সব লোকই বেকার থাকে বা খেতে না পায় তবে কে বা কারা আর মাইনে বেশি দেয় ? বিমলবাবু হাতির সঙ্গে, গন্বর সঙ্গে, শুয়োরের সঙ্গে যুদ্ধ করে সামান্য যতটুকু খেত-জমিন করছেন তা থেকে তো তাঁরও এমন বেশি কিছু জোটে না !"

"গভর্নমেন্ট রেট বেঁধে দিতে পারে না ?" ভোমরা বলল।

"তা পারে বইকী ! কিন্তু তা ফালতু হয়ে যায় যদি সত্যিই উৎপাদন না থাকে, টুনাদের মতো অনেক লোকের প্রয়োজন না থাকে। তানজানিয়াতে দেখেছি, সরকার আইন করে মাইনের রেট বেঁধে দিয়েছেন কিন্তু চাকরি নেই বলে বেশি টাকার রসিদ সই করে দিয়ে কম টাকাতেই কাজ করছে মানুষ। না-খেয়ে থাকার চেয়ে তো কিছু খাওয়া ভাল।"

"তা ঠিক।" দৃপ্ত বলল। তারপর বলল, "আমরা দু'দিন টুনাকে বা একে খাইয়ে তো এদের অবস্থা ফিরিয়ে দিতে পারব না ! বড়জোর মোটা বখশিশ দিয়ে যেতে পারি যাওয়ার সময়ে, নিজেদের বিবেককে তৃপ্ত করার জন্য। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝেছ ! এদের দু'জনের বা দু'জনের পরিবারের দুঃখমোচন করলে বা বিমলবাবুরও অবস্থা ফেরালেই তো আর আসল সমস্যাটার সমাধান হবে না। সমস্যাটার গোড়াটাতেই কুড়ুল মারা দরকার। যদি তা সম্ভব না হয় তা হলে ভুলে যাও তোমার এসব শৌখিন দরদের কথা।"

ভোমরা চোখ নামিয়ে নিল।

টুনা তৈলা থেকে এল। জল খেতে। ওদের সকলের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলল, "কেমন করেছে ? পরোটা ? ভাল ? মহান্তিদাদা আজকাল চোখে তো ভাল দেখে না। মাঝে-মাঝেই ডালে উচ্চিংড়ে দিয়ে দেয়। গত বছরে একবার খাসির মাংস রান্না করার সময়ে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়েছিল কড়াইয়ে। মহান্তিদাদা সেই ব্যাঙটাকেও খাসির সঙ্গে সেদ্ধ করে নুন-তেল - হলুদ মসলা মিশিয়ে দারুণ রান্না করেছিল। না জেনেই।"

মহান্তি এ-কথাতে চটে গিয়ে বলল, "দূর হ তু পিলা ! শুধু বড়দের নিয়ে ইয়ার্কি !"

টুনা কুয়ো থেকে বালতি করে জল তুলে, জল খেয়ে, গামছা দিয়ে হাত মুছে হাসতে হাসতে আবারও রৌদ্রালোকিত তৈলার দিকে ফিরে গেল।

একটা নীলকণ্ঠ পাখি শিহর তুলে ডাকতে ডাকতে তৈলার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। ভোমরা নীল পাখিটার নীলাকাশে মিলিয়ে যাওয়াটা দেখল। কী-একটা পাখি তৈলার ওপারের ঘন সবুজ জঙ্গল থেকে গম্ভীর গলায় ডাকছিল গুব-গুব-গুব-গুব-গুব করে।

ভোমরা তৈলার দিকে তাকাল এবারে, উদাস চোখে। পাহাড়ি সাদা মাথা শকুনেরা উড়ছিল উজ্জ্বল কলুষহীন নীল আকাশের অনেক উপরে। চক্রাকারে। টুনাকেই দেখছিল কি তারা তীক্ষ্ণ চোখে ? যেমন করে মুমূর্ষু জানোয়ারদের দেখে।

দৃপ্ত ডাকল, "ভোমরা !"

ভোমরা মুখ ফেরাল দৃপ্তর দিকে। ঋজুদা ও দৃপ্ত দুজনেই দেখল জল টলটল করছে তার চোখে।

ঋজুদা বলল, "জানো, মাঝে-মাঝেই ভাবি, প্রকৃতি বড় সুন্দর। প্রকৃতি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করে সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষও কম সুন্দর নয়, তাই না ? মানুষই যদি বেঁচে না থাকে তবে প্রকৃতিকে এবং অন্য মানুষদেরও বাঁচিয়ে রাখবেটা কে বা কারা ? বলো ? কথাটা ঠিক কি না !"

ভোমরা জলভরা চোখে মাথা ঝাঁকিয়ে ঋজুদার কথায় সায় দিল।

ঋজুদা ডাকল, "টুনা !"

টুনা ঘাড় ঘুরিয়ে হাসিমুখে তাকাল ওদের দিকে।

ভোমরার মনে হল, এই হাসিমাখা মুখটি চিরজীবনই ফ্রিজ-শট হয়ে রয়ে যাবে ওর চোখে।

ঋজুদা বলল, "আমি, দৃপ্ত কি তুমিও নয় ভোমরা, দিল্লি বম্বে বাঙ্গালোর কলকাতা ম্যাড্রাস শহরের বাসিন্দারাও নয়, অগণ্য ফ্লাই-ওভার, অগণ্য ঝকঝকে গাড়ি, যারা খেতে-পরতে পায় তাদের আরও ভাল থাকার দাবির মিছিলে আর স্লোগানে সরগরম প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীর মানুষেরাও নয় ; এই টুনা, মহান্তি, বিমলবাবু, বাইধর এদের নিয়েই আমাদের আসল দেশ। স্বদেশ। এক বিরাট অজগর ঘুমিয়ে আছে। আর তার মাথায় শালু নিয়ে স্লোগান দিয়ে ধেই-ধেই করে নাচছে অগণ্য স্বার্থপরায়ণ দলের মানুষেরা। এই অজগর যেদিন ঘুম ভেঙে উঠবে, সবচেয়ে আগে সে গিলবে এই নাচুনে বক্তৃতাবাজদেরই। এতে কোনও ভুল নেই। নাচুনেরা তা জানে না।"

"কিন্তু কবে ?" ভোমরা বলল।

ঋজুদা, টুনার দিকে চেয়ে রইল, মুখে কোনও কথা না বলে। একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল শুধু।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

নাম দিতে চাই

সুদেব বকসী

এই ছেলেটা, নাম কী তোমার ? নেই যে মুখে কথা !
নাম কিছু নেই ? চুপটি কি তাই ? ভাঙছে যে নাম-প্রথা !
নাম-না-থাকা ভীষণ ব্যাপার ! তাই বুঝি নও নামী ?
আমরা তবে কোমর বেঁধে নাম দিতে আজ নামি ।
অ্যাদ্দিনে কেউ দেয়নি কি নাম ? সবাই ভুলোভালা,
আহা, তোমার কী কষ্ট যে, মন কি ঝালাপালা !
তোমার কোনো নাম দিতে চাই, আমরা নিলাম ব্রত ;
নামের দেশে নামের অভাব ? নাম তো কতশত !
নাম রয়েছে ফুলের নামে, নাম রয়েছে পাতার,
নাম রয়েছে অঢেল অগাধ—অভাব কি নামদাতার ?
নাম রয়েছে তারায়-তারায়, নিরুদ্দেশের নীলে,
পরিয়ে দেব নামের মালা আমরা সবাই মিলে ।
নামে কোথায় কী যায়-আসে, যানে, পদব্রজে—
নাম আনা চাই, নাম জানা চাই, যাচ্ছি নামের খোঁজে ।
কী নাম রাখি, কী নাম রাখি, কী নাম যে দিই এখন,
সে নামটা হোক শুনতে দারুণ, সে নামটা হোক দ্যাখন ।
নাম দেওয়া নয় সহজ তত, ভাবনা মনের কোণে,
নাম বলো তো বাবার, পিসির কিংবা ছোটি বোনের ।
এসব থেকেও নামের আভাস মিলতে পারে কিছু,
নাম রয়েছে নামের ভেতর, নামের আগুপিছু !
নাম পাওয়া যায় স্বভাব থেকে, স্বভাবটা ঠিক কেমন ?
দুষ্টপনা ভাব রয়েছে কিংবা যেমন তেমন !
নামেও নানা ছন্দ থাকে, নাম কি নিজেই কবি ?
নামের ভেতর উথাল-পাথাল, তাথৈ নাথৈ, সবই ।
নামের রঙে ছবি আঁকাই, নামেও যে সুর বাজে,
নাম দেওয়াটা মনের খেলা—মনের কারুকাজে !
নাম-দেওয়া-ভাব চলুক তবে, নামটা হবে পরে,
তার মানে তো অযুতটা নাম, তোমার নামের ঘরে ।

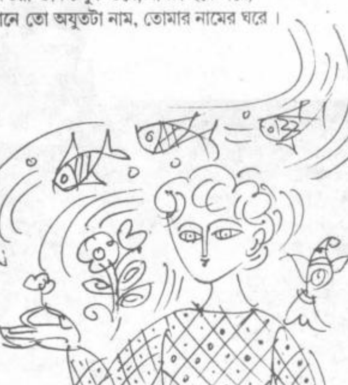

কই সে বালক

আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পড়ে আছি শূন্য হাতে সবুজ ঘাসে কই সে বালক,
আঁস্তাকুড়ের আস্তানাটা বাঁধো এবার সুখের পালক
ঘরটা যখন বাঁধলে আমার ইচ্ছেখুশির রঙ ধরানো
খিলটা দিয়ে ভাবছি বসে কাটিয়ে দেব শেষ জীবনও
এমন সময় খটখটাখট শব্দ নেচে ওই সে এল,
বাঃ এ তো বেশ ঘরটা তোমার, অনাহুতের লাগল ভাল
বললে হেসে, আর এখানে, তোমার এবার থাকা কেন
যাও খুঁজে নাও অন্য কোথাও আস্তানাটা পাও তো চেনো
জলের স্রোতে ধানের খেতে পথের ধুলোয় চলছি হেঁটে
পরম্পরায় ভাঙছে মাথায় এমনিতে দিন যাচ্ছে কেটে ।
পড়ে আছি শূন্য হাতে সবুজ ঘাসে কই সে বালক
আঁস্তাকুড়ের আস্তানাটা বাঁধো এবার সুখের পালক
এমন সময় খটখটাখট শব্দ নেচে ওই সে এল,
তোমার এবার থাকা কেন আর এখানে ; এগিয়ে চলো ।
বলছি রেগে এ উদ্বেগে পথ ঘোরানোয় কী মনোভাব
বললে হেসে থাকলে বসে ছাড়বে না তো তোমার স্বভাব ।
অরণ্যতে বাস করো যে, সভ্যতাকে খোঁজ করোগে—
সভ্যতাতেই বসেই আছি, আবার কেন খোঁজা তাকে ?
বললে তখন, তুমি যখন বাঁধছ বাসা সভ্যতাতে,
এবার তোমার বাস হল তা অরণ্যের ওই স্তব্ধ হাতে ।
ভাবছি মনে সঙ্গোপনে আলোর বিকাশ ফুটবে কবে,
থাকব বসে কাজের শেষে পাওনা যেদিন সুখী হবে !
পড়ে আছি শূন্য হাতে সবুজ ঘাসে কই সে বালক,
আঁস্তাকুড়ের আস্তানাটা বাঁধা এবার সুখের পালক ।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ডিফেন্স সার্ভিসে যেতে হলে

অমর দাশ

প্রত্যেক অভিভাবকই তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। তাঁরা চান এমনভাবে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করুক, যাতে পড়াশোনার শেষে তারা সহজে নিজেদের রোজগারের পথ করে নিতে পারে। আমাদের প্রতিরক্ষাবিভাগে এরকম অনেক সুযোগ রয়েছে, যেখানে পড়াশোনাও চলতে থাকবে এবং পড়াশোনা শেষ হয়ে গেলে প্রতিরক্ষাবিভাগে ভাল চাকরি পাওয়াও সম্ভব হবে। নয়াদিল্লির ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, বছরে দু'বার করে ন্যাশনাল ডিফেন্স অকাদেমি পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এ ছাড়া তাঁরা কমবাইণ্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস পরীক্ষাও গ্রহণ করেন মে এবং অক্টোবর মাসে। এইসব পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে প্রতিরক্ষা বিভাগে ভাল পদে চাকরির গ্যারান্টি থাকে। তবে পড়াশোনা, ট্রেনিং যথাযথভাবে শেষ করা চাই।

এসব পরীক্ষার নাম শোনার সঙ্গে-সঙ্গে পরীক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার কৌতূহল আমাদের অনেকেরই। ন্যাশনাল ডিফেন্স অকাদেমি পরীক্ষার মাধ্যমে আর্মি, নেভি এবং এয়ারফোর্সের বিভিন্ন শাখার কোর্সে ভর্তি করা হয়। এখানে তিন বছরের ট্রেনিং এবং পড়াশোনার শেষে সফল প্রার্থীকে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি· এ/ বি· এসসি ডিগ্রি দেওয়া হয়ে থাকে। পড়াশোনা চলার সময় থাকা-খাওয়ার জন্য কোনও টাকা লাগে না। কোর্স শেষে ইণ্ডিয়ান মিলিটারি অকাদেমির বিশেষ ট্রেনিং নেওয়ার পর প্রতিরক্ষা বিভাগে একুশ থেকে তেইশ বছর বয়সেই কমিশনড্ অফিসার হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ! আর পড়াশোনা নিয়ে দুশ্চিন্তার বালাই নেই। সুন্দর পরিবেশে মিলেমিশে নিজেকে আবিষ্কার করার এক অপূর্ব সুযোগ রয়েছে এখানে। রয়েছে ইনডোর ক্লাব, সেখানে ছবি আঁকা, নাটক, বিতর্ক ইত্যাদি বিষয় চর্চা করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। বিদেশী ভাষা শেখার আগ্রহ থাকলে সেটা মেটানোরও ব্যবস্থা আছে এখানে। আর শুধু ঘরে বসে নয়, বাইরের হাতছানিরও সুযোগ অপেক্ষা করছে আউটডোর ক্লাবে। সেখানে অটোমোবিল, অ্যাঙ্গলিং, গল্ফ, গ্লাইডিং, জিমনাস্টিক্স, পোলো, পিস্তল শুটিং, ফোটোগ্রাফি, ইয়টিং, ট্রেকিং, মাউন্টেনিয়ারিং সবকিছুই শেখা যেতে পারে।

পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্র রয়েছে : আগরতলা, আমেদাবাদ, আইজল, এলাহাবাদ, বাঙ্গালোর, ভোপাল, বোম্বাই, কলকাতা, চণ্ডীগড়, কোচিন, কটক, দিল্লি, ধারওয়াড়, দিশপুর, গ্যাংটক, হায়দরাবাদ, ইমফল, ইটানগর, জয়পুর, জম্মু, যোরহাট, কোহিমা, লখনউ, মাদ্রাজ, মাদুরাই, নাগপুর, পানাজি, পাটনা, পোর্টব্লেয়ার, রায়পুর, সম্বলপুর, শিলং, সিমলা, শ্রীনগর, তিরুপতি, ত্রিবান্দ্রম, উদয়পুর, বিশাখাপত্তনম শহরে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়।

কারা পরীক্ষায় বসতে পারবে

এবার জানা দরকার কারা পরীক্ষায় বসার অধিকারী ? অর্থাৎ, শিক্ষাগত যোগ্যতা কী এবং বয়সই বা কত হওয়া দরকার ? ন্যাশনাল ডিফেন্স অকাদেমির আর্মি, নেভি এবং এয়ারফোর্স শাখায় ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ১০+২ পর্যায়ের দ্বাদশশ্রেণীর পরীক্ষায় পাশ হতে হবে। নেভাল অকাদেমির এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চের কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীকে উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিক্স-সহ পাশ করতে হবে। যেসব প্রার্থী দ্বাদশশ্রেণীর পরীক্ষায় পাশ করেনি, অথচ সেইবছর পরীক্ষা দেবে সেইসব প্রার্থীও পরীক্ষায় বসতে পারে। তবে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তাদের ওই পরীক্ষায় পাশের প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। লিখিত পরীক্ষায় পাশের পর মৌখিক পরীক্ষায় পাশ করে গেলে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে আর্মি হেড কোয়ার্টার্স রিক্রুটিং (এন ডি এ এন্ট্রি) ওয়েস্ট ব্লক তিন, আর কে পুরম, নয়াদিল্লি ১১০০৬৬ এই অফিসে। নেভাল অকাদেমির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার ঠিকানা : নেভাল হেড কোয়ার্টার্স, আর অ্যাণ্ড আর সেকশন, ২০৬ সি উইং, সেনাভবন, নয়াদিল্লি ১১০০১১। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যেই এইসব সার্টিফিকেট জমা দিতে হয়। যে-ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি সে-ক্ষেত্রে 'অরিজিনাল মার্কসিট' জমা দিতে হবে।

প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, কোর্স শুরুর প্রথমদিনে তাঁর বয়স হতে হবে সাড়ে ষোলো বছর থেকে উনিশ বছরের মধ্যে। তা ছাড়াও প্রার্থী হবে অবিবাহিত।

পরীক্ষার ফি

এই পরীক্ষায় বসতে হলে নির্দিষ্ট আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সঙ্গে পরীক্ষার ফি বাবদ আঠাশ টাকার রেখিত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার, অথবা সেন্ট্রাল রিক্রুটমেন্ট ফি স্ট্যাম্প জমা দিতে হবে। ব্যাঙ্ক ড্রাফটেও দেওয়া যেতে পারে। এসব কিছুই দিতে হবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুকূলে। তপশিলিভুক্ত জাতি এবং উপজাতি প্রার্থীদের কোনও ফি দিতে হবে না।

কীভাবে আবেদন করতে হবে

যেসব ছেলেমেয়ে এই পরীক্ষায় বসতে আগ্রহী, তাদের সেক্রেটারি, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ঢোলপুর হাউস, নয়াদিল্লি ১১০০১১ ঠিকানায় আবেদন করতে হবে। এই সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্রে এবং বিশেষ করে ভারত সরকারের 'এমপ্লয়মেন্ট নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। সেখান থেকে দেখে নির্দিষ্ট প্রোফর্মায় টাইপ করা দরখাস্ত পাঠাতে হয়। সঙ্গে দিতে হয় প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র এবং নির্দেশিত কাগজপত্র। সাধারণত, পরীক্ষা গ্রহণের চার-পাঁচ মাস আগেই নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি বেরিয়ে যায়। যেমন, আগামী ২২ অক্টোবর '৮৯ তারিখের পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছে ২০ মে এমপ্লয়মেন্ট নিউজ পত্রিকায়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পরে পূরণ করা আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য দেড়মাসের ওপর সময় পাওয়া যায়।

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে এমনসব প্রার্থীর নামের তালিকা প্রস্তুত করেন এবং তাদের পরবর্তী মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকেন। সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড প্রার্থীদের পার্সোনালিটি টেস্ট এবং ইনটেলিজেন্স টেস্ট নিয়ে থাকেন। তাঁরা এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীর অফিসার হওয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতা এবং এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে পাইলট হওয়ার ক্ষমতা এবং বুদ্ধিমত্তা যাচাই করে দেখেন। তাঁরা ফাইনাল পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষা এবং সার্ভিস সিলেকসন বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তিনটি আলাদা আলাদা তালিকা প্রস্তুত করেন আর্মি, নেভি এবং এয়ারফোর্স কোর্সে ভর্তি করার জন্যে। উপর্যুপরি মেডিকেল ফিটনেসের ব্যাপারও রয়েছে।

লিখিত পরীক্ষা

ম্যাথমেটিক্স এবং জেনারেল এবিলিটি—এই দু' বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। দু'টি ক্ষেত্রেই আড়াইঘণ্টার পরীক্ষা। ম্যাথমেটিক্সে ৩০০ নম্বর এবং জেনারেল এবিলিটি টেস্টে ৬০০ নম্বর। ইংরেজিতে প্রশ্ন থাকে। আর সব প্রশ্নই থাকে অবজেকটিভ। সব প্রার্থীকে এসব তথ্যবিষয়ে ইনফরমেশন ম্যানুয়াল দেওয়া হয়। ম্যাথমেটিক্সের মধ্যে আছে অ্যারিথমেটিক, মেনসুরেশন, অ্যালজেবরা, জিওমেট্রি, ট্রিগনোমেট্রি, এবং স্ট্যাটিস্টিক্স। অ্যারিথমেটিকের মধ্যে নাম্বার সিস্টেম্স, ন্যাচারাল নাম্বারস, অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, মালটিপ্লিকেশন, ডিভিশন, স্কোয়ার রুটস, ডেসিমিল ফ্র্যাকশন, টাইম অ্যাণ্ড ডিসট্যান্স, টাইম অ্যাণ্ড ওয়ার্ক, পার্সেন্টেজ, ভ্যারিয়েশন, এল সি এম, এইচ সি এফ সবই রয়েছে। অ্যালজেবরা অংশে আছে সিম্পল ফ্যাকটরস, এইচ সি এফ, এল সি এম, সলিউশন, লিনিয়ার ইকুয়েশন, সেট ল্যাঙ্গুয়েজ, ল অব ইনডিসেস ইত্যাদি। জিওমেট্রিতে থাকছে লাইন্স অ্যাণ্ড অ্যাঙ্গেলস, থিওরেম অন প্রপার্টিজ অব অ্যাঙ্গেল্স অ্যাট এ পয়েন্ট, প্যারেলাল লাইনস, সাইড্স অ্যাণ্ড অ্যাঙ্গল্স অব এ ট্র্যাঙ্গেল, প্রপার্টিজ অব অ্যাঙ্গেল্স, সার্কেল অ্যাণ্ড প্রপার্টিজ, প্যারেলেলোগ্রাম ইত্যাদি। আছে ট্রিগোনোমেট্রি। স্ট্যাটিস্টিক্সের মধ্যে কালেকশন অ্যাণ্ড ট্যাবুলেশন অব স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা, গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেনটেশন—ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন্স, হিস্টোগ্রাম, বার চার্ট, পাই চার্ট, মিন প্রভৃতি।

জেনারেল এবিলিটি টেস্টের দু'টি অংশ। পার্ট 'এ'তে থাকছে ইংরেজি। মোট ২০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকে। গ্রামার অ্যাণ্ড ইউসেজ, ভোকাবুলারি, কমপ্রিহেনশন অ্যাণ্ড কোহেশন ইত্যাদি। পার্ট 'বি'তে থাকে জেনারেল নলেজ। ৪০০ নম্বরের পরীক্ষা। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, জেনারেল সায়েন্স, সোসাল স্টাডিজ, জিওগ্রাফি এবং কারেন্ট ইভেন্টস ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন থাকে। প্রথম অংশে থাকে ফিজিক্স, দ্বিতীয় অংশে কেমিস্ট্রি, তৃতীয় অংশে জেনারেল সায়েন্স, বিশেষ করে লাইফ সায়েন্সের ওপর নানা প্রশ্ন। চতুর্থ অংশে থাকে ইতিহাস, স্বাধীনতা আন্দোলন সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন। ভারতীয় সংবিধান, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পঞ্চায়েতিরাজ, ভূদান, সর্বোদয়, মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা বিষয়েও প্রশ্ন থাকে। পঞ্চশীল, গণতন্ত্র, রাষ্ট্রপুঞ্জ ইত্যাদি বিষয়েও প্রশ্ন দেওয়া হয়। পঞ্চম অংশে থাকে জিওগ্রাফি এবং ষষ্ঠ অংশে কারেন্ট ইভেন্টস।

লিখিত পরীক্ষা ছাড়াও প্রার্থীদের ইনটেলিজেন্স টেস্ট দিতে হয়। এর মধ্যে থাকে গ্রুপ ডিসকাশন, গ্রুপ প্ল্যানিং, আউটডোর গ্রুপ টাস্ক ইত্যাদি। সব মিলিয়ে মোট পরীক্ষা হয় ৯০০ নম্বরের মধ্যে। অনেক সময় লক্ষ করা যায়, লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েও অনেক প্রার্থী শারীরিক কারণে বাতিল হয়ে যায়। মেডিকেল বোর্ডের মেডিকেল টেস্টে যোগ্য বিবেচিত হওয়ার পরেই কোর্সে ভর্তির সুযোগ মেলে। প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় উচ্চতার অনুপাতে শরীরের ওজন থাকা দরকার। এটা জানা থাকলে প্রার্থীদের সুবিধা হবে।

ভর্তির সময় প্রার্থীকে ১৬২৫ টাকা জমা

দিতে হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন রাজ্য সরকার তাঁদের রাজ্যের প্রার্থীদের জন্য বিভিন্ন বৃত্তি দিয়ে থাকেন। এখান থেকে ভালভাবে পাশ করার পর সন্তোষজনক বেতনে চাকরি পাওয়া যায় এবং উত্তরোত্তর প্রমোশন পেয়ে চাকরিতে উন্নতির সোপানও খোলা থাকে।

কমবাইণ্ড ডিফেন্স পরীক্ষা

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিরক্ষা বিভাগের বিভিন্ন অকাদেমিতে ভর্তির জন্য বছরে দু'বার—মে এবং অক্টোবর মাসে কমবাইণ্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হওয়া যায় এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে : এক, ইণ্ডিয়ান মিলিটারি অকাদেমি, দেরাদুন ; দুই, নেভাল অকাদেমি, গোয়া ; তিন, এয়ারফোর্স স্টেশন বেগমপেট, সেকেন্দ্রাবাদ ট্রেনিং কোর্স এবং চার, অফিসার্স ট্রেনিং অকাদেমি, মাদ্রাজ।

সারাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরীক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। ন্যাশনাল ডিফেন্স অকাদেমির মতো প্রায় একই শহরে এই পরীক্ষাকেন্দ্র থাকে।

যোগ্যতা

ইণ্ডিয়ান মিলিটারি অকাদেমি, দেরাদুনে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে স্নাতক হতে হবে এবং তার বয়স হবে ১৯ বছর থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। নেভাল ও এয়ারফোর্স অকাদেমিতে ভর্তি হলে প্রার্থীকে ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিকস-সহ সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট অথবা এঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট (বি· ই) হতে হবে। বয়স হবে ১৯ থেকে ২২ বছরের মধ্যে। এঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েটদের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা ২০ থেকে ২৭ বছর। যারা স্নাতকস্তরে এসব বিষয় নিয়ে পাশ করেনি, অথচ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এসব বিষয় নিয়ে পাশ করেছিল তারাও আবেদন করতে পারবে। বয়স হবে ১৯ থেকে ২২ বছরের মধ্যে। অফিসার্স ট্রেনিং অকাদেমির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা ১৯ বছর থেকে ২৫ বছর। যেসব প্রার্থী স্নাতক হয়নি, অথচ ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাশের প্রমাণপত্র দাখিল করে এই পরীক্ষায় বসতে পারে।

ন্যাশনাল ডিফেন্স অকাদেমির পরীক্ষার মতো এই পরীক্ষার ফি-ও আঠাশ টাকা। একই পদ্ধতিতে জমা দিতে হবে। তপশিলি জাতি/উপজাতির প্রার্থীদের কোনও ফি দিতে হবে না।

কীভাবে আবেদন করতে হবে

এই পরীক্ষাসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয় এমপ্লয়মেন্ট নিউজ এবং জাতীয় সংবাদপত্রগুলিতে। সাধারণত মে টার্মের পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি বেরোয় আগের বছরের নভেম্বর মাসে, এবং অক্টোবর টার্মের বিজ্ঞপ্তি বেরোয় সেই বছরের মে মাসে। নির্দিষ্ট প্রোফর্মায় আবেদন করতে হয় এবং পাঠাতে হয় একই পদ্ধতিতে, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিসে। সঙ্গে দিতে হয় প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র, পরীক্ষার ফি (ড্রাফ্‌ট, পোস্টাল অর্ডার কিংবা সেন্ট্রাল রিক্রুটমেন্ট স্ট্যাম্প-এ)।

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেরিট লিস্ট প্রস্তুত করেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সার্ভিস সিলেকশন বোর্ডের সামনে হাজির হতে হয় ইনটেলিজেন্স এবং পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য। ফাইনাল পর্যায়ে উভয় পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেরিট লিস্ট তৈরি হয়। মেডিকেল টেস্টের পর সেইসব প্রার্থীকে বিভিন্ন অকাদেমিতে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি করা হয়।

ইণ্ডিয়ান মিলিটারি অকাদেমি, নেভাল অকাদেমি এবং এয়ার ফোর্স অকাদেমিতে ভর্তি হতে হলে তিনটি বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় বসতে হয়। ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞান এবং এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স। প্রতিটি বিষয়ে দু'ঘণ্টার পরীক্ষা। একশো নম্বর হিসেবে মোট তিনশো নম্বরের পরীক্ষা। অফিসার্স ট্রেনিং অকাদেমির প্রার্থীদের ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রতিটি পত্র দু'ঘণ্টার এবং ১০০ নম্বর হিসেবে মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা।

সাধারণত প্রার্থীর ন্যূনতম উচ্চতা হওয়া চাই ১৫৭·৫ সেমি। কিন্তু নেভির ক্ষেত্রে ১৫৭ সেমি এবং এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে ১৬২·৫ সেমি।

দেরাদুনের ইণ্ডিয়ান মিলিটারি অকাদেমিতে ভর্তির সময় প্রার্থীকে দিতে হয় ২২০০ টাকা। গোয়ার নেভাল অকাদেমিতে ১৮৬০ টাকা, এয়ারফোর্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কলেজে ১৮৬৫ টাকা এবং মাদ্রাজের অফিসার্স ট্রেনিং অকাদেমিতে ভর্তির সময় দিতে হয় ১৪০০ টাকা।

সব কোর্সের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন 'স্কলারশিপ স্কিম' রয়েছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ন্যাশনাল ডিফেন্স অকাদেমির পরীক্ষার মতো কমবাইণ্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস পরীক্ষাতেও লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের সঙ্গে ইনটেলিজেন্স এবং পার্সোনালিটি টেস্ট নেওয়া হয়। সবশেষে, মেডিকেল বোর্ডের বিভিন্ন ফিটনেস টেস্ট তো আছেই।

দেরাদুনের ইণ্ডিয়ান মিলিটারি অকাদেমিতে ১৮ মাসের ট্রেনিং নিতে হয়। ট্রেনিংয়ের সময় থাকা-খাওয়ার সমস্ত খরচ সরকার বহন করেন। শুধু হাতখরচ প্রার্থীকে বহন করতে হয়। কোনও প্রার্থী সে-বিষয়ে অসমর্থ হলেও আর্থিক সাহায্য মঞ্জুরির ব্যবস্থা আছে। সফল ট্রেনিং শেষে প্রার্থী সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদার স্থায়ী কমিশন পায়। উত্তরোত্তর উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

তেমনি গোয়ার নেভাল অকাদেমিতে ভর্তি হলে ৩০ মাসের ট্রেনিং নিতে হয়। ছ' মাসের নেভাল ওরিয়েন্টেশন কোর্স, অ্যাফ্লোট ট্রেনিংশিপে ক্যাডেট ট্রেনিং, মিডশিপমেন অ্যাফ্লোট ট্রেনিং, সাব-লেফটেন্যান্ট টেকনিক্যাল কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করতে হয়। এর পর ইণ্ডিয়ান নেভালশিপে নেভাল ওয়াচকিপিং সার্টিফিকেটের জন্য অন্তত ছ'মাস ট্রেনিং নিতে হবে। প্রথম ছ' মাস ট্রেনিংয়ের শেষে মিডশিপমেনে উন্নীত হওয়ার পর থেকে ভাতা ইত্যাদি পাওয়া যায়। যেসব প্রার্থী আর্থিক সহায়তা পেতে চায়, তাদের ভর্তির সঙ্গে-সঙ্গেই আবেদন করতে হয়। ট্রেনিংকালে সমস্ত খরচ সরকার বহন করেন। শুধুমাত্র মাসিক ১৪০টাকা হারে হাতখরচ বহন করতে হয় প্রার্থীকে। সেক্ষেত্রেও আর্থিক সাহায্য মঞ্জুরির ব্যবস্থা রয়েছে।

মাদ্রাজের অফিসার্স ট্রেনিং অকাদেমিতে প্রার্থীকে ন' মাসের ট্রেনিং নিতে হয়। সফলভাবে ট্রেনিং শেষ করলে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদার শর্ট সার্ভিস কমিশন পাওয়া যায়। পাঁচ বছর পর তাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হলে স্থায়ী কমিশন দেওয়া হয়।

এয়ারফোর্স অকাদেমিতে ফ্লাইং ব্রাঞ্চে দু'ভাবে প্রার্থী মনোনীত হয়। এক, এই পরীক্ষার মাধ্যমে ; দুই, এন· সি· সি ইউনিটের মাধ্যমে। মোট ৭৫ সপ্তাহ ট্রেনিং নিতে হয়। ট্রেনিংয়ের সময় মাসিক ৯০ টাকা হারে হাতখরচ বাদে সমস্ত খরচ বহন করেন সরকার। তবু যেসব প্রার্থী আর্থিক সহায়তা পেতে চায় তাদের সেই মর্মে আবেদন করতে হয়। প্রসঙ্গত বলে রাখি, যেসব ছাত্রছাত্রী তাদের গ্র্যাজুয়েশনের সময় এন· সি· সি·তে এয়ার উইং ক্যাডেট হিসেবে ট্রেনিং শেষ করে 'সি' সার্টিফিকেট পায়, তারা প্রি-ফ্লাইং ট্রেনিং কলেজ, এয়ারফোর্স স্টেশন, বেগমপেট, হায়দরাবাদে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারে। বয়স, দৈহিক পরিমাপ ইত্যাদি যথাযথ হওয়া চাই। ☙

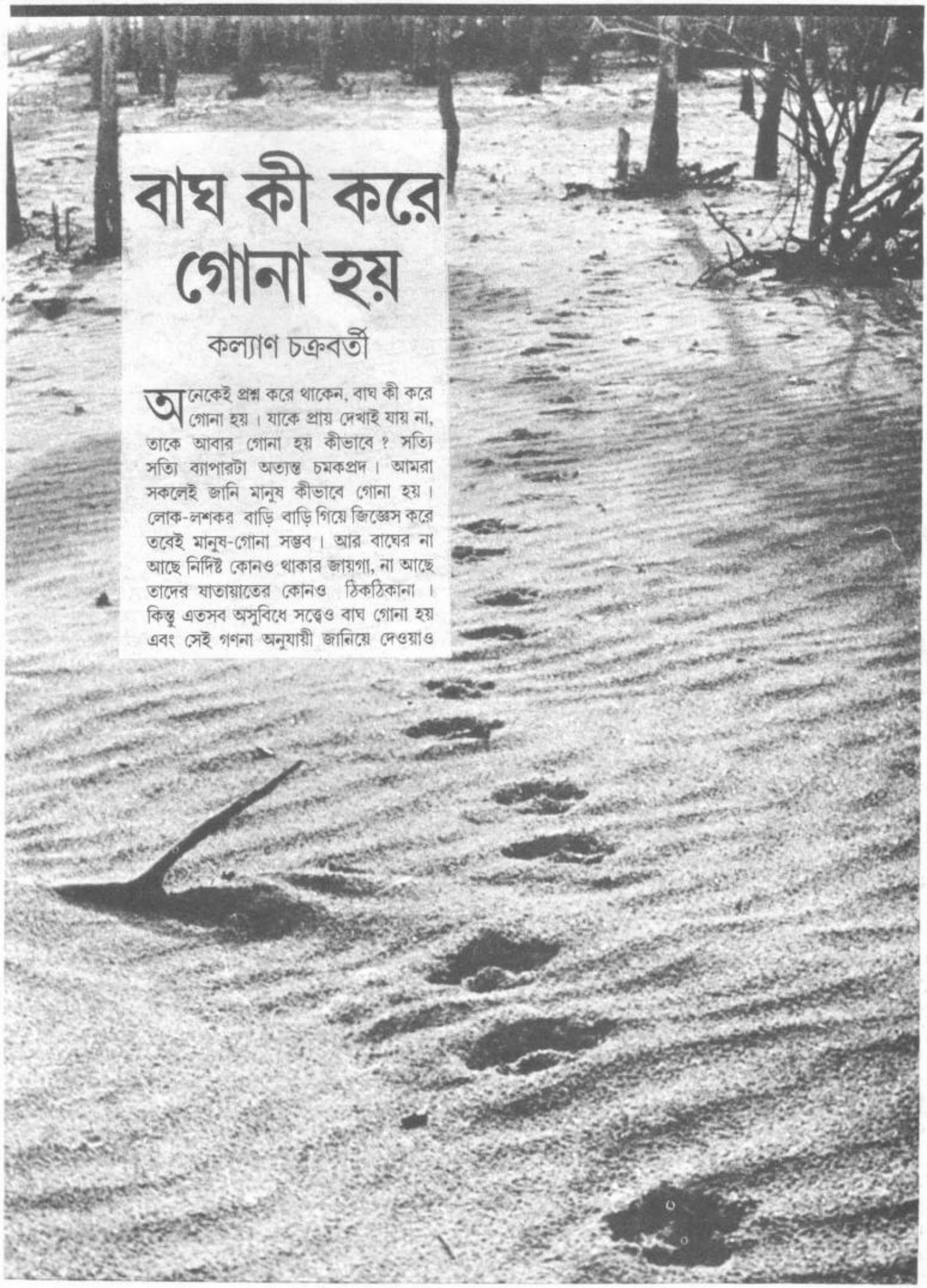

বাঘ কী করে গোনা হয়

কল্যাণ চক্রবর্তী

অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন, বাঘ কী করে গোনা হয়। যাকে প্রায় দেখাই যায় না, তাকে আবার গোনা হয় কীভাবে? সত্যি সত্যি ব্যাপারটা অত্যন্ত চমকপ্রদ। আমরা সকলেই জানি মানুষ কীভাবে গোনা হয়। লোক-লশকর বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করে তবেই মানুষ-গোনা সম্ভব। আর বাঘের না আছে নির্দিষ্ট কোনও থাকার জায়গা, না আছে তাদের যাতায়াতের কোনও ঠিকঠিকানা। কিন্তু এতসব অসুবিধে সত্ত্বেও বাঘ গোনা হয় এবং সেই গণনা অনুযায়ী জানিয়ে দেওয়াও

সম্ভব হয় যে, কোন বনে কত বাঘ আছে—ক'টি পুরুষ, ক'টি স্ত্রী ও ক'টিই বা বাচ্চা।

প্রশ্ন হল, বাঘ-গণনা করা হয় কেন? মানুষ-গণনার কারণগুলো আমাদের জানা আছে। আমাদের যে কোনও পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য যেহেতু মানুষ, তাই কোনও পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করতে মানুষ গণনার অন্য কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু বাঘের গণনা কার কী কাজে লাগে। একবার তো সুন্দরবনের একজন স্থানীয় ভদ্রলোক বাঘ-গণনাকে সমুদ্রের ঢেউ-গণনার সঙ্গে তুলনা করে জিজ্ঞেস করে ফেললেন যে, আমরা বাঘ-গণনা করে অর্থের অপচয় করছি কেন? আমি তাকে সহজভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, বাঘের সংখ্যা জানার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্যের মূল্যায়ন করা। কারণ জীববিজ্ঞানরূপী পিরামিডের শীর্ষে রয়েছে বাঘ। তাই তার সংখ্যা বাড়া বা কমা সমগ্র পরিবেশকেই প্রভাবিত করে। পরিবেশের স্বাস্থ্যও নির্ণয় করা সম্ভব হয় এই ধরনের গণনার মধ্য দিয়ে। আখেরে মানুষই হয় উপকৃত। মানুষের স্বার্থেই বাঘ-গণনা এ-কথাও সেদিন সেই ভদ্রলোককে বলেছিলাম। যাই হোক, বাঘ-গণনার প্রয়োজন নিয়ে এর বেশি আলোচনার সুযোগ নেই। কিন্তু এই গণনার কাজ কীভাবে করা হয়, সেটাই বহু মানুষেরই কৌতূহলের বিষয়।

শিক্ষণপ্রাপ্ত যথেষ্ট সংখ্যক গণনাকারীকে কোনও বিশেষ বনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাঘ গোনার কাজে নিয়োগ করা হয়।

কয়েকটি বিশেষ তথ্য গণনাকারীরা সংগ্রহ করেন। কোনও বিশেষ স্থানে ক'টি বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গেল, সেই ছাপগুলোর বিশেষত্ব কী, তা নির্ণয় করতে হয়। কারণ, বাঘের পায়ের ছাপ থেকে কোনটি পুরুষ, কোনটি স্ত্রী, আবার কোনটি বাচ্চা তা নির্ণয় করা বিশেষজ্ঞের পক্ষে সম্ভব। তবে পায়ের ছাপটি সঠিকভাবে নির্ণয় করা দরকার। প্লাসটার অব প্যারিস দিয়ে মাটি থেকে পায়ের ছাপ তুলে নিয়ে তাতে নম্বর লাগাতে হয়। বাঘ-গণনার এটি প্রাথমিক পর্যায়। তা ছাড়া, গণনার সময়ের মধ্যে বাঘের মলমূত্র ত্যাগ করার ঘটনাও নজরে রাখা দরকার। গাছের ওপরে, মাটিতে বা অন্য কোথাও বাঘের নখের আঁচড় বা অন্য কোনও চিহ্ন পেলে সেটি গণনার জন্য বিশেষভাবে তৈরি পরিসংখ্যানে লিখে রাখতে হয়। সেটা কী ধরনের বাঘ (পুরুষ, স্ত্রী বা বাচ্চা) তাও বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

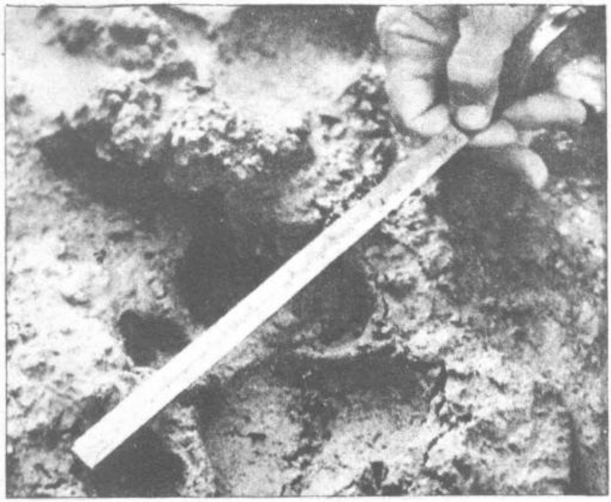

বাঘের পায়ের ছাপের মাপ নেওয়া হচ্ছে

কোনও বাঘের গলার আওয়াজ পেলে সেটি পরিসংখ্যান ভুক্ত করাও অবশ্যকর্তব্য। যদি স্বচক্ষে দেখা যায় তো কথাই নেই। পরিসংখ্যান-লিপিতে সঠিকভাবে তার বর্ণনা দিতে হবে। কোন জায়গায়, কখন কোন সময় দেখা গেল, এটাও লিখে রাখার প্রয়োজন। বাঘের পায়ের ছাপ নেওয়ার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে, এটা ধরে নেওয়া হয় যে, কোনও বিশেষ মাটিতে দুটো আলাদা বাঘের পায়ের ছাপ আলাদা হবে। এটা ভিত্তি করেই গণনার কাজে এগিয়ে যেতে হয়।

একবারের বাঘ-সুমারির একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তখন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পে বাঘের সুমারি হচ্ছিল। আমি তখন ওই প্রকল্পের অধিকর্তা। ঘটনাটি সুন্দরবনের বাগমারা বনের কোনও এক দ্বীপের। আমি মোটর-লঞ্চে সেই দ্বীপের দিকেই যাচ্ছিলাম। ও পরে ডিঙিতে। ওই দ্বীপে বাঘের সংখ্যা কত সেটা জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। যেতে যেতে নদীর পাড় থেকে বাইনোকুলার দিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল জঙ্গলের ধারে বিভিন্ন মাপের পায়ের দাগ দেখতে পাচ্ছি। কৌতূহলী হলাম। সঙ্গে সঙ্গে ডিঙি থেকে জঙ্গলের ধারে নেমে পড়লাম। একটি বাঘিনী ও বাচ্চার পায়ের দাগ লক্ষ করলাম। খানিক দূর যেতে না যেতেই আরও পায়ের দাগ দেখতে পেলাম। কিন্তু দাগগুলো এমনভাবে মাটি ও বালিতে মিশে আছে যে, আমার পক্ষে সাধারণভাবে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল, পায়ের দাগগুলো কোনটা বাঘিনীর, কোনটা বাচ্চার। এভাবে জঙ্গলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে প্রায় আধ ঘণ্টা চলেছি। হঠাৎ জঙ্গলের ধার ঘেঁষে শন্‌শন্ আওয়াজ শুনতে পেলাম। আওয়াজ যেন মনে হচ্ছে একটা উঁচু বালির ঢিবির নীচের দিক থেকেই আসছে। সঠিক বুঝতে না পেরে একেবারে উঁচু ঢিবির ওপরেই উঠে পড়লাম, ঘটনাটা ভালভাবে বোঝার জন্য। যা দেখলাম তা বোধহয় আমার সারা জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। তখন বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। তাই লঞ্চ থেকে বেরোনোর সময় ক্যামেরা নিয়ে আসার কথা ভাবিনি। আমি দেখতে পেলাম, দুই বাঘিনী ও তাদের দুই বাচ্চা ও একটি আধ-খাওয়া শুয়োর। বাঘিনী দুটো শুয়োরের পেছনের অংশ খেয়ে শেষ করছে ও বাচ্চা দুটো শিকারের সামনের দিকে ও বাঘিনী দু'টির আশপাশে ঘুরছে। ভোজনরতা দুই বাঘিনী মুখ দিয়ে অনবরত আওয়াজ করে চলেছে, কখনও আস্তে, কখনও খানিকটা জোরে। এভাবে পাঁচ-ছ' মিনিট চলল। তারপরে দেখলাম দুই বাঘিনীই বেড়ালের মতো খানিকটা ঘড় ঘড় আওয়াজ করতে করতে শিকারবস্তু থেকে দশ-বারো গজ দূরে গিয়ে বসে পড়ল। কিন্তু তারা বসল মুখোমুখি। কিছুক্ষণ পরে, বোধ হয় মিনিটদশেক হবে, একটি বাঘিনী হঠাৎ সেখান থেকে উঠে আধ-খাওয়া শুয়োরটির কাছে এল। আমি লক্ষ করলাম যে, বাঘিনীর দুটো

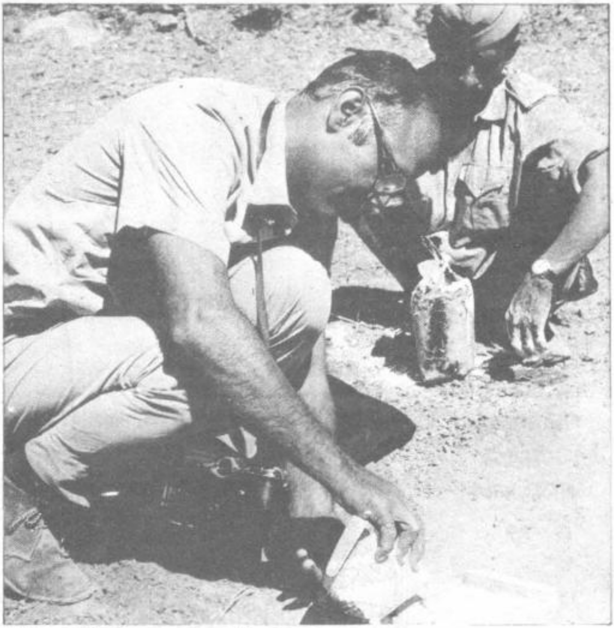

প্লাসটার অব প্যারিস দিয়ে বাঘের পায়ের ছাপ তুলে নেওয়া হচ্ছে

কানই পিছনের দিকে ভাঁজ করা। সে মুখ হাঁ করে আছে। অন্য বাঘিনী তখন তার দাঁত বের করে আস্তে আস্তে আওয়াজ করছে। শুয়োরের কাছে-আসা বাঘিনীর পাশে একটি বাচ্চা এসে দাঁড়াল। হঠাৎ বাঘিনীটি বাচ্চাটিকে থাবা দিয়ে সরিয়ে দিল। এরপরে বাঘিনীটি শুয়োরের সামনের অংশ খানিকটা খেতে শুরু করল ও কিছুটা মাংস নিয়ে সরে গেল আগের জায়গার কাছাকাছি। অন্য বাঘিনীটি তখন আবার শুয়োরের কাছে এসে খানিকটা মাংস দাঁতে করে নিয়ে সরে গেল। এই বাঘিনীটিরও শুয়োরের কাছে আসার সময় কানের পেছনের দিকের ভাঁজ লক্ষ করলাম ও মৃদু-মৃদু আওয়াজও শুনতে পেলাম। এভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা চলল। আমি আমার নোটবুকে যতটা পারা যায় লিখে চলেছি ও প্রাণভরে এই অপরূপ দৃশ্য দেখে যাচ্ছি। হঠাৎ লক্ষ করলাম একটি বাঘিনী বনের একদিকে ও অন্যটি বনের অন্যদিকে চলে গেল। বাচ্চা দুটোও আস্তে আস্তে চলে গেল বনের ভেতরে, নজরের আড়ালে। আমি আর এগোলাম না। সুন্দরবনকে আবিষ্ট করে তখন অন্ধকার নেমে আসছে। সেই রাতে মোটর-লঞ্চে ওখানেই থেকে গেলাম।

পরদিন ভোর হতে না হতেই আবার আধ-খাওয়া শুয়োরের অবস্থা দেখতে গেলাম। এবার কিন্তু অন্য দৃশ্য। দেখলাম একটি বাচ্চা বাঘ সেই আধ-খাওয়া শুয়োরের পাশে রয়েছে। বাচ্চা বাঘটিও খানিকটা ঘড় ঘড় আওয়াজ করছে। ইতিমধ্যে দু'-তিনটি শকুনের আবির্ভাব। পাশের গেওয়া গাছে বসে শকুন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খাবারের দিকে তাকিয়ে আছে। বাচ্চা বাঘটির জন্য সে নীচে নেমে আসছে না। বাচ্চা বাঘটি যখন খানিকটা দূরে চলে যাচ্ছে, তখনই শকুনটি খাবারের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে। একবার তো এমন হল যে, বাচ্চা বাঘটি শুয়োরের কাছে এসে-যাওয়া শকুনকে তাড়া করল ঘন ঘন কাশির মতো আওয়াজ করতে করতে। শকুনটি তখন গাছে আশ্রয় নিল।

বলাবাহুল্য, বাঘ-গণনার কাজ সেবার সুন্দরভাবে এগোচ্ছিল। কিন্তু বাঘ-গণনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের ওপরেই। যত বেশি শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী পাওয়া যায় ততই গণনার সময় কম লাগে, আর গণনার সময় কম হলে গণনাও নির্ভুল হয়।

গণনাকারীরা বাঘের পায়ের ছাপ ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করে মুখ্য গণনাকারীর কাছে জমা দেয়। তখন মুখ্য গণনাকারী বাঘের পায়ের ছাপগুলো ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেন, একই বাঘের পায়ের ছাপ একাধিকবার নেওয়া হয়েছে কি না। পরিসংখ্যান-লিপিতে অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে মাটির প্রকৃতির বর্ণনাও থাকে, যাতে বোঝা যায় মাটিটি শক্ত, নরম, এঁটেল বা অন্য কোনও প্রকার কি না। এভাবে ভালভাবে পরীক্ষা করার পর মুখ্য গণনাকারী কোন বিশেষ বনে কত বাঘ আছে তার পরিসংখ্যানভিত্তিক নজির দিয়ে থাকেন।

বলাবাহুল্য, এ-ধরনের গণনা ত্রুটিহীন হওয়া সম্ভব নয়। তবে গণনাকারীরা যদি উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত হন ও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কাজটি করেন, তবে বাঘসুমারি বহুলাংশে ত্রুটিহীন হওয়াও অসম্ভব নয়।

কিন্তু বাঘের গণনা সম্বন্ধে যত সহজভাবে বলা হল ব্যাপারটা মোটেই ততটা সহজ নয়। কারণ গণনাকারীদের নিরাপত্তার দিকটা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তাই কোনও বনের প্রতিটি অঞ্চলে স্বাভাবিক কারণেই প্রতিটি গণনাকারীর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয় না। গণনার পূর্বেই তাই ঠিক করে নেওয়া হয় কোন গণনাকারী কোন কোন অঞ্চলে যাবেন ও কীভাবে যাবেন। বনের বিস্তার ও অবস্থানের ওপর যাওয়ার প্রশ্নগুলো বিবেচনা করা হয়। কোথাও হাতির পিঠে, কোথাও উটের পিঠে, কোথাও বা ডিঙি নৌকো করে গিয়ে গণনাকারীরা তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে থাকেন। সুন্দরবন অঞ্চলে তো আবার মানুষখেকো বাঘও রয়েছে। তাই সাবধানতা এখানে বিশেষ প্রয়োজন। সেইজন্য এ-বনে ভাটার সময় যখন স্থলভাগের ব্যাপ্তি বেশি হয়, তখনই এই কাজ সেরে নেওয়ার নিয়ম। বনাঞ্চলকে বিভিন্ন দ্বীপে ভাগ করে নেওয়া হয়। ধরে নেওয়া হয়, গণনার সময় বাঘ অন্তত একবার জলের ধারে আসবেই। এই ধারণা বহুলাংশেই সঠিক বলে দেখা গেছে।

গণনার কাজ কঠিন, আর গণনা যখন বাঘকে ঘিরে, তখন তো কথাই নেই। তবে কোনও কাজই অসম্ভব হয় না, যদি গণনাকারীর সঠিক কর্তব্যনিষ্ঠা ও গণনার কৌশল আয়ত্তে থাকে। ব্যাঘ্র-প্রকল্পের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে সঠিক ব্যাঘ্র-গণনার ওপর। তাই বোধহয় এর কোনও সহজতর বিকল্প নেই। আর ব্যাঘ্র-প্রকল্প তো প্রকৃতি সংরক্ষণমূলক প্রকল্প। এর ওপর, মানুষও বহুলাংশে নির্ভরশীল।

"মায়ের সোনা
দুরন্তপনা
করছে সারাদিন,
তিনি কিন্তু
চিন্তাহীন
ঘরদোর যে
জীবানু হীন
জানেন তিনি
সবার ভালো
সাবধানের
নেই মার
তাই
ঘন কালো
ফিনিয়লে
আস্থা অটল
তাঁর"
PHENEOL
ঘন
কালো
কয়েক
ফোঁটা...
ব্যাস
ঘরদোর সব সাফ
বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর
ল্যাম্প ব্র্যাণ্ড
ফিনিয়ল
আদি, অকৃত্রিম, দারুন শক্তিশালী
BC
PL
বেঙ্গল কেমিক্যালস এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ
(ভারত সরকারের উদ্যোগ)
ASP/BCP/1/88/BEN

উইলিয়ম হার্শেল

চঞ্চল পাল

ছেলেবেলায় তো দূরের কথা, জীবনের প্রথম পঁয়ত্রিশটি বছর পার হয়ে যাওয়ার পরেও উইলিয়ম হার্শেল স্বপ্নেও ভাবেননি যে, তিনি একদিন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীর সম্মান পাবেন। ১৪ বছর বয়সেই স্কুলের পাঠ চুকে গিয়েছিল। কারণ বাবা চেয়েছিলেন যে, ছেলে তাঁর মতোই হোক। সৈনিকদের উজ্জীবিত করার জন্য যে মিলিটারি ব্যান্ড নিয়োগ করা হয়, সেই ব্যান্ডপার্টিতে উইলিয়মের বাবা বাঁশি বাজাতেন। এই চাকরিতে মাইনে খুবই কম, তাই সংসারে অনটন লেগেই ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও উইলিয়মের বাবা প্রতিদিন রাত্রে উইলিয়ম আর তাঁর বোন ক্যারোলিনকে নিয়ে বসতেন, বাঁশি শেখানোর জন্য।

ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি উইলিয়মের ঝোঁক ছিল খুব বেশি। এ-ব্যাপারে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তিনি খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত করে নিতেন। তাঁর বাবা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন মজলিশে যেতেন, আর কিশোর উইলিয়ম সেইসব জায়গায় বাঁশি বাজিয়ে খুব হাততালি পেতেন। কিন্তু একটি জায়গায় বাঁশি বাজাতে এলে তিনি বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন। এই জায়গাটি হচ্ছে তাঁর বাড়ির সংলগ্ন বাগান।

গরমকালের সন্ধেবেলায় ফুরফুরে হাওয়ায় বসে থাকতে ভাল লাগত তাঁর পরিবারের সকলেরই। এখানে বসে বাঁশি বাজাতে গেলেই উইলিয়মের চোখ পড়ত আকাশের দিকে। মহাবিশ্বের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে থেমে যেত তাঁর বাঁশির সুর। রাত্রে খাওয়ার পর বাগানে পায়চারি করতে এসে নিজের অজান্তেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেন ওপরের দিকে মুখ তুলে। আকাশের এই আকর্ষণকে অন্য কেউ তো বটেই, তিনি নিজেও তখন তেমন গুরুত্ব দেননি। সে-সময়ও তাঁর ছিল না,কারণ তখন তিনি চাকরি খুঁজতে ব্যস্ত। শুধুমাত্র বাঁশি বাজানোতেই ছিল তাঁর দক্ষতা, তাই বাবার মতোই চাকরি জুটল মিলিটারি ব্যান্ডে। কিন্তু ব্যান্ডপার্টির একঘেয়ে সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে চাকরিটা তাঁর কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল। তাঁর সৃজনশীল মন চাইত, বাঁশি ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রে নিজস্ব সুর সৃষ্টি করতে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সুরকার হিসেবে। অল্প চেষ্টাতেই তিনি পিয়ানো আর বেহালা বাজাতেও দক্ষ হয়ে উঠলেন। এবার তাঁর আত্মবিশ্বাস জন্মাল যে, যন্ত্রসঙ্গীতকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করলে তাঁর রোজগারের অভাব হবে না। এই ভেবেই ছেড়ে দিলেন ব্যান্ডপার্টির চাকরি। পাড়ি জমালেন সোজা ইংল্যান্ডে।

১৭৩৮ সালে জার্মানিতে তাঁর জন্ম। বাবার কাছ শুনতেন যে, ইংল্যান্ডে যন্ত্রসঙ্গীতের খুব কদর। তাঁর বাবারও সেখানে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পারিবারিক চাপে সে ইচ্ছে কোনওদিনই পূর্ণ হয়নি। খুব ছেলেবেলায় উইলিয়ম হারিয়েছিলেন তাঁর মা-কে। তাঁর চাকরি পাওয়ার বছর-দুয়েক পরেই বাবা মারা গেলেন। তাই স্বদেশ ছাড়ার পিছুটান আর রইল না। সঙ্গে রইলেন তাঁর বোন ক্যারোলিন।

ইংল্যান্ডে উইলিয়মের যন্ত্রসঙ্গীত সৃষ্টি বেশ সমাদৃত হতে লাগল। একদিন একটি জলসায় তিনি তাঁর নিজের তৈরি একটি সিম্ফনি বাজাচ্ছিলেন। গণ্যমান্য শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সুরকার ডঃ মিলার। উইলিয়মের সিম্ফনি শুনে ডঃ মিলার এতই মুগ্ধ হলেন যে, উইলিয়মকে ডেকে পাঠালেন বাড়িতে। উইলিয়মের থাকবার নির্দিষ্ট কোনও জায়গা নেই শুনে তিনি বিনা ভাড়ায় উইলিয়মকে দুটো ঘর ছেড়ে দিতে রাজি হলেন। ডঃ মিলারের সুপারিশেই একটি বিশাল গির্জায় পিয়ানোবাদক হিসেবে উইলিয়ম চাকরি পেয়ে গেলেন। তা ছাড়া বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে আবহসঙ্গীতকার হিসেবেও তিনি কাজ করতে লাগলেন। এর ওপর বিভিন্ন যন্ত্রসঙ্গীত শেখার জন্য ছাত্রও জুটে গেল অনেক। ক্রমশ আর্থিক সাচ্ছল্য আসতে লাগল তাঁর।

উইলিয়ম হার্শেল

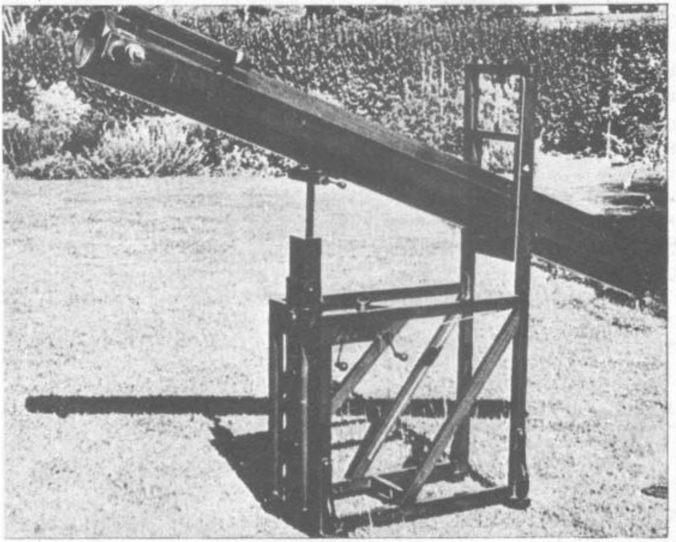

উইলিয়ম হার্শেলের বারো মিটার লম্বা বিশাল টেলিস্কোপ

সবচেয়ে বড় কথা এই গির্জাটিই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। এই গির্জার বিশাল গ্রন্থাগারটিতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বই সাজানো থাকত থরে থরে। অবসর পেলেই উইলিয়ম সেখানে গিয়ে বইয়ের পাতা ওলটাতেন। **সঙ্গীতশাস্ত্রের** ওপর লেখা বইগুলোকে তাঁর মনে হত শুকনো তত্ত্বের কচকচি। তার চেয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বইগুলো তাঁকে আকর্ষণ করত অনেক বেশি। কৈশোরে যে বিস্ময় নিয়ে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, সেই বিস্ময় আবার নতুন করে অনুভব করতে শুরু করলেন এই বইগুলো পড়তে গিয়ে। তখনও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে টেলিস্কোপের উৎপাদন শুরু হয়নি। জ্যোতির্বিদরা নিজে হাতেই তৈরি করতেন। টেলিস্কোপের গঠনপ্রণালী পড়তে পড়তে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। বই দেখে দেখে উপযুক্ত কাচ, কাচ ঘষার ফাইল, লোহার সিলিন্ডার, স্ট্যান্ড ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস কিনে এনে জড়ো করলেন তাঁর ঘরে।

ক্যারোলিন ছিলেন দাদা-অন্ত প্রাণ। তাই উইলিয়ম যে কাজই করতে চাইতেন, সে কাজে ক্যারোলিন শুধু উৎসাহই দিতেন না, সবরকম সাহায্যও করতেন। দু'জনে মিলে অনেক খেটেখুটে তৈরি করলেন একটি টেলিস্কোপ। উইলিয়মের সামনে উন্মোচিত হল মহাকাশের এক নতুন রূপ। বন্ধ হয়ে গেল **সঙ্গীতচর্চা**। ছাত্রদের **সঙ্গীতশিক্ষাও** দেওয়াও বন্ধ করলেন। রেখে দিলেন শুধুমাত্র গির্জার চাকরিটুকু।

গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে তিনি কখনও লেখাপড়া করেননি। তা সত্ত্বেও তিনি বুঝেছিলেন যে, খেয়ালখুশিমতো পর্যবেক্ষণ করে লাভ হয় না ; বরং আগে পরিকল্পনা করে নিয়ে এগোতে হয়। তাই তিনি যে গ্রহ বা নক্ষত্রটির ওপর নজর রাখতে চাইতেন, সেটিকে রাতের পর রাত পর্যবেক্ষণ করতেন আর পরিবর্তনগুলি টুকে রাখতেন। গ্যালিলেও'র টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পর উইলিয়ম হার্শেলের সময় পর্যন্ত প্রায় একশ বছর ধরে বহু লোক টেলিস্কোপে চোখ রেখেছেন, কিন্তু পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি জানতেন না বলে কেউই তেমন কোনও আবিষ্কার করতে পারেননি।

একদিন রাত্রে একটি ছোট আলোর বিন্দুর ওপর তাঁর নজর পড়ল। সেটিকে নক্ষত্র বলে মনে হল না, কারণ তার আলো মিটমিট করে না। তা ছাড়া সেটি কাছের নক্ষত্রগুলোর চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল। সবচয়ে বড় কথা, কয়েক রাত্রি পরেই এটি স্থান পরিবর্তন করে। উইলিয়ম ভাবলেন, এটি বোধ হয় নতুন একটি ধূমকেতু। কিন্তু আরও কয়েক রাত্রি পর্যবেক্ষণের পর দেখলেন যে, এটির গতিপথ পৃথিবীরই মতো। তা হলে নিশ্চয়ই এটি সৌরজগতেরই একটি অনাবিষ্কৃত গ্রহ।

খবরটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে সারা পৃথিবীতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। হাজার বছর ধরে যে ছ'টি গ্রহের কথা জানা ছিল, তার বাইরে যে অন্য গ্রহ থাকতে পারে, তা কেউ বিশ্বাসই করতেন না। উইলিয়মের আবিষ্কারের পর থেকেই সারা পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চতুর্গুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নতুন গ্রহ-নক্ষত্রের সন্ধানে।

উইলিয়ম প্রথমে গ্রহটির নামকরণ করতে চেয়েছিলেন রাজা তৃতীয় জর্জের নামে। কিন্তু অন্য বিজ্ঞানীরা বললেন যে, প্রথা অনুযায়ী গ্রহের নামকরণ গ্রিক দেব-দেবীর নামেই হওয়া উচিত। বেশ কিছুদিন বাগ-বিতণ্ডা চলবার পর গ্রহটির নাম হল ইউরেনাস। কিন্তু তা বলে তৃতীয় জর্জ চটে গেলেন না, বরং উইলিয়মকে 'রাজবিজ্ঞানী' (রয়্যাল সায়েন্টিস্ট) উপাধিতে ভূষিত করে আদেশ দিলেন যে, এখন থেকে উইলিয়ম আজীবন বছরে ২০০ পাউন্ড সম্মানভাতা পাবেন। অঙ্কটা তখনকার দিনে যথেষ্ট লোভনীয় ছিল।

এর পর উইলিয়ম তাঁর সেই ছোট টেলিস্কোপটি নিয়ে আর সন্তুষ্ট থাকতে চাইলেন না। লোক-লশকর লাগিয়ে তৈরি করে ফেললেন একটি বিরাট টেলিস্কোপ, যার দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট ও প্রস্থ চার ফুট। এই টেলিস্কোপ নিয়ে প্রথম যেদিন তিনি শনিগ্রহের দিকে চোখ ফেরালেন, সেইদিনই তাঁর নজরে পড়ল শনির ছ'টি উপগ্রহ। কয়েক সপ্তাহ বাদে শনির সপ্তম উপগ্রহটিও ধরা পড়ল টেলিস্কোপে। বছর-দুয়েক কাটতে না কাটতেই উইলিয়ম আবার আলোড়ন তুললেন ইউরেনাসের দুটো উপগ্রহ আবিষ্কার করে।

অনেকে বলেন, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের শুরু উইলিয়ম হার্শেলের হাতে। কারণ, স্থির নক্ষত্র আর ছ'টি ভ্রাম্যমাণ গ্রহ নিয়ে যে সনাতন মহাকাশের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল তাকে প্রথম ভেঙে ফেললেন উইলিয়ম। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন যে, আমাদের সূর্যও প্রচণ্ড গতিতে অন্য কোনও অনাবিষ্কৃত নক্ষত্রের চারপাশে ঘুরছে। তা ছাড়া কোনও নক্ষত্রই স্থির নয়, এত অপরিমেয় দূরত্বে তাদের অবস্থান যে, তাদের প্রচণ্ড গতিবেগ খালি চোখে ধরা যায় না।

ইউরেনাস আবিষ্কৃত হয় ১৭৮১ সালের ১৩ মার্চ। এর পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত (১৮২২) তিনি বিশ্বের কাছে বিদগ্ধ বিজ্ঞানী হিসেবেই পরিচিত হয়ে উঠলেন। তিনি যে এক সময় **যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী** হতে চেয়েছিলেন, সে কথা মনে রাখল না কেউ, হয়তো তিনি নিজেও।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

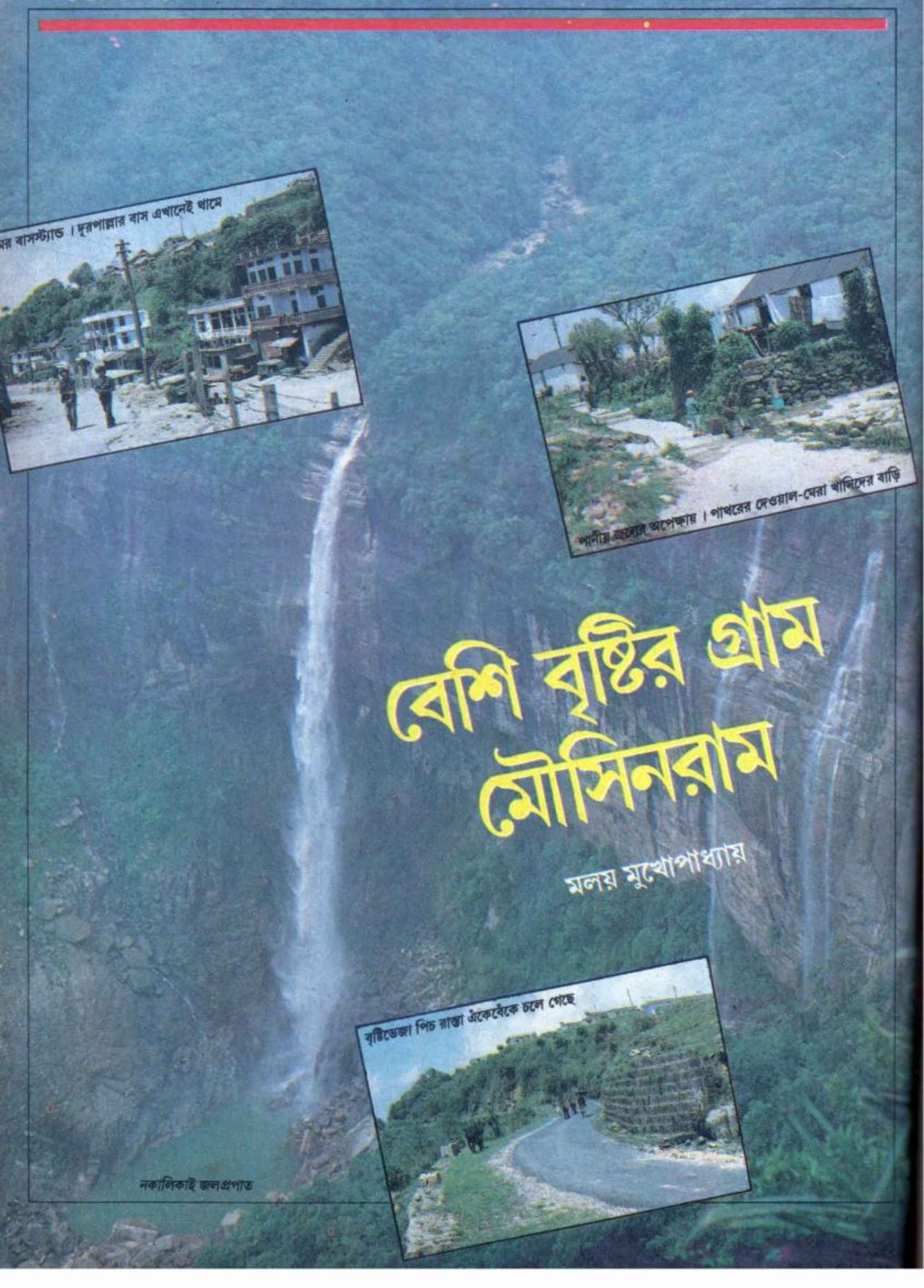

...র বাসস্ট্যান্ড । দূরপাল্লার বাস এখানেই থামে

পানীয় জলের অপেক্ষায় । পাথরের দেওয়াল-ঘেরা খাসিদের বাড়ি

বেশি বৃষ্টির গ্রাম মৌসিনরাম

মলয় মুখোপাধ্যায়

বৃষ্টিভেজা পিচ রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে

নকালিকাই জলপ্রপাত

স্নোভা আই ইয়া ঙ্গী কাস্ঙ্গি কাবা সিত্ কথাগুলো প্রায় এক নিশ্বাসেই বলে ফেলল ছোট্ট মেয়ে দা-সুক-জাই। দা-সুক-জাই মৌসিনরাম গ্রামেরই মেয়ে, ক্লাস ফাইভে পড়ে। একটানা সাতাশ দিন বৃষ্টিতে ঘরে বন্দী হয়ে বিরক্ত হয়েই কথাটা যে বলেছে, তা বুঝলাম খাসি কথাটার মানে জানতে পেরে। সে যা বলেছে তার অর্থ—দয়া করে আমাদের দাও একটা রোদমাখা দিন। শুধু দা-সুক-জাই ও তার বাবা হেব্‌রেস মারবানিয়াং কেন, মনে হল ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেরই ওই এক কথা।

বাইরে সমানে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। টিনের চালের ওপর বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটার একটানা শব্দ, তার সঙ্গে তাল রেখে চেঁচিয়ে চলেছে, এখানে ওখানে লুকিয়ে থাকা ব্যাঙের দল। ব্যাঙের ডাক এখানে অদ্ভুত। মনে হবে কেউ বোধহয় দুটো কাঠ ঠুকে ঠুকে শব্দ করে চলেছে। সব মিলিয়ে ঘরের ভেতরটা বেশ সরগরম। শুধু মারবানিয়াং-এর বাড়ির ভেতরটাই এমন নয়। এখানকার প্রায় সব বাড়িরই চেহারা একরকম। কাঠের বা পাথরের চার পায়ার ওপর বাড়ি। বৃষ্টির জল যাওয়ার জন্য নীচটা ফাঁকা। খুব ঢালযুক্ত টিনের চাল। পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে জমির সীমারেখা। সৌন্দর্যপিয়াসী গ্রামবাসীরা তাদের বাড়িঘর রং করে ফুল দিয়ে সব সময়ই সাজিয়ে রাখে।

কখনও-কখনও বৃষ্টির বেগ একটু কমছে, কিন্তু কিছুতেই থামছে না। লক্ষণও নেই থামবার। ঘরের ভেতর পর্যন্ত মেঘ ঢুকে বসে আছে। সমস্ত জিনিসপত্রে একটা স্যাঁতস্যাঁতে ভাব। বাইরে গাঢ় মেঘ। যেন কামড়ে ধরে আছে মৌসিনরামকে। এখানে মেঘ এত গাঢ় যে, তিন-চার ফুটের কাছের জিনিসকেও দেখা যায় না। রাস্তা-ঘাট, মাঠ, বাড়ির তলা, বাড়ির উঠোন ও পাহাড়ের গা বেয়ে হুহু শব্দে বৃষ্টির জল ছুটছে। সে ছোটার কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই।

এই হল মৌসিনরাম গ্রামের বর্ষাকালের চেহারা। বর্ষাকালে এখানকার মানুষ নানান সমস্যার সম্মুখীন হন। কিন্তু এই বর্ষাকালের জন্যই তাঁরা দারুণ গর্ববোধ করেন। মুখভর্তি পান নিয়ে কথা বলছিলেন মারবানিয়াং। মাঝে-মধ্যে ধূমপানও করছিলেন। দুটোই এখানকার মানুষ দারুণ পছন্দ করেন। গল্প করতে-করতে মারবানিয়াংসাহেব বললেন, "এতদিন তাঁদের গ্রামের সঙ্গে চেরাপুঞ্জির বৃষ্টিপাত সমান ছিল। কিন্তু ইদানীং নাকি চেরাপুঞ্জিতে নানা কারণে বৃষ্টি বেশ কমে গিয়েছে। এবং সেই সঙ্গে তাঁদের এখানে বৃষ্টির পরিমাণ যথেষ্টই বেড়েছে।"

একটু নড়েচড়ে বসে তিনি আরও বললেন, "গ্রামবাসীরা জেনেছেন যে, তাঁদের গ্রামেই এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়।"

ভারতের মেঘালয় রাজ্যের ইস্ট খাসি হিলস জেলার একেবারে দক্ষিণে পাহাড়ের মাথায় জড়োসড়ো হয়ে অনেককাল আগে থেকে চুপ করে পড়ে আছে এই মৌসিনরাম গ্রাম। শিলং শহর থেকে সরাসরি মেঘালয় ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন-এর বাসে আসা যায়। পাহাড়ের গায়ে জড়ানো ৫৫ কিলোমিটারের পিচ রাস্তা ধরে আসতে সময় লাগে পাক্কা দু' ঘন্টা। সারাদিনে মেঘালয় ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের দুটি মাত্র বাস যাতায়াত করে। ভাড়া মাথাপিছু মাত্র ১০ টাকা। মৌসিনরাম গ্রামের নামে কোনও বাস নেই। রানিকোর অথবা বালাট-এর বাসে চেপে বসতে হয় এখানে আসতে গেলে।

মৌসিনরাম হাই স্কুলের পরিচিত দৃশ্য

বৃষ্টিতে ধোয়া কালো পিচ রাস্তার ধারে এই মৌসিনরাম। রাস্তার দু'দিকেই বসতি। পশ্চিমদিকের তুলনায় পূর্বদিকের ভূমিরূপ অনেকটা সমতল। তাই সেদিকেই বসতি বেশি। ছোট-ছোট বাড়ির মাঝখানে মাথা উঁচু করে অনেক ঘটনার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো বড় চার্চ।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪২৫ মিটার উঁচু মাথা চ্যাপটা পাহাড়ের ওপর এই গ্রাম। গ্রামের পূর্বদিকে যেখানে বসতি শেষ হয়ে গেছে, সেখান থেকে খাড়াই জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ি ঢাল নামতে-নামতে গিয়ে থেমেছে একেবারে উম্‌সাইতখো নদীর জল। আপন মনে উম্‌সাইতখো জঙ্গলের সঙ্গে পাথরের সঙ্গে গল্প করতে করতে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গিয়ে ভাব জমিয়ে নিয়েছে উ-মিয়াম নদীর সঙ্গে। খাসি ভাষায় উ-মিয়াম কথার অর্থ হল 'জলের কান্না'। কিছুক্ষণ উ-মিয়াম নদীর সঙ্গে থাকলেই মনে হয়, কোনও এক অজানা কারণে উ-মিয়াম জঙ্গলের দরজায় এবং পাথরের বুকে আছাড় খেয়ে দিনরাত কেঁদেই চলেছে। মৌসিনরাম গ্রামের মানুষ এই নদীটিকে ভালবাসেন।

গ্রামের পশ্চিম দিকের ঢাল পূর্ব দিকের চেয়ে অনেক বেশি খাড়াই। অল্প দূরে প্রায় ১০০০ মিটার নীচে, উম-ঙ্গি নদী এই ঢালকে থামতে বাধ্য করেছে। গ্রামের উত্তর থেকে দক্ষিণের ঢাল অল্প হলেও খালি চোখেই ধরা পড়ে। দক্ষিণ দিকে গ্রাম পার করে এক কিলোমিটারের ঢালু পাকা রাস্তা ধরে গেলেই পি ডবলিউ· ডি-র অফিস। মালভূমির আর-এক ধাপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে পি·ডবলিউ·ডি-র কোয়ার্টার্স। অফিসের ঠিক পেছনে ইনসপেকশন বাংলো, যেখানে হাত-পা মেলে ক'দিন বেশ থাকা যেতে পারে।

এই বাংলো থেকে পূর্ব দিকে তাকালে চোখে পড়ে পরিচিত চেরাপুঞ্জিকে। অবশ্য সামনে পাহাড়ের মাথায় ওয়াখালিয়ার বসতি কিছুটা আড়াল করে রাখে। ইনসপেকশন বাংলোর ঠিক পাশেই লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা চারচৌকো জায়গার মাঝখানে

'হারসনের ন্যাচরাল সাইফোন রেকর্ডিং রেনগেজ', যার মাধ্যমে পি· ডবলিউ· ডি· অফিসের কর্মীরা প্রতিদিনের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ লিখে রাখেন।

গ্রামের উত্তরে, একটু দূরে এই অঞ্চলের সকলের প্রিয়, মোটাসোটা গোলগাল মসিংঙ্গি পিক ১৭৬৬ মিটার উচ্চতা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এটাই নাকি এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ পাহাড় চূড়া। মৌসিনরাম গ্রামের আশপাশে ছোট-বড় অসংখ্য ঝরনা পাহাড় থেকে লাফিয়ে নেমে জঙ্গলের ভেতর হারিয়ে গেছে। এইসব ঝরনা বছরের অধিকাংশ সময়েই গাঢ় কুয়াশার ওড়নায় এমন আড়াল হয়ে থাকে যে, তখন শুধু জলের শব্দ দিয়ে অনুভব করতে হয় এদের অস্তিত্ব।

গ্রামের প্রায় সব জায়গাতেই মাটি ফুঁড়ে ছোট-বড় পাথর বাইরে বেরিয়ে এসেছে। আসলে এখানে মাটির স্তর খুবই পাতলা। কোনও কোনও অংশে শুধু পাথরের ঢালা উঠোন, মাটি বা ঘাসের নামগন্ধ নেই। তাই হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় মৌসিনরাম যেন পাহাড়ের চাদর দিয়ে মোড়া। খাসি ভাষায় 'মৌ' কথার অর্থ হল—পাথর। গ্রামবাসীর ধারণা, অনেককাল আগে এই গ্রামের সব জায়গার পাথর দেখে এক ভদ্রলোক এই গ্রামকে পাথুরে বা মৌসিনরাম নাম দিয়ে চিহ্নিত করেন।

শিলং থেকে আসার পথে, গ্রামে ঢোকার এক কিলোমিটার আগে রাস্তার বাঁ দিকে বড় একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ে। তাতে লেখা মৌজুমবুইন কেভ। সাইনবোর্ডের নীচের তীরটা বাঁ দিকের এক পাহাড়ি রাস্তা দেখিয়ে দেয়। ঘুরপাক খাওয়া জঙ্গলচেরা এই রাস্তা ধরে কয়েক মিনিট নামলেই এক বিরাট গুহা। চুনাপাথরের স্তরবিশিষ্ট মেঘালয় মালভূমির দক্ষিণ ভাগে এই গুহা যে চুনাপাথরের সঙ্গে জলের রাসায়নিক বিক্রিয়া ও ধসের ফলে সৃষ্ট, তা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না।

গুহার প্রবেশপথ বেশ চওড়া। প্রথমটায় ঢুকতে ভয়-ভয় করে। মনে হয় এই বুঝি ছাদ ভেঙে পড়বে মাথার ওপর। ভিতরটা ফ্যাকাসে অন্ধকার। গুহার ছাদ থেকে বেশ কিছু স্ট্যালকটাইট পাথর ঝুলছে। আর নীচে, গুহার মেঝের মাঝখানে গোলগাল চেহারার একটা বড় স্ট্যালাগমাইট। এটাকেই শিবলিঙ্গের মতো দেখতে। প্রতিদিনই শিলং ও দূরদূরান্ত থেকে অনেকে আসেন এই শিবলিঙ্গকে পুজো করতে।

পাহাড়ের একটা ন্যাড়া পাথরে নোটিস হিসেবে এই অঞ্চলের কালেক্টর গুহাটিকে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার রাখতে বলেছেন। গুহার ভেতর রাত্রিবাস করা চলবে না। গুহায় প্রবেশমূল্য মাথা পিছু দু' টাকা।

বৃষ্টিকে মৌসিনরামের লোকেরা ভাল চোখে দেখেন না। কারণ পুরো বর্ষাকাল ধরে এত বৃষ্টি হয় যে, সেই সময় কোনও চাষই

ঝকঝকে সুন্দর দু'টি চার্চের একটি গ্রামের ঠিক মাঝখানে

হয় না। আলু, ভুট্টা, হলুদ, আদা প্রভৃতি সবই হয় অন্য ঋতুতে। বৃষ্টির জল যে পাহাড়ের ও গ্রামের মাটি ধুয়ে অনেক নীচে চলে যাচ্ছে এবং এর ফলে জমির উর্বরতা যে নষ্ট হয়ে চলেছে, এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনেক গ্রামবাসীর কাছেই স্পষ্ট। এঁরা বৃষ্টিকে পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করেন। বলেন 'উ-স্লাপ'। খাসি ভাষায় 'উ' শব্দ পুংলিঙ্গের আগে সাধারণত ব্যবহার করা হয়।

বর্ষা এখানে দীর্ঘস্থায়ী হলেও এখানকার মানুষ সারা বছরকে চারটি ঋতুতে ভাগ করে নিয়েছেন। মে মাসের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বর্ষাকাল। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত শরৎকাল। তারপর শুরু হয় শীত।

> মৌসিনরাম গ্রামের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৩,০০০ মিলিমিটারেরও বেশি। চেরাপুঞ্জির গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১,০০০ মিলিমিটারের কিছু বেশি। কোনও-কোনও বছর মৌসিনরামের বৃষ্টিপাত ২০,০০০ মিলিমিটার ছাড়িয়ে যায়। এখানে বছরের বেশি বৃষ্টিটাই হয় জুন মাস থেকে অগস্ট মাসের মধ্যে।

চলে ফেব্রুয়ারির শেষ অবধি। বর্ষার মতো শীতও বেশ জাঁকিয়ে বসে। বসন্তকাল পেয়েছে খুব কম সময়। মার্চ মাস থেকে মে মাসের প্রথম দিক। এই সময় কোনও কোনও দিন নীল আকাশ ও ঝকঝকে সূর্যের কাছ থেকে মৌসিনরাম একটু স্বস্তি চেয়ে নেয়। শুনলে অবাক হতে হবে, মৌসিনরাম গ্রামে গ্রীষ্মকাল বলে কিছু নেই। কেউ-কেউ অবশ্য বর্ষাকালের প্রথম দিকটাকেই গ্রীষ্মকাল হিসেবে দেখেন।

বর্তমানে মৌসিনরাম গ্রামের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৩,০০০ মিলিমিটারেরও বেশি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চেরাপুঞ্জির গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১,০০০ মিলিমিটারের কিছু বেশি। কোনও কোনও বছর মৌসিনরামের বৃষ্টিপাত, এমনকী, ২০,০০০ মিলিমিটারও ছাড়িয়ে যায়। এখানে বছরের বেশি বৃষ্টিটাই হয় জুন মাস থেকে অগস্ট মাসের মধ্যে। একা জুলাই মাসই কলকাতা শহরের প্রায় তিনগুণ বৃষ্টিপাতের দাবিদার।

এক কথায়, বৃষ্টিপাতহীন মাস প্রায় নেই বললেই চলে। তবে কোনও বছর জানুয়ারি মাস, কোনও বছর ডিসেম্বর আবার কখনও কখনও ফেব্রুয়ারি মাসও বৃষ্টিশূন্য থেকে যায়। ইতিহাস বলে, ১৮৬১ সালে এই গ্রামে অসম্ভব বেশি বৃষ্টি হয়েছিল। ওই বছর একা জুলাই মাসই পেয়েছিল প্রায় ৭৬০০ মিলিমিটার বৃষ্টি।

মৌসিনরাম বা এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাতের কারণ পর্যালোচনা করতে গিয়ে কোনও কোনও আবহাওয়াবিদ বলেন,

দক্ষিণ-পশ্চিম **মৌসুমি** বায়ুই এর একমাত্র উৎস। দক্ষিণ-পশ্চিম **মৌসুমি** বায়ু প্রথম এসে মেঘালয় মালভূমির সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং তাকে ধরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করে। তখন এগিয়ে থাকা পাহাড়কে উপেক্ষা করে প্রথমেই উপত্যকায় চুপিসারে ঢুকে পড়ে। মৌসিনরাম গ্রামের দু'দিকে দুই উপত্যকা হল—উ-মিয়াম ও উম-ঙ্গি নদীর উপত্যকা। এই দুই উপত্যকার ঢাল ধরে বৃষ্টিভরা বাতাস উঠতে উঠতে শেষে মৌসিনরাম গ্রামে এসে মিলিত হয়। জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস ওপরে উঠে শীতল হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। মৌসিনরামের উচ্চতা বাতাসকে শীতল করার পক্ষে যথেষ্টই। এখানে পাহাড় উপত্যকা ও জঙ্গলের জালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, প্রচুর বৃষ্টি দিয়ে তবেই ছাড়া পায়।

চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টিপাতের কারণ এই একই। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশকে অবৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবহারের ফলে সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। তবে কোনও-কোনও বছর বৃষ্টিপাত বেশি হওয়ার ফলে এখনই স্পষ্টভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না যে, আগামী শতকে চেরাপুঞ্জি কোন সারিতে স্থান পাবে।

অন্যান্য জায়গার মতো মৌসিনরামের জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, ১৮৮১ সালে এই গ্রামের জনসংখ্যা ছিল ১,১০২। আদমসুমারি অনুযায়ী, ১৯০১ সালে জনসংখ্যা হয় ১,৪১৪। জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১৯৬১ সালে হয়ে দাঁড়ায় ২০,৮৯৭। ১৯৭১ সালে ২৭,৭৫৭ এবং ১৯৮১ সালে হয় ৩৩,৮৩৩। অনুমান করা যাচ্ছে, আগামী ১৯৯১ সালে এই গ্রামে ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষকে পাওয়া যাবে। গ্রামে আছেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী অনেক মানুষ। আর আছেন সেং খাসিরা।

সর্পপূজা খাসি সমাজে বেশ প্রচলিত। খাসিরা বিশ্বাস করেন, অনেককাল আগে পাহাড়ের গুহায় এক অতিকায় সাপ বাস করত। সেই সাপ প্রায়ই একটা বা দুটো আস্ত মানুষ খেয়ে ফেলত। একদিন এক সাহসী খাসি যুবক কৌশলে তাকে মেরে ফেলেন। তারপর তাকে কেটে সমস্ত খাসি গ্রামে একটা করে টুকরো পাঠিয়ে নির্দেশ দেন টুকরোগুলো যেন খেয়ে ফেলা হয়। সবাই সেটা খেয়ে ফেলেন। কিন্তু একজন ভুল করে টুকরোটা ঘরে রেখে দেন এবং সেই টুকরো থেকে সাপটি আবার বেঁচে ওঠে। আজও মৌসিনরামের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, ওই সাপটা বেঁচে আছে। তাকে নরবলি ও পুজোর মাধ্যমে খুশি রাখতে পারলে সে গ্রামের ঘরে-ঘরে বহু ঐশ্বর্য ও শান্তি এনে দেবে। আজও অনেক বাড়িতে মে অথবা জুন মাসে সর্পপূজার প্রচলন আছে। তবে নরবলি সেই কবে উঠে গেছে।

খাসি নৃত্য এ-গ্রামের প্রাণের উৎসব। সারা বছর সবাই অপেক্ষা করে থাকেন এই খাসি নৃত্যের দিনগুলির জন্য। মে মাসে দু'বার হয় এই নৃত্য। একবার হয় লোয়ার মৌসিনরামে এবং আর-একবার হয় আপার মৌসিনরামে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে একবার আর দ্বিতীয়টা হয় ওই মাসেরই তৃতীয় অথবা চতুর্থ সপ্তাহে।

শুধু এই গ্রামেই নয়, সমস্ত খাসি জাতি আগুনকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। উনুন তাঁদের কাছে বেশ পবিত্র। আজও অনেক বাড়িতে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে বাড়ির মেয়েরা সাঁড়াশি দিয়ে উনুনের তিনটি ইট স্পর্শ করে তারপর অন্যান্য কাজে হাত দেন।

এই গ্রামের মানুষ অধিকাংশই শিক্ষিত। মৌসিনরাম হাই স্কুল গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ের ওপরে থাকার জন্য বহুদূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ৩৭৫। এখানে হোস্টেলের ব্যবস্থা আছে। দূর-দূর গ্রামের ছেলেমেয়েরা এখানে হোস্টেলে থেকেই লেখাপড়া করে। এই গ্রামে আর আছে প্রাইমারি স্কুল, সরকারি এম-ই স্কুল, আর সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। এখানকার স্কুলের শিক্ষা শেষ হলে ছাত্রছাত্রীদের শিলং বা অন্য কোথাও যেতে হয় উচ্চতর শিক্ষার জন্য।

ক্লাস সেভেনের ছেলে দালেউ পাসওয়েত-এর সঙ্গে কথা বলে জানলাম যে, গ্রামে একটি বইয়ের দোকানও আছে। সেখানে শুধুমাত্র টেক্সট বই পাওয়া যায়। গল্পের বই পাওয়া যায় স্কুল লাইব্রেরিতে। সকলেরই প্রায় সব বই পড়া হয়ে গেছে।

স্কুলের শীতের ছুটি দেড় মাস। আর ছুটি হয় ষান্মাসিক পরীক্ষার পর। ওই সময় সব ছেলেমেয়েই তাদের বাবা-মাকে সাহায্য করে ঘরের বিভিন্ন কাজে। জঙ্গলে মধু ও জ্বালানি সংগ্রহ করতে তারাও যায় বাবা-মার সঙ্গে দল বেঁধে। এখানকার জঙ্গলে খুব সাবধানে যেতে হয়। জঙ্গলে নানা ধরনের গাছগাছালির সঙ্গে আছে বুনো শুয়োর, জংলি বিড়াল, খ্যাঁকশিয়াল, বিষধর সাপ। আর আছে নানা ধরনের পাখি, হরিণ ও পেখম-মেলা ময়ূর।

জঙ্গলে যাওয়ার সময় সবাই একটা করে ক্নুপ সঙ্গে রাখে। গাছের পাতা ও বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের ছাতাকে খাসি ভাষায় ক্নুপ বলা হয়। এটা নিলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যায়। আজকাল আমাদের মতো ফোল্ডিং ছাতারও বেশ চল হয়েছে। কমবয়সী ছেলেমেয়েরা এই ফোল্ডিং ছাতা বা 'সাত্রি' নিতেই বেশি পছন্দ করে। তবে মৌসিনরামের এলোমেলো বৃষ্টিতে ক্নুপের মতো রেনকোটই মানানসই।

বৃষ্টিভেজা মৌসিনরাম নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজও ভালই আছে। তবে যেভাবে এই অঞ্চলে অবাধে জঙ্গল কাটা হচ্ছে, পাহাড় ধসিয়ে চুনাপাথর কুরে কুরে বার করে নেওয়া হচ্ছে, তাতে মনে হয় মৌসিনরামকে নিয়ে আমাদের গর্ব করার মতো তেমন কিছুই থাকবে না। নিষ্ঠুরভাবে প্রকৃতির কাছ থেকে কিছু নিলে, কিছু তো হারাতেই হয়।

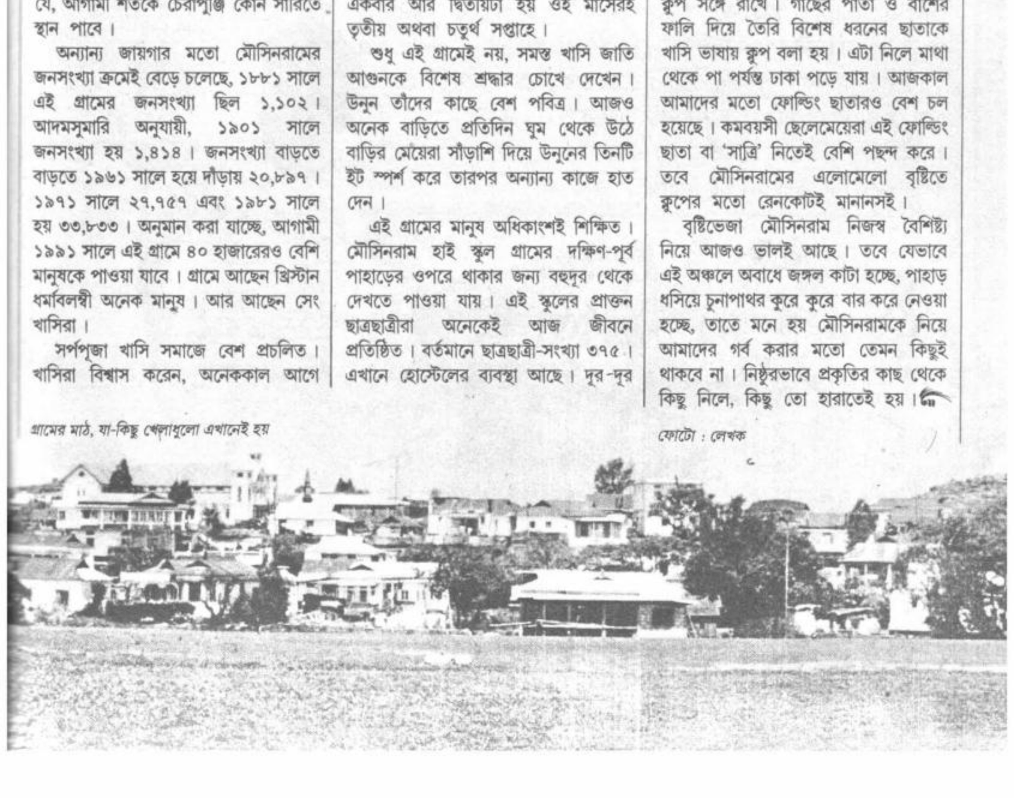

গ্রামের মাঠ, যা-কিছু খেলাধুলো এখানেই হয়

ফোটো : লেখক

'সুপারস্টার' কথাটা বোধ হয় বহু-ব্যবহারে এখন জীর্ণ হয়ে গেছে। যাঁরা সুপারস্টার, তাঁদেরই এখন বলা হচ্ছে 'মেগাস্টার'। দক্ষতা, খ্যাতি, অর্থ,যশ ও গ্ল্যামার-এর দিক থেকে এঁরা সাধারণ পাঁচজনের চেয়ে আলাদা। পপ সঙ্গীতে যেমন মাইকেল জ্যাকসন, ম্যাডোনা, চলচ্চিত্রে যেমন সিলভেস্টার স্ট্যালোন, ফুটবলে তেমনি পেলে, প্লাতিনি, মারাদোনা, গুলিট। ফুটবলকে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলায় উত্তীর্ণ করার কৃতিত্ব ও অবদানটুকু এই মেগাস্টারদের।

১৯৩০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হওয়ার পর থেকে ফুটবলে তারকা-প্রথার উৎপত্তি। পেশাদারি ফুটবল ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকায় জমে উঠল। ক্লাব-ফুটবলের জনপ্রিয়তা হু-হু করে বাড়তে থাকল রাতারাতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা দুনিয়ায় ফুটবল-কাঠামোয় এল বিবর্তন। ফুটবল মাঠে আবির্ভূত হলেন পুসকাস, ডি স্তেফানোর মতো নায়করা। বিশেষ এক-একজন ফুটবলারকে পাওয়ার জন্য ইউরোপের ক্লাবগুলির মধ্যে শুরু হয়ে গেল প্রতিযোগিতা। এ নিয়ে সংবাদপত্রে খবরও ছাপা হতে থাকল। প্রচারমাধ্যমের দৌলতে রাজনীতিকদের মতোই প্রাধান্য পেলেন ফুটবলের নায়করা। ফুটবল ও তার নায়কদের নিয়ে মাতামাতি শুরু হয়ে গেল দেশে-দেশে। বিশেষ করে ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকায়। অতীত ও বর্তমানের এরকমই কয়েকজন মেগাস্টারের কথা আলোচনা করা হল এই নিবন্ধে।

আলফ্রেডো ডি স্তেফানো

যদি কোনও ফুটবল-বিশেষজ্ঞকে বলা হয়, বিশ্বের সর্বকালের তিনজন সেরা 'কমপ্লিট' ফুটবলারের নাম করতে, তবে তিনি হাজার চেষ্টা করেও আলফ্রেডো ডি স্তেফানোর নাম বাদ দিতে পারবেন না। স্কিল এবং ফুটবল প্রতিভার বিচারে পেলে ও পুসকাসের সঙ্গে এক নিশ্বাসে উচ্চারিত হয়ে থাকে ডি স্তেফানোর নাম। পেলে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ফুটবলকে জনপ্রিয় করে থাকেন, তবে ডি স্তেফানো পঞ্চাশের দশকে গোটা ইউরোপের ফুটবলের ধারণাকে বদলে দিয়েছিলেন।

১৯৫৬ সালে ইউরোপিয়ান কাপ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রথম পাঁচ বছর গোটা ইউরোপকে স্তম্ভিত করে ডি স্তেফানোর নেতৃত্বে রিয়েল মাদ্রিদ এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান হয়। টানা পাঁচ বছর ইউরোপিয়ান কাপ জয়ের সেই রেকর্ড এখনও অটুট। তাঁর সময়ে রিয়েল মাদ্রিদ বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবল ক্লাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অবশ্য এই অপ্রতিহত জয়যাত্রায় ডি স্তেফানো পেয়েছিলেন পুসকাসের মতো দুর্দান্ত ফুটবলারের সাহায্য।

বিশ্ব ফুটবলের মেগাস্টার

রাতুল ঘোষ

১৯২৬ সালের ৪ জুলাই আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইরেস-এ ডি স্তেফানোর জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন বাস-কণ্ডাকটর। বাবার কাছেই তিনি ফুটবল শেখেন। তাঁর বাবা নিজেও ছিলেন অপেশাদার সেন্টার ফরোয়ার্ড। এ-ব্যাপারে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ডি স্তেফানো বলেছেন, "আমি ছেলেবেলায় কেবল ডান পায়ে খেলতাম। কিন্তু বাঁ পায়ে বল না মারলে বাবা কিছুতেই খেলতে দিতে চাইতেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন, এক পায়ে কখনও বড় ফুটবলার হওয়া যায় না। দুটো পা সমান ব্যবহার করতে হবে। আজ বুঝি, তাঁর সেই উপদেশ আমার জীবনে কত কাজে এসেছে।"

ডি স্তেফানোর বয়স তখন সবে পনেরো পেরিয়েছে। বাবা চাইলেন, ছেলে হোক ফুটবলার। মায়ের ইচ্ছে, ছেলে খেত-খামার দেখুক। শেষ পর্যন্ত বাবার ইচ্ছেই জয়ী হল। বাবার আগ্রহে ডি স্তেফানো ভর্তি হলেন এক বিজনেস কলেজে। সেখানে ফুটবল খেলার সুযোগ ছিল অফুরন্ত। ১৭ বছর বয়সে আর্জেন্টিনার বিখ্যাত ক্লাব রিভারপ্লেটে নাম লেখান ডি স্তেফানো। তাঁকে প্রথম আবিষ্কার করেন রিভারপ্লেটের ম্যানেজার। এক বছর অপেক্ষা করার পর তিনি রিভারপ্লেটের

আলফ্রেডো ডি স্তেফানো

পেশাদার দলে সুযোগ পেয়ে অচিরেই সমর্থকদের চোখের মণি হয়ে ওঠেন। তিন বছর রিভারপ্লেটে থাকার সময় ডি স্তেফানো একবার ক্লাবকে লিগ-চ্যাম্পিয়ান করেন ও আর-একবার তিনি নিজে লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পান। আর্জেন্টিনার হয়ে তিনি খেলেছিলেন সাতটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ।

কলম্বিয়ার ফুটবল মান উন্নত করতে ডি স্তেফানোকে রিভারপ্লেট থেকে প্রায় ১৫ গুণ অর্থের বিনিময়ে সাড়ে-তিন বছরের জন্য কিনে নেয় বেটেগা'র লোস মিলিয়ানিরস ক্লাব। এই ক্লাবকে তিনি ১৯৫০ ও '৫২ সালে লিগ-চ্যাম্পিয়ান করেন। তাঁর বয়স যখন ২৭, সেই সময় প্রায় ২৯ হাজার ডলার দিয়ে তাঁকে স্পেনের বিখ্যাত ক্লাব রিয়েল মাদ্রিদ চার বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ করে। সেই সময়ে তিনিই ছিলেন বিশ্বের সর্বোচ্চ মূল্যের ফুটবলার।

১৯৫৭ সালে স্প্যানিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করার পর স্পেনের হয়ে মোট ৩১টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ডি স্তেফানো মোট ২৩টি গোল করেছিলেন। এই সময়ে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল বিস্ময়কর। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত রিয়েল মাদ্রিদের ফুটবল-ইতিহাসের স্বর্ণযুগে ডি স্তেফানো পেয়েছিলেন সম্রাটের আসন।

স্ট্যানলি ম্যাথুজ

দীর্ঘ ৩৫ বছর ফুটবল খেলেছেন স্ট্যানলি ম্যাথুজ। ব্রিটিশ ফুটবলে সর্বকালের সেরা এই ফুটবলারটিকে ১৯৫৭ সালে ব্রিটেনের সর্বোচ্চ সম্মান 'অর্ডার অব দা ব্রিটিশ এম্পায়ার' খেতাব দেওয়া হয় এবং ১৯৬৫ সালে ইংল্যাণ্ডের রানি তাঁকে দেন নাইটহুড। ইংল্যাণ্ডের হয়ে ৫০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ছাড়াও, তিনবার তিনি এফ এ কাপ ফাইনালে খেলেছিলেন। শেষবার যখন

তিনি ব্ল্যাকপুল দলকে এফ এ কাপ চ্যাম্পিয়ান করেন, তখন তাঁর বয়স ৩৮ বছর। ইংল্যাণ্ডে স্যার স্ট্যানলি ম্যাথুজকে বলা হত 'ফুটবলের জাদুকর'।

চেহারায় আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না ম্যাথুজের। কিন্তু ফুটবল-মাঠে রেফারির মুখে খেলা শুরুর বাঁশি বাজার সঙ্গে-সঙ্গেই দারুণভাবে বদলে যেতেন তিনি। বাকি চার ফরোয়ার্ডের চেয়ে একটু পিছনে, ডান প্রান্তের টাচলাইন বরাবর দাঁড়াতেন ম্যাথুজ, যাতে দৌড়নোর জন্য কিছুটা বাড়তি ফাঁকা জমি পাওয়া যায়। প্রথম বলটি তাঁর কাছে আসা মাত্রই তিনি সেটিকে 'ডেড স্টপ' করে একবার বিপক্ষের ডিফেণ্ডারদের অবস্থান জরিপ করে নিতেন।

সেই মুহূর্তে বিপক্ষের নিকটতম ব্যাকটি জানতেন, ম্যাথুজ তাঁর পাশ দিয়ে বেরোবেন আউট সাইড ডজ করে। অথচ ম্যাথুজকে আটকাতে ওপরে উঠে তড়িঘড়ি 'ট্যাকল'-এ যাওয়ার চেষ্টা করা বোকামি। সুতরাং ব্যাকটি সরে এসে ডান দিকের টাচলাইন ঘেঁষে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে ম্যাথুজ বল নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এবং ওই ব্যাকটিকে অবাক করে একটি ইনসাইড ডজে ছিটকে ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। পরবর্তী ডিফেণ্ডারটিকেও শরীরের দোলায় অবহেলায় ছিটকে দিলেন ম্যাথুজ। এইভাবে একের পর এক ডিফেণ্ডারকে অতিক্রম করে হয় ম্যাথুজ নিজে বল গোলে ঠেলতেন, নয়তো ফাঁকা গোলের সামনে বল সাজিয়ে দিতেন কোনও সতীর্থের পায়ে।

প্রথম ডিফেণ্ডারটিকে ডজ করার পর ম্যাথুজ তাঁর গতির হেরফের ঘটাতেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, একসঙ্গে দু'জন ডিফেণ্ডার ট্যাকলে আসা সত্ত্বেও ম্যাথুজ স্প্রিণ্টারের মতো গতি বাড়িয়ে তাঁদের পরাস্ত করেছেন। কিংবা একটি মারাত্মক বডি সোয়ার্ভ-এ ছিটকে ফেলে দিয়েছেন নিকটতম চ্যালেঞ্জারকে। ম্যাথুজের কোমর ও কাঁধের মোচড় ছিল তাঁর প্রধান অস্ত্র। প্রচণ্ড গতির সঙ্গে এই বডি সোয়ার্ভের মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি বারবার বিশ্বের সেরা ডিফেণ্ডারদের নাজেহাল করেছেন।

প্রতিপক্ষ ডিফেণ্ডাররা ম্যাথুজকে আটকাতে এত ব্যস্ত থাকতেন যে, প্রায়ই অন্য ফরোয়ার্ডরা গোল করে বেরিয়ে যেতেন। ম্যাথুজ মাঝে-মধ্যে ইচ্ছে করে বেশিক্ষণ বল নিজের পায়ে রেখে বিপক্ষের ডিফেণ্ডারদের একদিকে টেনে এনে ফাঁকায় বল বাড়াতেন সতীর্থদের। তবে কোনও-কোনও সমালোচক বলেছেন, "অতিরিক্ত সময় পায়ে বল রেখে ম্যাথুজ বিপক্ষের ডিফেন্সকে গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিতেন।"

নিজে গোল করার চেয়ে ম্যাথুজ অন্যকে দিয়ে গোল করিয়ে বেশি আনন্দ পেতেন। এবং ডান দিকের টাচলাইন থেকে উড়ে-আসা ব্যাক সেন্টারগুলি নির্ভুল নিশানায় নেমে আসত বিপক্ষের গোলরক্ষকের প্রসারিত হাতের নাগাল এড়িয়ে দ্বিতীয় পোস্টে অপেক্ষমান কোনও সতীর্থ ফরোয়ার্ডের পায়ে অথবা মাথায়। এমনই ছিল তাঁর সময়জ্ঞান, ও বল কন্ট্রোল যে এই পরিস্থিতিতে কদাচিৎ সতীর্থ ফরোয়ার্ডরা অফসাইডে পড়তেন।

তাঁর পিতা জ্যাক ম্যাথুজ ছিলেন একজন বক্সার, যাঁকে বলা হত 'ফাইটিং বার্বার অব হ্যানলি'। তিনি জীবনে ৩৫০টিরও বেশি লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় নিয়মিত ম্যাথুজকে ভোর ৬টায় ঘুম থেকে তুলে দিতেন বাবা এবং দু'জনে মিলে জগিং ও নানারকম ব্যায়াম করতেন। ম্যাথুজের তিন দশক স্থায়ী বিস্ময়কর ফুটবল-জীবনের জ্বালানি সংগৃহীত হয়েছিল এই ছেলেবেলায়, বাবার সতর্ক দৃষ্টির সামনে।

১৮ বছর বয়সে ম্যাথুজ যোগ দেন স্টোক সিটিতে। ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বরে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি ইংল্যাণ্ডের হয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচটি খেলেন। এবং ৪০ বছর বয়সে ১৯৫৭ সালে স্কটল্যাণ্ডের বিপক্ষে তিনি শেষবার ইংল্যাণ্ডের জার্সি গায়ে তোলেন। দীর্ঘ ১৬ বছর স্টোকসিটিতে খেলার পর ম্যাথুজ যখন ব্ল্যাকপুলে যোগ দিলেন, তখন ক্ষুব্ধ সমর্থকরা স্টোকসিটি গ্রাউণ্ডের চারপাশে হাজার হাজার পোস্টার লাগালেন, "ম্যাথুজ, মাস্ট নট গো"।

স্ট্যানলি ম্যাথুজ

ম্যাথুজের জীবনের স্বপ্ন ছিল একবার এফ এ কাপ চ্যাম্পিয়ান মেডেল জেতা। দু'বার ফাইনালে উঠেও ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৫৩ সালে ব্ল্যাকপুলকে তিনি এফ এ কাপ চ্যাম্পিয়ান করেন। খেলার শেষ বাঁশি বাজার ২০ মিনিট আগেও ব্ল্যাকপুল পিছিয়ে ছিল ১—৩ গোলে। অতঃপর ৩৮ বছরের ম্যাথুজ খোলস ছেড়ে বেরিয়ে জীবনের সেরা ম্যাচটি, খেললেন। অবিশ্বাস্য নাটকীয়তায় ভরা এই ম্যাচটি 'ম্যাথুজের ম্যাচ' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ফেরেঙ্ক পুসকাস

পঞ্চাশের দশকে দুনিয়া-কাঁপানো হাঙ্গারি দলে হিদেকুটিকে যদি বলা হয় ফুটবলের জাতশিল্পী, ককসিস যদি চিহ্নিত হন 'গোলমেশিন' হিসেবে, তা হলে হাঙ্গারির গোটা দলটির হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুস ছিলেন নিঃসন্দেহে ফেরেঙ্ক পুসকাস। তাঁর সাধারণ অবস্থা থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠার কাহিনী ফুটবলের নবীন শিক্ষার্থীদের প্রেরণা দেয়।

১৯২৬ সালের ২ এপ্রিল পুসকাসের জন্ম। বাবা ছিলেন একজন সাধারণ মানের ফুটবলার। বাবা-মায়ের দ্বিতীয় সন্তান পুসকাসের ছেলেবেলায় ডাকনাম ছিল ওক্সি। পরবর্তী জীবনে তিনি যখন খ্যাতির মধ্যগগনে, তখন অগণিত গুণমুগ্ধ অটোগ্রাফ শিকারিদের দরাজ হাতে সই বিলোনোর আগে পুসকাস নিজের নামের আগে লিখতেন 'ওক্সি'। ছেলেবেলায় কিসপেস্টের রাস্তায় পুরনো ছেঁড়া মোজা নিয়ে খেলতেন ওক্সি। বাবা ছিলেন এতই দরিদ্র যে, দুই ভাইয়ের জন্য তিনি একজোড়ার বেশি বুট কিনে দিতে পারেননি। ওক্সি সবসময় ডান পায়ে একপাটি বুট পরতেন, আর একটি তাঁর ভাই পরত বাঁ পায়ে। ডান পায়ের বুটটি যাতে ছিঁড়ে না যায়, সেদিকে সর্বদা লক্ষ রাখতেন ওক্সি। তাই তিনি শুধু বাঁ পায়ে বল মারতেন। এভাবেই আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে যায় বিশ্ব ফুটবলের অদ্বিতীয় বাঁ পা'টি।

মাত্র ১৩ বছর বয়সে কিসপেস্টের হয়ে প্রথম ফুটবল জীবন শুরু করেন পুসকাস। এবং অচিরেই তাঁর প্রতিভার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ১৬ বছর বয়সে হাঙ্গারির যুব দলে খেলার জন্য ডাক পান পুসকাস। সুযোগটা তিনি দারুণভাবে কাজে লাগান।

১৭ বছরে পা দেওয়ার কিছু দিন পরেই ১৯৪৫ সালে পুসকাস অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে হাঙ্গারির জাতীয় দলে তাঁর প্রিয় ১০ নম্বর জার্সিটি প্রথম গায়ে চাপান। পরবর্তী ১১

পুসকাস পরাজয়কেও সহজভাবে নিতে পারতেন

বছর এই জার্সি পরেই পুসকাস হাঙ্গারিকে এনে দিয়েছিলেন একের পর এক বিস্ময়কর জয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময় গোটা ইউরোপে ফুটবল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও হাঙ্গারিতে তা অব্যাহত ছিল। এবং পঞ্চাশের দশকের সূচনায় শুরু হয় হাঙ্গারিয়ান ফুটবলের স্বর্ণযুগ, যাঁর নেতৃত্বে ছিলেন পুসকাস।

সেই সময়ে ইউরোপে প্রচলিত ছিল 'ডবলিউ' ফর্মেশন। বুদাপেস্ত জার্মানদের কবলমুক্ত হওয়ার পর হাঙ্গারির ফুটবল-কর্তারা ক্লাব-ফুটবলকে ঢেলে সাজান। পুসকাসের ক্লাব কিসপেস্ট পুরোপুরি একটি আর্মি ক্লাবে রূপান্তরিত হয় এবং তার নাম বদলে হয় হনভেড। এই ক্লাবেই খেলতেন গোলরক্ষক গ্রোসিকস, উইং হাফ যোশেফ বোজিক, ফরোয়ার্ড ককসিস, জিবর এবং অবশ্যই দা গ্রেট ফেরেঙ্ক পুসকাস। অচিরেই এই নামগুলি ইউরোপের ঘরে ঘরে স্থায়ী জায়গা করে নেয়।

নিজের স্কিল ও ফুটবল-দক্ষতা বাড়ানোর জন্য পুসকাস দিন-রাত ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করতেন। নিয়মিত অনুশীলনের পর শুরু হত তাঁর 'প্রাইভেট প্র্যাকটিস'। একটা ইটের দেওয়ালে একনাগাড়ে বল মেরে যেতেন। ফিরতি বলটা শরীরের বিভিন্ন অংশ দিয়ে নিখুঁতভাবে 'রিসিভ' করার কৌশল রপ্ত করতেন। এভাবে ক্রমাগত পরিশ্রমের ফলে বলকে নিজের পোষমানা ভৃত্যে পরিণত করেন পুসকাস।

হনভেড ক্লাবের ফুটবলাররা সকলেই ছিলেন পিপল্‌স আর্মির বেতনভুক কর্মী। কিন্তু তাঁদের সরাসরি যুদ্ধে যেতে হত না। লড়াইটা ছিল ফুটবল মাঠেই সীমাবদ্ধ। এবং এভাবে জীবনে একবারও কাঁধে বন্দুক না তুলে পুসকাস সেনাবাহিনীর মেজর পদে প্রোমোশন পান।

হাঙ্গারির ফুটবলের স্বর্ণযুগে পুসকাস জাতীয় দলের হয়ে ৮৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন। ১৯৫৬ সালে রুশ সৈন্য হাঙ্গারি অবরোধের পর পুসকাস দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখনকার ইউরোপের সেরা ক্লাব রিয়েল মাদ্রিদ তৎক্ষণাৎ মোটা অর্থের বিনিময়ে লুফে নিল পুসকাসকে। এই ক্লাবে পুসকাস উপার্জন করেছিলেন প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ পাউণ্ড।

পেলে যখন তাঁর সহস্রতম গোলটি দেন তখন পুসকাস মন্তব্য করেছিলেন, "লোকে বলছে, পেলে ১০০০ গোল দিয়েছে। খুব ভাল কথা। কিন্তু আমি ক'টা গোল দিয়েছি কে তার হিসেব রাখে ? আমার তো মনে হয়, আমি কম করে ১৫০০ গোল দিয়েছি।"

ববি চার্লটন

১৯৫৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ম্যাঞ্চেস্টারে এক শীতের সকাল। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে ট্রেনে চাপলেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ফুটবল জহুরি জো আর্মস্ট্রং। ক্লাবের চিফ কোচ ম্যাট বুশবি'র নির্দেশে তাঁকে মাঝে-মধ্যেই এরকম যত্রতত্র স্কুলের ম্যাচগুলিতে যেতে হয় খুদে প্রতিভার খোঁজে। তাঁর গন্তব্যস্থল ছিল নিউক্যাস্‌ল। সেখানে নরদামবারল্যান্ড ও হেপবার্ন স্কুলের ম্যাচটি দেখার জন্যই তাঁর এতদূর আসা।

আর্মস্ট্রং তাঁর জহুরি-জীবনের সেরা প্রতিভাটি সেদিন আবিষ্কার করেছিলেন। ম্যাচের শেষে আনন্দে উচ্ছল আর্মস্ট্রং ববির মা সিসি চার্লটনকে বলেছিলেন, "আপনার ছেলে ববি চার্লটন ২১ বছরে পা দেওয়ার আগেই ইংল্যান্ডের হয়ে খেলবে।"

অভ্রান্ত ছিল তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী। গত চার দশকের মধ্যে ইংল্যান্ডের সেরা জনপ্রিয় ফুটবলারটিকে আবিষ্কারের গল্প আর্মস্ট্রংয়ের মুখে শুনে চিফ কোচ ম্যাট বুশবি আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছিলেন। বুশবিকে তিনি ববি সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলেন ঠিক এভাবে, "ছেলেটা হরিণের মতো দৌড়য়। কাঁধের দোলায় একসঙ্গে দু'তিন জনকে ছিটকে দেয়। আর ১৪ বছরের ওইটুকু ছেলের পায়ে শট দেখলে চমকে উঠতে হয়।"

১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে বাবার হাত ধরে মাত্র ১৫ বছর বয়সে ববি চার্লটন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ক্লাবে আসেন। ছেলেকে এতদূরে পাঠাতে প্রথমে তিনি রাজি ছিলেন না। কিন্তু ম্যাট বুশবির অফিসে বাবা যখন জানতে চান, "তোমার কী মত ববি ?" তখন তিনি উত্তর পান "আমাকে ছেড়ে দাও বাবা। আমি এখানেই খেলতে চাই।"

ওই অল্প বয়সেই ববিকে চেয়েছিল মোট ১৮টি ক্লাব। একটি ক্লাব তো তাঁর বাবার হাতে দু'হাজার ডলার তুলে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ববির নিজস্ব পছন্দ ছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। অথচ ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের পেশাদার প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়ার জন্য ববি চার্লটনকে দীর্ঘ চার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সেই মুহূর্তে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ছিল ইউরোপের অন্যতম সেরা দল। ববির মতো উদীয়মান ফুটবলার তখন ক্লাবে অন্তত এক ডজন ছিল। ওই ঝাঁকের মধ্যে সেরা রত্নটি ছিলেন ডানকান এডওয়ার্ড্‌স, যিনি মাত্র ১৬ বছর বয়সে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে প্রথম

ববি চার্লটন (ডানদিকে)

ম্যাচ খেলেন এবং ইংল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে মাত্র ১৮ বছর বয়সে জাতীয় দলে খেলার সুযোগ করে নেন।

১৯৫৭ সালের এফ এ কাপ সেমি ফাইনালে চার্লটন একটা দুর্দান্ত গোল করে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে ফাইনালে তোলেন। তারপর থেকে তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। কিন্তু যে চার বছর তাঁকে প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল, তার প্রতিটি দিন ববি চার্লটনকে প্র্যাকটিসে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। অন্য কেউ হলে হয়তো ফুটবলই ছেড়ে দিত।

১৯৫৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ইউরোপিয়ান কাপের সেমিফাইনালে ওঠার জন্য ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে গেল রেডস্টারের বিরুদ্ধে খেলতে। প্রথমার্ধেই ম্যাঞ্চেস্টার

ইউনাইটেড ৩-০ গোলে এগিয়ে গেল, যার মধ্যে দু'টি গোল করেন ববি চার্লটন। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে পর-পর তিনটি গোলই শোধ করে দেয় রেডস্টার বেলগ্রেড। অবশ্য ভাল গোলের গড়ে ইউরোপিয়ান কাপের ফাইনালে চলে যায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

১৯৫৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বেলগ্রেড থেকে ফেরার পথেই ঘটে সেই বিমান দুর্ঘটনা। বড় যত্নে গড়ে তোলা ইউরোপ কাঁপানো ম্যাট বুশবির সাধের দলটির অর্ধেক ওই বিমান দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান বায়ার্ন, বেল্ট, জোন্স, হোয়েলান, কোলম্যান, পেগ ও টমি টেলার। পরে হাসপাতালে মারা যান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইংল্যান্ডের সেরা ফুটবল প্রতিভা ডানকান এর্ডওয়ার্ড্স।

অলৌকিকভাবে বেঁচে যান ববি চার্লটন। দুর্ঘটনা স্থল থেকে ৬০ গজ দূরে ছিটকে পড়েও ববির হাড়গোড় ভাঙেনি, কপাল একটু কেটে গিয়েছিল।

এই দুর্ঘটনা ববি চার্লটনকে মানসিকভাবে দারুণ ধাক্কা দিলেও ফুটবলের প্রতি তিনি আরও মনোযোগী হন। মৃত বন্ধুদের আরব্ধ কাজ শেষ করার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। লেফট ইন সাইড থেকে তাঁকে লেফট উইংয়ে সরিয়ে আনেন ম্যাট বুশবি। হ্যাম্পডেন পার্কে ইংল্যান্ডের জার্সি গায়ে টম ফিনির সেন্টার থেকে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে ববির দুরন্ত ভলি অচিরেই তাঁকে 'গোল্ডেন বয়' আখ্যা দেয়।

তবে ববি চার্লটনের ফুটবলজীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় অধ্যায় ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ জয়। ১৯৬৫-র গোড়া থেকেই ম্যাট বুশবি ক্লাবের স্বার্থে ববি চার্লটনকে লেফট উইং থেকে সরিয়ে এনে মিডফিল্ড জেনারেলের দায়িত্ব দেন। ততদিনে ম্যাঞ্চেস্টার দলে জর্জ বেস্ট এসে গেছেন। এবং ববি চার্লটন তাঁর ফুটবল জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটির সম্মুখীন হন ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপে।

১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ জয়ে ববি চার্লটনের প্রত্যক্ষ অবদান হয়তো অধিনায়ক ববি মুর বা ফাইনালে জিওফ হার্স্ট-এর হ্যাটট্রিকের মতো নাটকীয় নয়। কিন্তু মাঝমাঠে ববি চার্লটন দুর্দান্ত খেলেছিলেন।

পেলে

ব্রাজিলের জাতীয় দলের প্রাক্তন ম্যানেজার জোয়াও সালধানা সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একবার বলেছিলেন, "আমাকে প্রশ্ন যদি করেন ব্রাজিলের সেরা ফুলব্যাক কে আমি বলব পেলে। যদি জানতে চান কে সেরা উইং হাফ—আমার উত্তর হবে পেলে, এবং যদি সেরা ফরোয়ার্ডটির নাম জিজ্ঞেস করেন, তা হলেও আমি বলব পেলে।" পেলের সঙ্গে কোনও ফুটবলারের তুলনা হয় না। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর আসল নাম এডসন অ্যারান্টেস ডো নাসিমেন্টো। বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তিনিই।

গত অর্ধশতাব্দীব্যাপী বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে পেলের সঙ্গে বিস্ময়কর অনেক প্রতিভার তুলনা টানা হয়েছে। কিন্তু তাতে মুকুটহীন সম্রাটের আসন থেকে পেলেকে কেউ সিংহাসনচ্যুত করতে পারেননি। একটা ম্যাচে ব্যক্তিগত প্রভাবের তুলনামূলক বিচারে পেলের চেয়ে শেষ পর্যন্ত একমাত্র ডি স্তেফানোই সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছেন। অন্যরা কেউ পেলেকে ছুঁতে পারেননি। এমনই তাঁর কালজয়ী প্রতিভা। সারা বিশ্বের মানুষের কাছে ফুটবল ও পেলে শব্দ দু'টি প্রায় সমার্থক। পেলে তাঁর ফুটবল-জীবনে তিনবার (১৯৬২ সালে আহত পেলে ব্রাজিল দলের হয়ে দু'টি ম্যাচ খেলেছিলেন) বিশ্বকাপ জিতেছেন, এক হাজারের ওপর গোল করেছেন, এবং টানা ২০ বছর বিশ্বের এক নম্বর ফুটবলারের জায়গাটি স্বমহিমায় দখল করে রেখেছিলেন।

১৯৫৮ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে পেলে যখন সুইডেনে তাঁর চারটি বিশ্বকাপের প্রথমটি খেলতে যান, তখন জালমা স্যান্টোস, নিলটন স্যান্টোস, ডিডি, ভাভা, গ্যারিঞ্চা, মারিও জাগালো'র মতো নক্ষত্র ব্রাজিল দল আলো করে রেখেছেন। '৫৮র বিশ্বকাপ জিতে ঘরে ফেরার পর ফুটবল-দুনিয়া জেনে যায়, ফুটবল-দিগন্তে নতুন সূর্যের উদয়ের খবরটি। চিলিতে ১৯৬২ সালের বিশ্বকাপে পেলে মাত্র দু'টি ম্যাচ খেলার পর নিদারুণ আঘাত নিয়ে মাঠ ছাড়েন। তাঁর আরব্ধ কাজ সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেন 'ফ্লাইং বার্ড' গ্যারিঞ্চা। ১৯৬২ সালেও বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান হয় ব্রাজিল।

ইংল্যান্ডে ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ পেলে ও ব্রাজিলের পক্ষে এক দারুণ দুঃস্বপ্ন। সেবার পেলেকে নির্দয়ভাবে রেফারির চোখের

যে কোনও অবস্থাতেই পেলে ছিলেন দুর্দমনীয়

সামনে বারবার আঘাত করে পর্তুগালের মোরেইস মাঠ থেকে বের করে দেন। সেই সঙ্গে বিলীন হয় ব্রাজিলের সেমিফাইনালে যাওয়ার আশা। আঘাতটা এত তীব্র ছিল যে, পেলে একসময় ভেবেছিলেন, বিশ্বকাপ ফুটবলে আর কোনওদিন খেলবেন না।

ফুটবল-রসিকদের সৌভাগ্য, অচিরেই নৈরাশ্য কাটিয়ে পেলে টানা চার মাস কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ না খেলে একনাগাড়ে অনুশীলন করেছিলেন। পেলেকে আর কখনও এরকম অনুশীলন করতে দেখা যায়নি।

এর পর ১৯৭০ সালে গুয়াদালজারা ও মেক্সিকো সিটিতে ব্রাজিলের ফুটবলাররা যে কী ঝড় তুলেছিলেন, তা আজ ইতিহাস হয়ে আছে। এমন একপেশে বিশ্বকাপ আগে আর কখনও হয়নি।

মেক্সিকো সিটিতে পা দেওয়ার মুহূর্ত থেকেই ব্রাজিল ছিল 'হট ফেভারিট'। পেলেও ছিলেন তাঁর ফুটবল-দক্ষতার শীর্ষে। 'হোয়াইট পেলে' টোস্টাও, রাইট উইঙ্গার জেয়ারজিনহো, রিভেলিনো, মির্ডফিল্ড জেনারেল গারসন, অধিনায়ক কার্লস অ্যালবার্তো সমৃদ্ধ ব্রাজিলের সেই দলটি ফুটবল-ইতিহাসে সর্বকালের সেরা দলের তালিকায় সম্ভবত শীর্ষে থাকবে।

সেই বিশ্বকাপে টোস্টাও, জেয়ারজিনহো ও গারসন ছিলেন ফর্মের চূড়ায়। এবং ১৯৭০-এর বিশ্বকাপে পেলে সম্পর্কে সেরা মন্তব্যটি করেছেন গ্রেট ডিফেন্ডার ববি মুর। তিনি বলেন, "এক-এক সময় মনে হত বলটা পেয়ে গেছি। বল নিজের দখলে এসে গেছে মনে করে এগোতে গিয়ে দেখি, পেলে আমাকে পিছনে ফেলে বল পায়ে নিয়ে অন্তত ১০ হাত এগিয়ে গেছেন। তখন তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আসলে আমার পায়ে বলটা টোকা দিয়ে মেরে ফিরতি বলটা পায়ের তলা দিয়ে গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন পেলে। ওঁর বিরুদ্ধে এমন ঠকতে হয়েছে বহুবার। প্রথমবার এভাবে বোকা-বনার মুহূর্তে ভেবেছিলাম, নেহাতই দুর্ঘটনা। পরে সাতবার ঠকার পর বুঝলাম, ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। এভাবে আমাকে বারবার ঠকানো একমাত্র পেলের পক্ষেই সম্ভব।"

১৯৪০ সালের ২১ অক্টোবর ট্রেস কোরাকেম শহরের দরিদ্র এক কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারে পেলের জন্ম। ছেলেবেলায় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাঁকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে। অথচ খ্যাতির মধ্যগগনে পেলের আর্থিক বৈভব যে-কোনও লোকের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একটা সময় ছিল, যখন পেলেকে টিভি-ক্যামেরার সামনে এনে হাজির করতে পারলেই আর্থিক পুরস্কার মিলত। ১৯৭১ সালের ১৮ জুলাই পেলে যেদিন ব্রাজিলের জাতীয় দলের ১০ নম্বর জার্সি গায়ে জীবনের শেষ ম্যাচটি খেললেন টিভির পরদায় সেদিন বারবার ঘোষিত হয়, যিনি পেলেকে টিভি-স্টুডিওতে আনতে পারবেন, তাঁকে ২,৫০০ ডলার আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। ম্যাচের পর পাঁচতারা হোটেলে ফিরে পেলে দেখেন, হোটেলকর্মীরা দল বেঁধে তাঁর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। সবার দাবি "আমার সঙ্গে টিভি স্টুডিওতে চলুন। কারণ, আপনি গেলে তবেই আমার পরিবার ওই পুরস্কারের টাকাটা পেয়ে বাঁচবে।" পেলে নিজে টিভি-স্টুডিওতে যাওয়ার অনুরোধ না রাখলেও নিজের পকেট থেকে হোটেলকর্মীদের হাতে টাকা তুলে দিয়েছিলেন। অথচ একবার টিভি-স্টুডিওতে গেলেই পেলে অন্তত ২৫ হাজার ডলার পেতেন।

খেলা ছাড়ার চার বছর পর ১৯৭৫ সালের ১০ জুন ৪০ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে পেলে তিন বছরের জন্য নিউ ইয়র্ক কসমসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। কলকাতায় মোহনবাগান কসমস ম্যাচটি পেলে খেলেন এই চুক্তির শেষপর্বে '৭৭ সালে।

ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার

ফুটবল-জীবনে দু'বার বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠে একবার বিশ্বকাপ জিতেছিলেন ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার। তবু তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দদায়ক মুহূর্তটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "আমার প্রশিক্ষণে ১৯৮৬-র বিশ্বকাপে পশ্চিম জার্মানি ফাইনালে উঠেছিল, এতেই আমি সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি।" নিজের দেশে যাঁকে কেউ বলেন 'কাইজার', কেউ বা বলেন, 'এম্পায়ার ফ্রাঞ্জ', ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর কিন্তু রাজকীয় বৈভবে মন নেই। ফুটবল-জীবনে তাঁর আদর্শ ১৯৫৪-র বিশ্বকাপ জয়ী জার্মান অধিনায়ক ফ্রিৎজ ওয়াল্টার।

ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার

গত এক যুগে পশ্চিম জার্মান দলে কাইজারের কোনও বিকল্প খুঁজে পাওয়া যায়নি। বেকেনবাওয়ার পশ্চিম জার্মানির হয়ে মোট ১০৩টি ম্যাচ খেলেছেন। এর মধ্যে তাঁর অধিনায়কত্বে পশ্চিম জার্মানি ১৯৭২ সালে ইউরোপিয়ান কাপ জেতে, এবং ১৯৭৪ সালে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান হয়।

জার্মানদের মধ্যে ব্যাভারিয়ানরা বরাবরই বীরত্বের জন্য আলাদা গুরুত্ব পেয়ে থাকে। জন্মসূত্রে ব্যাভারিয়ান বেকেনবাওয়ারের মধ্যে ফুটবল-মাঠে এই বীরত্বের প্রকাশ ঘটেছে অসংখ্যবার। ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে হাতে প্লাস্টার বেঁধে ইতালির বিরুদ্ধে তিনি যে দুরন্ত ফুটবল খেলেছিলেন, তা আজ হয়তো রূপকথার মতো শোনাবে। তবু শতাব্দীর অন্যতম সেরা ম্যাচ হিসেবে চিহ্নিত ওই খেলায় বেকেনবাওয়ারের পশ্চিম জার্মানি মরণপণ সংগ্রাম করে ইতালির কাছে হেরেছিল ৩-৪ গোলে।

বেকেনবাওয়ারের অসাধারণ স্কিল যদিও যে কোনও পজিশনে প্রস্ফুটিত হতে পারত, তবুও তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ ছিল 'সুইপার' পজিশনটি। এবং আভিধানিক অর্থে আদর্শ সুইপারের ধারণাটি বিশ্ব-ফুটবলে তাঁরই অবদান। ইতালির 'ক্যাতানেসিও' সিস্টেমে সুইপারের ভূমিকা ছিল মূলত ডিফেন্সিভ। বেকেনবাওয়ার ফুটবল-অভিধানে সুইপার শব্দটির সংজ্ঞা বদলে দেন। বিপক্ষ যখন আক্রমণে উঠেছে, তখন তাদের দুর্গে মারাত্মক প্রতি-আক্রমণটি নিঃশব্দে তুলে আনতেন সুইপার বেকেনবাওয়ার। আবার প্রয়োজনে তিনি অসংখ্যবার 'লাস্ট লাইন অব ডিফেন্স' হয়ে দলের অবধারিত পতন রোধ করেছেন।

মাত্র ১৯ বছর বয়সে জাতীয় কোচ হেলমুট শোন ১৯৬৬-র বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শিবিরে বেকেনবাওয়ারকে ডেকে নেন। ১৯৬৬-র বিশ্বকাপ ফাইনালে কোচের নির্দেশে ইংল্যান্ডের ববি চার্লটনকে 'মার্ক' করতে গিয়ে বেকেনবাওয়ার নিজের সৃজনশীল ফুটবল থেকে সরে আসেন এবং যার দরুন তাঁর দলকে চরম মূল্য দিতে হয়। ফাইনালে ইংল্যান্ডের জিওফ হার্স্টের তৃতীয়

গোলটি ছিল বিতর্কিত এবং এ-ব্যাপারে বেকেনবাওয়ার আগাগোড়া বলে এসেছেন, "বল কিছুতেই গোললাইন অতিক্রম করেনি। ওটি ইংল্যান্ডকে পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

এর বদলা বেকেনবাওয়ার নিয়েছিলেন '৭০ সালে মেক্সিকো বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পরপর দু'টি ম্যাচে গোল করে। ১৯৫৪-র বিশ্বকাপজয়ী পশ্চিম জার্মানির প্রশিক্ষক শেপ হারবারজার মনে করেন, ৪০ বছর বয়সেও বেকেনবাওয়ার জাতীয় দলে খেলতে পারতেন। ফুটবল-জীবনে বহু লোভনীয় 'অফার' তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। সেটি তাঁর প্রিয় ক্লাব বেয়ার্ন মিউনিখের স্বার্থে। ১৯৭৪-৭৬ পর্যন্ত টানা তিনবার বেয়ার্ন মিউনিখকে তিনি, শেপ মেয়ার ও জার্ড মুলাররা ইউরোপিয়ান ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়ান করেছিলেন। এই দলের জন্যই ১৯৬৬ সালে ইতালির এ সি মিলানের সাড়ে চার লক্ষ ডলারের অফার তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

কিন্তু ১৯৭৬ সালে নিউইয়র্ক কসমসের প্রেসিডেন্ট ক্লাইভ টো-এর ২৮ লক্ষ ডলারের অফার তিনি ফিরিয়ে দিতে পারেননি।

ববি মুর

১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপের একবছর আগে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ম্যানেজার রন গ্রিনউডকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "ইংল্যান্ডের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি? উত্তরে তিনি মাঠে অনুশীলনরত ববি মুরকে দেখিয়ে বলেছিলেন, "আমরা চ্যাম্পিয়ান হতে চলেছি, আর তার মূল কারণ আমাদের দলে রয়েছে ওই ডিফেন্ডারটি। আপনারা মিলিয়ে নেবেন, ওই ববি মুরের হাতেই ধরা দেবে জুলে রিমে কাপ।" পেলের মতেও তাঁর দেখা সেরা ডিফেন্ডার ববি মুর।

অভ্রান্ত ছিল গ্রিনউডের ভবিষ্যদ্বাণী। ববি মুরের অধিনায়কত্বে ইংল্যান্ড নিজের দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জেতে ১৯৬৬ সালে। ববি মুর দেশবাসীর কাছে হয়ে ওঠেন 'হিরো'। ইংল্যান্ডের হয়ে রেকর্ড- সংখ্যক ১০৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ববি মুর খেলেছেন। সংখ্যার দিক থেকে তাঁর পরের স্থানটি যাঁর, সেই বিলি রাইট-এর (তিনি খেলেছেন ১০৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ) সঙ্গে প্রায়ই ববি মুরের তুলনা করা হয়। চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা ববি মুরকেই ইংল্যান্ডের সর্বকালের সর্বসেরা ডিফেন্ডারের মর্যাদা দিয়েছেন। উচ্চতায় ছ' ফুট, মেদহীন টান টান চেহারা, চোখেমুখে বুদ্ধির ঝিলিক। এই হলেন ববি মুর। প্রবল বিপদের মধ্যেও তিনি ছিলেন অকুতোভয়, সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর চেয়ে যোগ্য আর কেউ ছিলেন না। একজন ডিফেন্ডারের খেলা যে এলোপাথাড়ি বল ওড়ানো বা বিপক্ষের খেলোয়াড়দের ল্যাং মারা নয়, প্রয়োজনে তিনি যে হতে পারেন সফল আক্রমণের উৎস, এই ব্যাপারটি ববি মুর '৬৬-র বিশ্বকাপে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে করে দেখান। তাঁর 'গেম রিডিং'-এর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। অন্যদের তুলনায় অন্তত কয়েক সেকেন্ড আগে বুঝতে পারতেন, বিপদটা কোনদিক থেকে আসতে পারে। প্রখর অনুমানশক্তি, নিখুঁত 'ডিসট্রিবিউশন', স্লাইডিং ও ব্লক ট্যাকল-এ পারদর্শিতা এবং সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও ঠাণ্ডা মাথায় বিপদ সামলানোর ক্ষমতা ববি মুরকে সর্বকালের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডারে পরিণত করেছে। ইতালির ফেচেত্তি, হল্যান্ডের রুডি ক্রল কিংবা আর্জেন্টিনার প্যাসারেলার সঙ্গে ববি মুরের নামটি একই নিশ্বাসে উচ্চারিত হয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ, ব্রিটিশ প্রেসের প্রবল পক্ষপাতিত্ব ববি মুরকে এমন উচ্চতায় তুলে দিয়েছে, যেখানে তিনি প্রায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এই ব্যাপারটিতেই অন্যরা পিছিয়ে।

১৯৪১ সালে পূর্ব লন্ডনের বার্কিং-এ ববি মুরের জন্ম। ১৯৫৮ সালে পেশাদার ফুটবলারের স্বীকৃতি পান ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেডে নাম লিখিয়ে। এবং '৬২ সালের মে মাসে পেরুর বিরুদ্ধে প্রথম সিনিয়ার ইংল্যান্ড দলে খেলার সুযোগ পান এবং মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই চেকোস্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে সর্বকনিষ্ঠ ইংরেজ অধিনায়কের স্বীকৃতি আদায় করে নেন।

বল ছিনিয়ে নিয়েছেন ববি মুর

যোহান ক্রুইফ

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডাচ ফুটবলের জাদুকর যোহান ক্রুইফ তাঁর যৌবনের স্বপ্ন সাধের অ্যাজাক্স আমস্টারডাম ছেড়ে স্প্যানিশ ক্লাব এফ সি বার্সিলোনায় ১০ লক্ষ ডলারের বার্ষিক চুক্তিতে সই করার পর হল্যান্ডের একটি কাগজের শিরোনাম ছিল "নাম্বার ফোর্টিন ইজ ডেড।" তার আগের তিন বছর ক্রুইফ তাঁর ঈশ্বরদত্ত অসীম ফুটবল প্রতিভার দৌলতে '৭০-'৭২ সাল পর্যন্ত অ্যাজাক্স আমস্টারডামকে পর পর তিনবার ইউরোপিয়ান ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়ান করে গোটা ইউরোপকে চমকে দিয়েছিলেন।

ক্রুইফের অতুলনীয় স্কিল, গতি ও অসীম গোলক্ষুধা সত্তর দশকের গোড়ায় অ্যাজাক্স আমস্টারডামকে শুধু হল্যান্ডের নয়, গোটা ইউরোপেই অপরাজেয় করে তুলেছিল। এবং বার্সিলোনায় সই করার কয়েক মাসের মধ্যে ক্রুইফ তাঁর নতুন ক্লাবকে নীচের সারি থেকে তুলে এনে স্প্যানিশ লিগে চ্যাম্পিয়ান করেন। যে দলে ক্রুইফ আছে, সে দলের সাফল্য অনিবার্য— এমন একটা ধারণা তামাম ইউরোপের ফুটবল-পণ্ডিতদের মনে তখন বদ্ধমূল হয়।

এবং ১৯৭৪ সালের বিশ্বকাপে দূরদর্শী ডাচ প্রশিক্ষক রিনাস মিশেল-এর প্রশিক্ষণে ক্রুইফের হল্যান্ড দলের বিধ্বংসী 'টোটাল ফুটবল' গোটা ইউরোপের ফুটবল ধারণাকে আমূল বদলে দেয়। কারও কোনও নির্দিষ্ট পজিশন নেই, দলের প্রত্যেক সদস্যই প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনও ফরোয়ার্ড, কখনও বা মিডফিল্ডার কিংবা

যোহান ক্রুইফ

ডিফেন্ডারের ভূমিকা পালন করছে— এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ক্রুইফের নেতৃত্বে হল্যান্ড '৭৪ সালের বিশ্বকাপে প্রথম করে দেখায়। অবশ্যই ক্রুইফ পাশে পেয়েছিলেন রুডি ক্রল, রেনসেনব্রিংক, যোহান নেসকিন্‌স, জনি রেপ-এর মতো অসাধারণ ফুটবলারদের। পর পর দু'বার, '৭৪ ও '৭৮ সালে, বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেও দু'বারই হোম টিমের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই চালিয়েও হল্যান্ড হেরে যায়। '৭৪ সালের বিশ্বকাপে ফাইনালে ওঠার পথে ক্রুইফের হল্যান্ড একে একে ধ্বংস করে উরুগুয়ে, বুলগারিয়া, আর্জেন্টিনা, পূর্ব জার্মানি, এমনকী ব্রাজিলকেও। অথচ ষাটের দশক পর্যন্ত ইউরোপে ডাচ ফুটবল ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়।

মাত্র ১৫ বছর বয়সে অ্যাজাক্সে যোগ দেন ক্রুইফ। প্রথম জীবনে তাঁর বাঁ পা ভাল চলত না। অ্যাজাক্সের কোচ জ্যানি ক্রুইফের বাঁ পায়ের শক্তি বাড়ানোর জন্য তাঁর পায়ে লোহা বেঁধে বিশেষ ওয়েট ট্রেনিং করান। এভাবে ক্রমশ তিনি দু' পায়ে যে কোনও অ্যাঙ্গেল থেকে গোল করার দক্ষতা অর্জন করেন। প্রচণ্ড গতিতে মাঝখান দিয়ে 'অপারেট' করতেন ক্রুইফ। '৭৪-এর বিশ্বকাপ ফাইনালে তাঁর প্রথম 'মুভ' গোটা জার্মান ডিফেন্সকে বিহ্বল করে দেয়। জার্মান পেনাল্টি বক্সের মধ্যে তাঁকে অবৈধভাবে ফেলে দেওয়া হয়। পেনাল্টি থেকে হল্যান্ডকে প্রথম গোল করে এগিয়ে দেন যোহান নেসকিন্‌স। তবু ম্যাচটি ধরে রাখতে পারেনি হল্যান্ড।

ক্রুইফ সম্পর্কে হল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক রিনাস ইজরেইল বলেছিলেন, "ওর খেলার বৈচিত্র্য এত বেশি ছিল যে, আমরা ক্রুইফের মুখোমুখি হলে খেই হারিয়ে ফেলতাম। ক্রুইফ কোন দিকে ঘুরবে, সেটা বোঝার আগেই ডিফেন্ডারটিকে সে অতিক্রম করে যেত।"

পরবর্তী জীবনে সফল ব্যবসায়ী যোহান ক্রুইফ স্প্যানিশ, ফরাসি, ইংরেজি, ডাচ সহ ইউরোপে প্রচলিত সাত-আটটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। অবসর নেওয়ার পর অ্যাজাক্স আমস্টারডামের কোচ হিসেবেও ক্রুইফের সাফল্য ঈর্ষণীয়।

লেভ ইয়াসিন

অন্যান্য খেলায় ব্যর্থ হয়ে ফুটবলে এসেছিলেন লেভ ইয়াসিন। এবং ফুটবলেও দু'-একটি পজিশনে চেষ্টা করে অসফল হওয়ার পর ক্রসবারের নীচে দাঁড়িয়ে গোলরক্ষার কাজটিই নিজের ভবিতব্য বলে মেনে নেন। ১৯৫১ সালে, মস্কো ডায়নামোর হয়ে যে ফুটবল-জীবনের শুরু, পরবর্তীকালে সেই পেশাই তাঁকে এনে দেয় বিশ্বখ্যাতি, যশ, অর্থ এবং একরাশ দুঃখ। সোভিয়েত

অবিশ্বাস্য সব গোল বাঁচিয়েছেন লেভ ইয়াসিন

ইউনিয়নের অপেশাদার ফুটবল-কাঠামোয় শুধু ফুটবল খেলেই যাঁরা জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, লেভ ইয়াসিন তাঁদের মধ্যে সম্ভবত শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, ইগর নেটো, ওলেগ ব্লোখিন, প্রোটাসভ ও বেলানভ-এর কথা মনে রেখেই এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে। বিশ্বকাপে সোভিয়েত জার্সি গায়ে লেভ ইয়াসিন একাই বিপক্ষের সামনে কঠিনতম চ্যালেঞ্জটি ছুঁড়ে দিতেন। একের বিপক্ষে এক পরিস্থিতিতে তিনি অবিশ্বাস্য বহু গোল বাঁচিয়েছেন। পিছন থেকে গোটা দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে লেভ ইয়াসিনের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশছোঁয়া। ফুটবল-জীবনে তিনি একাধিকবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান খেতাব, একবার ওলিম্পিক পদক ও ইউরোপিয়ান নেশন্‌স কাপ মেডেল জিতেছেন। ১৯৬৩ সালে তিনি ইউরোপের সেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি পান। এ ছাড়া ওই বছরেই পেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অবশিষ্ট বিশ্ব-একাদশের হয়ে গোলরক্ষার সম্মান।

১৯৬৬ সালে রাশিয়াকে তিনি বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে তোলেন। জীবনের শেষ ফেয়ারওয়েল ম্যাচটি খেলেন ১৯৭১ সালে মস্কোর লেনিন স্টেডিয়ামে। পরবর্তী জীবনে মোটর দুর্ঘটনায় লেভ ইয়াসিনের জীবনে নেমে আসে এক মর্মান্তিক ট্রাজেডি।

গর্ডন ব্যাঙ্কস

১৯৭২ সালের ২২ অক্টোবর লন্ডনের নির্জন রাস্তায় এক মোটর দুর্ঘটনায় ইংল্যান্ড ও বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক গর্ডন ব্যাঙ্কস ডানচোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন। ১৯৬৬ সালে মুষ্টিমেয় যে ক'জন ফুটবলারের ব্যক্তিগত দক্ষতায় ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ জিতেছিল, গর্ডন ব্যাঙ্কস তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। ইংল্যান্ডের হয়ে তিনি ৭৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলেছেন। দু'হাতে অন্তত আটটি গুরুতর আঘাত নিয়ে গর্ডন ব্যাঙ্কস নির্ভয়ে গোলরক্ষা করে গেছেন। এত বড় সাহসী গোলরক্ষক বিশ্ব-ফুটবলে খুব কম এসেছেন।

স্টোক সিটির চেয়ারম্যান অ্যালবার্ট একদা বলেছিলেন, "ক্লাবগুলো বৃথাই ফরোয়ার্ডদের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করে। গর্ডনের মুখোমুখি হলে পুরো টাকাটাই জলে যায়। ওর এক-একটা 'সেভ' সত্যিই অপার্থিব, অবিশ্বাস্য। একথা পেলেও বলেছিলেন। ১৯৭০ সালে মেক্সিকো বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড ও ব্রাজিলের খেলা তখন সবে ১৮ মিনিট গড়িয়েছে। রাইট উইং দিয়ে

গর্ডন ব্যাঙ্কস

জেয়ারজিনহো তীব্র গতিতে ভেতরে ঢুকে ক্রসসেন্টারে বল ভাসালেন। এর পরের অংশটুকু গর্ডন ব্যাঙ্কসের মুখেই শোনা যাক : 'জেয়ারজিনহো যখন সেন্টারটা করল, আমি তখন প্রথম পোস্টে। বেগতিক দেখে পিছোতে শুরু করলাম। আড়চোখে দেখে নিলাম, বলটা অনেক উঁচুতে এবং কারও পক্ষেই তা মাথায় পাওয়া সম্ভব নয়। হঠাৎ আমার চোখ পড়ে গেল পেলের দিকে। সে সব পারে। আর কী আশ্চর্য, স্প্রিং-এর মতো শরীরটা বাড়িয়ে পেলে হেড নিল। বল পোস্ট ঘেঁষে নীচু হয়ে গোলে ঢুকছে। আমি কোনও ঝুঁকি নিইনি। শূন্যে উড়ে গিয়ে হাতের উলটো দিক দিয়ে বলটা তুলে দিলাম ক্রসবারের উপর দিয়ে। হ্যাঁ, এটাই আমার জীবনের সেরা সেভ।'

ইউসেবিও—

ইউসেবিও ডা সিলভা ফেরেরা'র জন্ম ১৯৪২ সালের ২৫ জানুয়ারি, মোজাম্বিকে। স্বদেশ ত্যাগ করে পর্তুগালে এসে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক ইউসেবিও বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলারে পরিণত হয়েছিলেন। হয়তো ইংরেজদের চোখে ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপের হিরো ফাইনালে হ্যাটট্রিককারী জিওফ হার্স্ট। কিন্তু তামাম ফুটবল-দুনিয়া সেরা ফুটবলারের মুকুটটি সেবার পরিয়ে দিয়েছিল ইউসেবিওর মাথায়। ওই বিশ্বকাপে ৯টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পান ইউসেবিও এবং এই কৃষ্ণকায় ফুটবলারটির আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা সাময়িক ভাবে সম্রাট পেলের খ্যাতিকেও ম্লান করে দেয়।

১৯৬১ সালে পেলের ক্লাব স্যান্টোস-এর বিরুদ্ধে পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসেবে বেনফিকা নামাতে বাধ্য হয় ইউসেবিওকে। তখন তাঁকে কেউ চেনে না। কিন্তু ওই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে পেলের স্যান্টোসকে গুঁড়িয়ে দেন ইউসেবিও। এই ম্যাচটিই তাঁর ফুটবল-জীবনে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। তাঁর নতুন নাম হয় 'ইউরোপিয়ান পেলে'।

বেনফিকার হয়ে ২৫টি ম্যাচ খেলার পর মাত্র ১৯ বছর বয়সে পর্তুগালের জাতীয় দলে আর্বিভাব-লগ্নে প্রথম ম্যাচেই গোল পান ইউসেবিও। তাঁর অপ্রতিরোধ্য গতি, ডান পায়ের কামানদাগা শটগুলি ফুটবল দুনিয়ার আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৮— টানা পাঁচ বছর তিনি ছিলেন পর্তুগিজ লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা।

১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে ফুটবলে ব্রাত্য এশিয়ান রাষ্ট্র উত্তর কোরিয়া তখন ২০ মিনিটের মধ্যে ৩—০ গোলে এগিয়ে। পর্তুগালের জেতার আশা প্রায় নেই। রাজধানী লিসবনে সেই মুহূর্তে টিভি সেটগুলি ভাঙতে শুরু করেছেন ক্ষুব্ধ পর্তুগিজ সমর্থকরা। অতঃপর শুরু হল 'কালো চিতা' ইউসেবিওর অলৌকিক ফুটবল-প্রতিভার বিচ্ছুরণ। বিরতির আগেই পর পর দু'টি গোল শোধ দিলেন ইউসেবিও। বিরতির পর আরও দু'টি। অর্থাৎ একা চারটি গোল করে (এর মধ্যে দু'টি পেনাল্টি থেকে) ইউসেবিও অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ৫—৩ গোলে উত্তর কোরিয়াকে পরাজিত করে পর্তুগালকে সেমিফাইনালে তুললেন। তার আগে পেলের ব্রাজিলের বিরুদ্ধেও তিনি দু'টি গোল করেছিলেন। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইউসেবিও একটি গোল করা সত্ত্বেও নিছক দুর্ভাগ্যের জন্য পর্তুগাল বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেয় ১—২ গোলে হেরে।

গ্যারিঞ্চা

বিশ্ব-ফুটবলের অন্যতম সেরা তিন রাইট উইঙ্গারের জন্মদাতা ব্রাজিল। এর প্রথম নামটি জুলিনহো, দ্বিতীয় গ্যারিঞ্চা এবং তৃতীয় জেয়ারজিনহো। পর্তুগিজ ভাষায় গ্যারিঞ্চা শব্দের অর্থ 'ছোট্ট উড়ন্ত পাখি'। রিওর পাও গ্রান্ডে-গ্রামে গ্যারিঞ্চার জন্ম। পুরো নাম মাইকেল ফ্র্যান্সিসকো ডোম স্যান্টোস।

ইউসেবিওকে বলা হত 'ইউরোপের পেলে'

গ্যারিঞ্চা

জন্মের পর থেকেই গ্যারিঞ্চার বাঁ পা ছিল পঙ্গু। ক্রমে বাঁ পায়ে দৌড়নোর মতো শক্তি অর্জন করেছিলেন তিনি। কিন্তু বেশি ব্যবহার করতেন তাঁর অদ্বিতীয় ডান পা-টি। বাঁ-পাটি কিঞ্চিৎ বাঁকা ছিল বলে অনেকে বলেন, ওই রকম অপার্থিব 'বডি সোয়ার্ভ' তিনি করতে পারতেন।

১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপে গ্যারিঞ্চা প্রথম ব্রাজিল দলের সঙ্গে সুইডেন যান। কিন্তু প্রথম দু'টি ম্যাচে তাঁকে খেলাননি কোচ ভিনসেন্ট ফিওলা। সেবার ইংল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচ ড্র করার পর লেফ্‌ট-ব্যাক নিলটন স্যান্টোসের নেতৃত্বে একঝাঁক ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার কোচের কাছে গিয়ে আরজি জানান গ্যারিঞ্চাকে নামানোর জন্য।

গোটেনবার্গের উল্লেভি স্টেডিয়ামে ম্যাচের আগে যখন দু' দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজছে, তখন সতীর্থ নিলটন স্যান্টোস গ্যারিঞ্চার কানে কানে বলেন, "অনেক ধরাধরি করে টিমে ঢোকালাম। তুমি কিন্তু আমাদের ডুবিও না।" উত্তরে মৃদু হাসি উপহার দিয়ে গ্যারিঞ্চা বলেন, "দ্যাখ, ওই লাইনস্‌ম্যান দেখতে ঠিক চার্লি চ্যাপলিনের মতো।"

খেলা শুরু হলে দেখা গেল গ্যারিঞ্চা দুর্দমনীয়। সোভিয়েত ডিফেন্সকে ছিন্নভিন্ন করে ব্রাজিলকে তিনি ২—০ গোলে জেতালেন। এই ম্যাচে একটা অবিস্মরণীয় মুহূর্ত ছিল। পাঁচজন রুশ ফুটবলারকে গ্যারিঞ্চা বল পায়ে চরকির মতো ঘোরাচ্ছেন। আর গোটা মাঠ হাততালি দিচ্ছে। ১৯৫৮-র বিশ্বকাপ ফাইনালে সুইডেনকে প্রায় একক কৃতিত্বে ধ্বংস করেছিলেন গ্যারিঞ্চা। ব্রাজিলিয়ান দর্শকদের 'সাম্বা' নাচের মধ্যে সুইডেনকে ৫—২ গোলে ধ্বংস করে সেবার ব্রাজিল প্রথম বিশ্বকাপ জেতে।

১৯৬২ সালে চিলিতে পরবর্তী বিশ্বকাপে পেলে দু'টি ম্যাচের পর আর খেলতে পারেননি। গ্যারিঞ্চা একা দু'জনের খেলা খেলে ব্রাজিলকে পুনরায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান করেন। কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ড পরাস্ত হয় ,গ্যারিঞ্চার একক দক্ষতার কাছে।

পরবর্তী জীবনে গ্যারিঞ্চার ব্যক্তিগত ট্রাজেডি অবর্ণনীয়। বিশ্ব-ফুটবলের ট্রাজিক হিরো যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি গ্যারিঞ্চা। ১৯৬৬-র বিশ্বকাপের আগে মোটর দুর্ঘটনায় তিনি আহত হন। অবশেষে ১৯৮৩ সালে জীবনের প্রতি চরম অভিমানে, নির্বান্ধব অবস্থায় প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে গ্যারিঞ্চা তাঁর অগণিত ভক্তকে কাঁদিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। পেলের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল অভিমান। মারা যাওয়ার আগে এক সাক্ষাৎকারে গ্যারিঞ্চা বলেছিলেন, "পেলে জীবনে যা পেয়েছে, আমি তার এক-দশমাংশও পাইনি। ব্রাজিলের ফুটবলে আমার অবদান কি এতই কম?"

জার্ড মুলার

সাম্প্রতিক অতীতে পশ্চিম জার্মানির জার্ড মুলার ও ইংল্যান্ডের জিমি গ্রিভ্‌স-এর চেয়ে সফল স্ট্রাইকার-স্কোরার আন্তর্জাতিক ফুটবলে খুব কম এসেছে। দু'জনেই যেন গোলের গন্ধ পেতেন। তবে বড় আসরে সাফল্যের বিচারে জার্ড মুলারের রেকর্ড যে কোনও ফুটবলারের কাছে ঈর্ষণীয়। ৬২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৬৮টি গোল করেছিলেন জার্ড মুলার।

বেয়ার্ন মিউনিখ মূলত তাঁর গোল দেওয়ার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করেই একাধিকবার জার্মান লিগ ও কাপ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এ ছাড়া মুলার ইউরোপিয়ান কাপ জিতেছেন, ১৯৭৪ সালে বিশ্বকাপ জিতেছেন এবং ইউরোপিয়ান কাপ উইনার্স কাপ মেডেলও বেয়ার্ন মিউনিখকে এনে দিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে বিশ্বকাপ ফাইনালে হল্যান্ডের বিরুদ্ধে

মুলারের মাথায় কিংবা পায়ে বল মানেই বিপক্ষের বিপদ

জয়সূচক গোলটি করে জার্ড মুলার আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেন। যে ক্রসসেন্টার থেকে মুলার এই গোলটি করেছিলেন, তা যে কোনও স্ট্রাইকারকে ধাঁধায় ফেলতে পারে। কারণ, বলটা ড্রপ খেয়েছিল মুলারের পিছনে। কিন্তু দু'টি স্ট্রোকে বলের দখল নিয়ে অনায়াসে বল জালে পাঠিয়েছিলেন মুলার। ১৯৭০ সালে মেক্সিকো বিশ্বকাপে জার্ড মুলার ১০টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পান। '৭২ সালে তাঁর গোলেই পশ্চিম জার্মানি ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ান হয়। এই সাফল্য জার্ড মুলারকে ইউরোপের সেরা ফুটবলারের সম্মান এনে দেয়।

১৯৬৬'৬৭সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে বেয়ার্ন মিউনিখের হয়ে সেই মরসুমে ৪৭টি গোল করেন মুলার, এবং সেরা জার্মান ফুটবলার নির্বাচনে বেকেনবাওয়ারকে পরাস্ত করেন ৪১৭-৬০ ভোটে। পরের বছর আবার জেতেন 'গোল্ডেন বল', 'সিলভার ক্যানন' ও সেরা ফুটবলারের সম্মান। নিজের সাফল্যের চাবিকাঠি সম্পর্কে মুলার বলেছেন, "কেন জানি না, আমার মনে হত একটা বিশেষ জায়গায় যাওয়ার নির্দেশ আমি পেতাম মস্তিষ্কের কাছ থেকে, এমনকী যে শটটা অন্য লোক ভলি করে, আমার মস্তিষ্কের নির্দেশে আমি সেই বলটা হেড নিয়ে দেখেছি, গোল পেয়ে গেছি।"

জর্জ বেস্ট

বিশ্বের খুব কম ফুটবলার জর্জ বেস্টের মতো খ্যাতির শীর্ষে থাকার সময় সংবাদপত্রের শিরোনামে এতবার জায়গা করে নিতে পেরেছেন। ষাটের দশকে তামাম ইউরোপে জর্জ বেস্ট ছিলেন একটা 'কাল্ট ফিগার'। তিনিই প্রথম ফুটবলার, যাঁর ছিল 'পপস্টার ইমেজ'। জনপ্রিয়তায় তিনি একদা পৃথিবী বিখ্যাত 'বিট' গায়কদের সঙ্গে পাল্লা দিতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে অনিয়ম, ও চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা জর্জ বেস্টের দ্রুত পতন ডেকে আনে। অথচ আরও বহুদিন তিনি খেলতে পারতেন। তাঁর ড্রিবলিং-এর ক্ষমতা বিশ্বের যে কোনও ডিফেন্সকে তাসের ঘরের মতো ভেঙে দিতে পারত।

কিন্তু অসামান্য ফুটবল-প্রতিভা নিয়েও জর্জ বেস্ট কোনওদিন বিশ্বকাপ-ফুটবলে খেলতে পারেননি। কারণ, তাঁর ফুটবল জীবনে উত্তর আয়ারল্যান্ড বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেলে, অনেকেরই ধারণা

জর্জ বেস্টের ড্রিবলিং ছিল দেখার মতো

জর্জ বেস্ট জনপ্রিয়তা ও খ্যাতিতে সম্রাট পেলের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতেন। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে জর্জ বেস্ট এফ এ কাপ, ইউরোপিয়ান কাপ সহ ইউরোপের প্রধান ক্লাব টুর্নামেন্টগুলি জিতেছিলেন। এ ছাড়া ব্রিটেন ও ইউরোপের বর্ষসেরা ফুটবলারের সম্মানও তিনি পেয়েছিলেন।

খ্যাতির মধ্যগগনে জর্জ বেস্ট ছিলেন ইউরোপের সেরা 'ক্রাউড পুলার'। মাঝমাঠ থেকে বল টেনে একা গোল করে তিনি দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন।

পাওলো রোসি

একটা সময় ছিল, যখন পাওলো রোসিকে বলা হত 'ড্রিবলিং ম্যানিয়াক'। পায়ে বল

রোসি'কে আটকানো ছিল কঠিন

পড়লে কিছুতেই ছাড়তে চাইতেন না রোসি। বল অত্যধিক দখলে রাখার প্রবণতা ফুটবল-জীবনের গোড়াতেই রোসির পায়ের কার্টিলেজ ছিঁড়ে দেয়। বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের লাথিতে রোসির এই ছেঁড়া কার্টিলেজ অপারেশন করে বাদ দিতে হয়। কোচ ফাবরির হাতে পড়ে রোসি নিজেকে তৈরি করেন আধুনিক ফুটবলের সেরা স্কোরার-স্ট্রাইকার হিসেবে।

ফুটবল-জীবনের প্রাথমিক পর্বে তুরিন-এর ধনী ক্লাব জুভেন্টাস রোসিকে নিয়ে প্রায় ফুটবল খেলেছিল। তারা প্রথমে এই নবীন প্রতিভাটিকে সই করিয়ে বসিয়ে রাখে। তারপর কোমো, ভিসেন্জা, লেনরোসি প্রভৃতি বিভিন্ন ডিভিশনের ক্লাবকে ধার দেয়। এভাবে বিস্তর টানাপোড়েনের পর ২২ বছরের রোসিকে অবশেষে জুভেন্টাস কর্তৃপক্ষ ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেন। এটাকে বলা যায়, রোসির ফুটবল-জীবনের শিক্ষণ-পর্ব। কিন্তু পুরনো ক্লাব ভিসেন্জা রোসিকে ছাড়তে নারাজ হয়। রোসির ওপর তাদেরও অর্ধেক দাবি। ফলে রোসিকে নিলামে তোলা হয়। মুখবন্ধ খামে রোসির বাজার-দর লিখে দু'পক্ষ তাদের দাবি পেশ করে। খাম খুললে দেখা যায়, ধনী জুভেন্টাসকে পরাস্ত করে ভিসেন্জা ১৫ লক্ষ পাউন্ড দাম হেঁকে রোসিকে কিনে নিল। এবং আর্জেন্টিনার একটি ক্লাবকে বেচে দিল ৩০ লক্ষ পাউন্ডের বিনিময়ে। ফলে বড় কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলার আগেই রোসি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলার হয়ে যান। ব্যাপারটা জাতীয় নির্বাচকদের টনক নড়িয়ে দেয় এবং অচিরেই রোসি ১৯৭৮-এর বিশ্বকাপে জাতীয় দলে ডাক পান। সেবার আর্জেন্টিনায় রুপোলি চুলের রবার্টো বেটেগা এবং পাওলো রোসি বিশ্বকাপ মাতিয়ে দেন। বিশেষজ্ঞরা সেরা আক্রমণাত্মক জুড়ি হিসেবে চিহ্নিত করেন রোসি ও বেটেগাকে। ফাঁকা জায়গা কাজে লাগাতে জানতেন রোসি এবং তিনি যেন গোলের গন্ধ পেতেন। অরক্ষিত অবস্থায় নিজেকে রেখে কীভাবে মোক্ষম আঘাত হানতে হয়, তিনি তা ১৯৮২-র বিশ্বকাপে বারবার দেখিয়ে দিয়েছেন।

জিকো

পেলে, গ্যারিঞ্চা, টোস্টাও, জেয়ারজিনহোর পর ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে যে তারকার অভ্যুদয়ে ফুটবল-বিশ্ব চমকে যায়, তাঁর নাম জিকো। ১৯৭৮, '৮২ ও '৮৬— মোট তিনটি বিশ্বকাপে জিকো ব্রাজিলের জার্সি গায়ে খেলেছিলেন। স্পেনে ১৯৮২-র

বিশ্বকাপ শুরুর অনেক আগে থেকেই জিকো বিভিন্ন বিদেশী পত্রিকায় 'নতুন সম্রাট' আখ্যা পেতে থাকেন। স্পেনে তাঁর অতুলনীয় ফুটবল-প্রতিভার দীপ্তিতে গোটা ফুটবল দুনিয়া বিমোহিত হয়। সেবার ব্রাজিলের কাছে ৪—০ গোলে হারার পর হতমান নিউজিল্যান্ডের কোচ জিকো ও ব্রাজিল দল সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "ওকে আটকানো অসম্ভব। জিকোর নেতৃত্বে ব্রাজিল একুশ শতাব্দীর ফুটবল খেলছে।"

১৯৮২-র বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে জিকোর অবিস্মরণীয় গোলটির যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁরা যথার্থই ভাগ্যবান। পর পর তিনটি ম্যাচে স্কটল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে জিকো ছিলেন দক্ষতার শীর্ষে। জিকো, ফ্যালকাও ও সক্রেটিসকে নিয়ে গড়া ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ড ছিল '৮২-র বিশ্বকাপের সেরা।

১৯৮২-র বিশ্বকাপের পরেই জিকো ইতালিয়ান ক্লাব উদেনিসেতে রেকর্ড পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে সই করেন। কিন্তু ওই ক্লাবে তাঁর সমতুল্য কেউ না থাকায় প্রতি ম্যাচেই দলকে জেতানোর গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে চাপে। এ ছাড়া বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের সর্বদাই টার্গেট ছিল জিকোর দু'টি পা। ফলে জিকো মারাত্মক আঘাত নিয়ে ইতালি ছাড়েন। এ-ব্যাপারে জিকোর খেদোক্তি, "আমি ব্রাজিল ছেড়ে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটি করেছি। ইতালিতে খেলতে আসা আমার উচিত হয়নি।"

জিকো পুনরায় ফিরে আসেন তাঁর পুরনো ক্লাব ফ্লেমেঙ্গোয়। কিন্তু চোট-আঘাতের দরুন ব্যাহত হয় তাঁর ফুটবল-জীবন। তবু জাতীয় কোচ টেলি সান্তানা '৮৬-র বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জিকোকে দলে রাখেন। গত মেক্সিকো বিশ্বকাপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জিকো পেনাল্টিতে গোল করতে না পারায় ব্রাজিলের কপাল পোড়ে।

১৯৫৩ সালের ৩ মার্চ জিকোর জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর স্বপ্ন ছিল 'কমপ্লিট ফুটবলার' হওয়ার। তা তিনি পরবর্তী জীবনে হয়েছিলেন। তাঁর ভক্তরা বলে থাকেন, জিকোর একটা ফ্রি-কিক দেখার জন্য হাজার মাইল পথ হাঁটা যায়।

মিশেল প্লাতিনি

আশির দশকে ইউরোপিয়ান ফুটবলে মুকুটহীন সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন মিশেল প্লাতিনি। গত বছর জীবনের ৩১টি বসন্ত অতিক্রম করার পর তিনি ফুটবল মাঠকে বিদায় জানান। তাঁর শূন্যস্থান অপূরণীয়। প্লাতিনির সময়েই ফরাসি ফুটবলের স্বর্ণযুগ কায়েম হয়। মোট তিনবার— ১৯৭৮, '৮২ ও '৮৬ সালের বিশ্বকাপে খেলেছেন তিনি। এর মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় অবশ্যই এস্পানা-'৮২। সেবার ফ্রান্স বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে ৩—১ গোলে এগিয়ে গিয়েও অতিরিক্ত সময়ে রুমেনিগের নৈপুণ্যের কাছে হেরে যায়। ফরাসি নির্যাসের মতোই ফরাসি ফুটবলের সৌরভ সেবার ফুটবল-দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। প্লাতিনির ফ্রান্সকে বলা হয় ইউরোপের 'ব্রাজিল'। অসাধারণ 'ফাইন টাচ' ফুটবল খেলে সেবার ফুটবল-রসিকদের মন জয় করে নেন প্লাতিনি। পেলে তাঁকে বলেছেন, "আশির দশকে বিশ্বের সেরা কমপ্লিট ফুটবলার।"

মস্তিষ্ক দিয়ে ফুটবল খেলতেন প্লাতিনি। কখনও প্রয়োজনের বেশি এক মুহূর্তও পায়ে বল রাখতেন না। বল ধরা ও ছাড়ার এই নিখুঁত সময়জ্ঞান বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের ধাঁধায় ফেলত। বেশি ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিতে কখনওই তিনি যেতেন না। প্রথম দর্শনে তাঁকে কিঞ্চিৎ 'বাবু প্লেয়ার' বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু তাঁর একটা দুটো টাচে বা ফাইনাল থ্রুতে বিপক্ষের রক্ষণব্যবস্থা ভেঙে পড়ত।

টিগানা, গিরেস ও ফার্নান্ডেজের সঙ্গে প্লাতিনির মাঝমাঠে অপ্রতিরোধ্য উপস্থিতি দুনিয়ার সেরা দলগুলির বুকেও কাঁপন ধরিয়ে দিত। তাঁর গোল করার অন্যতম প্রধান অস্ত্র ছিল পেনাল্টি বক্সের আশপাশে ২০ গজের মধ্যে পাওয়া ডাইরেক্ট ফ্রিকিকগুলি। এই ধরনের ফ্রিকিক থেকে অসংখ্য গোল করেছেন প্লাতিনি।

বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান হওয়ার তীব্র সুখ প্লাতিনি জীবনে অনুভব করতে পারেননি। কিন্তু প্রায় একক কৃতিত্বে ১৯৮৪ সালের ইউরোপিয়ান কাপে তিনি ফ্রান্সকে চ্যাম্পিয়ান করেন। সেবার ফ্রান্সের মোট ১৪টি গোলের মধ্যে প্লাতিনি নিজে করেছিলেন ৯টি গোল। তবে ১৯৮৫ সালে জুভেন্টাসকে প্রথমে ইতালিয়ান লিগ চ্যাম্পিয়ান ও পরে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান করে প্লাতিনি বিশ্বজয়ী হওয়ার স্বাদ কিছুটা আস্বাদন করতে পেরেছিলেন এবং নিজে না খেললেও তাঁর সময়েই ১৯৮৪-র লস অ্যাঞ্জেলিস ওলিম্পিকে ফ্রান্স ওলিম্পিক ফুটবল চ্যাম্পিয়ান হয়।

জিকো খেলেছেন একুশ শতাব্দীর ফুটবল

১৯৮৬ সালে মেক্সিকোয় জীবনের শেষ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে পেনাল্টির সুযোগ অপচয় করার পর থেকেই প্লাতিনির আত্মবিশ্বাস নষ্ট হতে থাকে। শেষদিকে তিনি আর পেনাল্টি মারতে চাইতেন না। নিজের অবসরের প্রাক্কালে প্লাতিনি মন্তব্য করেছিলেন, "কারও গলগ্রহ হয়ে নয়, আমি মাথা উঁচু করেই ফুটবল ছাড়ব।"

নিজের প্রতিশ্রুতি তিনি রেখেছেন। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে এফ এ সেন্টিনারি ম্যাচে প্লাতিনির পাশে ম্লান হয়ে যান স্বয়ং মারাদোনাও। মারাদোনাকে সেদিন ইংরেজ দর্শকরা বিদ্রূপ করলেও, প্লাতিনিকে তারা মাথায় তুলে নেচেছিল।

দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা

১৯৮৬-র মেক্সিকো বিশ্বকাপকে বলা হয় 'মারাদোনার বিশ্বকাপ'। একটি বিশ্বকাপে একক আধিপত্যের এমন বিস্ময়কর নজির সম্ভবত আর দ্বিতীয়টি নেই। ইংল্যান্ড ও বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে প্রায় মাঝমাঠ থেকে বল টেনে মারাদোনা যে দু'টি অনবদ্য গোল করেছিলেন, তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। ১৯৮৬-র বিশ্বকাপের পর মারাদোনাকে কেউ কেউ পেলের সঙ্গে এক আসনে বসিয়ে দেন। কিন্তু এই তুলনাটা মারাদোনার পছন্দ হয়নি। তিনি স্পষ্ট বলে দেন, "দোহাই, ওঁর সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না। পেলের প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি ফুটবলের সম্রাট, আর আমি হলাম স্রেফ মারাদোনা।"

মারাদোনার ফুটবল-দর্শন তাঁর নিজের মুখে শোনাই ভাল। এক বছর আগে এক ঘরোয়া সাক্ষাৎকারে মারাদোনা বলেছিলেন, "গরিব ঘরে আমার জন্ম। খ্যাতি, অর্থ, ভালবাসা —জীবনে যা কিছু পেয়েছি, সবই এই ফুটবল থেকে। ফুটবলই আমার একমাত্র জীবিকা। আমার জীবনে ফুটবলই রক্ত, ফুটবলই কর্ম এবং এই ফুটবলই আমার ধ্যানজ্ঞান। ফুটবল ছাড়া আমি বেঁচে থাকতে পারব না। ছেলেবেলায় যখন স্কুলে খেলতাম, তখন 'নেগ্রো' নামের এক স্পটার আমাকে প্রথম আবিষ্কার করেন। তখন আমার বয়স মাত্র ১০ বছর। পরে জেনেছি, আমার জীবনে সেই গডফাদারটির আসল নাম মারিও ওরেনা।"

১৯৭৯ সালে মেনোত্তি'র প্রশিক্ষণে এবং মারাদোনার নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা যুব বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান হয়। আর্জেন্টিনার ঐতিহ্যশালী ক্লাব বোকা জুনিয়ার্স মারাদোনাকে ১৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কিনে নেয়। প্রায় একক দক্ষতায় ১৯৮১ সালে জাতীয় লিগে বোকা জুনিয়ারসকে চ্যাম্পিয়ান করেন মারাদোনা, এবং তার পরের বছর ১৯৮২ সালে স্পেনের বিশ্বকাপে বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের ট্যাকলে জর্জরিত হয়ে ফুটবল নামক খেলাটি মারাদোনার কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায়।

অবশ্য অচিরেই স্পেন বিশ্বকাপের হতাশা ও ব্যর্থতার মেঘ চিরে এক নতুন মারাদোনা আর্বিভূত হন। স্পেন বিশ্বকাপের তিক্ত অভিজ্ঞতা মারাদোনাকে নতুনভাবে নিজেকে গড়ে তোলায় অনুপ্রাণিত করে। অসাধারণ উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী মারাদোনা রপ্ত করেন, বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের নাগাল এড়িয়ে কীভাবে বল 'শিল্ড' করতে হয়। এই নতুন কৌশলটি মারাদোনাকে প্রায় অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। ৪৫ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে মারাদোনাকে কিনে নেয় স্পেনের বার্সিলোনা এফ সি। কিন্তু স্প্যানিশ লিগের কঠিন ধকল, জটিল অসুখ ও পরে পায়ের আঘাত মারাদোনাকে সাময়িকভাবে ঘায়েল করে দেয়। নতুন আলোর খোঁজে অতৃপ্ত মারাদোনা পাড়ি জমান ইতালিতে।

প্রথম বছর যোগ দিয়েই ইতালিয়ান লিগে তিনি নেপোলিকে চ্যাম্পিয়ান করেন। ইতালিতে মারাদোনা একজন যথার্থই 'কাল্ট ফিগার'। নেপোলিতে তিনি যোগ দেওয়ার পর থেকে ক্লাবের 'রেভিনিউ' বেড়েছে অন্তত ১০ গুণ। প্রদর্শনী ম্যাচ পিছু তিনি দাবি করেন তিন লক্ষ ডলার। তাঁর জন্য আলাদা বিমানের ব্যবস্থা করতে হয়। সঙ্গে যায় হাফ-ডজন সেক্রেটারি নিয়ে নিজস্ব দেহরক্ষী ও মারাদোনার পরিবারের সদস্যরা। মারাদোনার পরিবার বলতে বোঝায় বাবা মা, ও সাত ভাই-বোন। ছোট ভাই হুগো মারাদোনাও এখন দারুণ প্রতিভাবান ফুটবলার। বাবা মাকে ছেড়ে মারাদোনা কখনও দু' সপ্তাহের বেশি এক জায়গায় থাকতে পারেন না। মারাদোনা রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনে ইউনিসেফের অন্যতম 'অ্যাম্বাসাডর' হিসেবেও মাঝে-মধ্যে কাজ করেন। অবসর নেওয়ার পর মারাদোনার ইচ্ছা, তিনি খুদে প্রতিভাদের ফুটবল খেলাবেন। তবে আপাতত মারাদোনা তাকিয়ে আছেন ১৯৯০ সালে রোমে পরবর্তী বিশ্বকাপের দিকে। তখন তাঁর বয়স হবে ২৯ বছর। জীবনের তৃতীয় ও শেষ বিশ্বকাপটিকে মারাদোনা কি পারবেন মেক্সিকোর মতো আলোকিত করে তুলতে?

প্লাতিনি এনেছিলেন ফরাসি ফুটবলের স্বর্ণযুগ

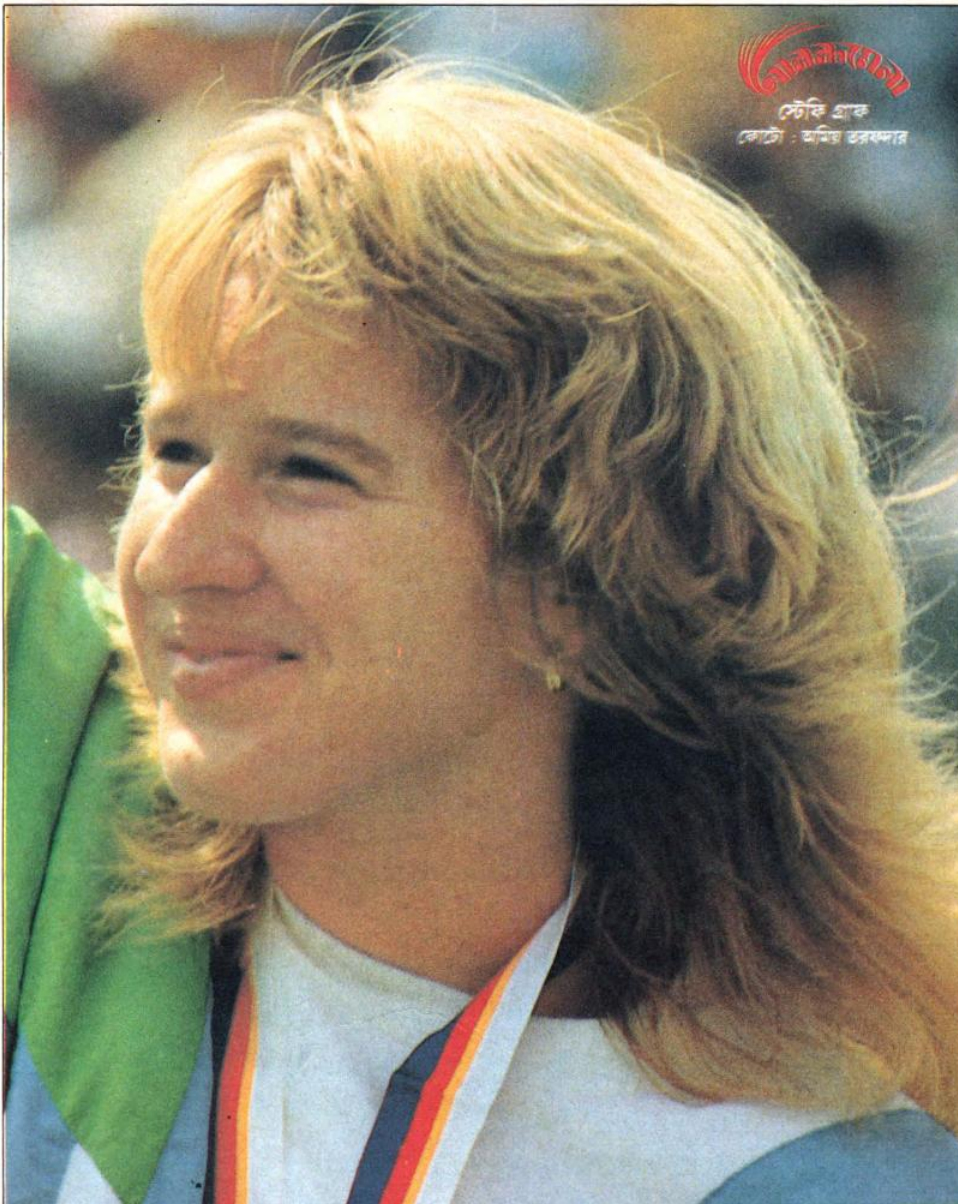
স্টেফি গ্রাফ
ফোটো : অমিয় তরফদার

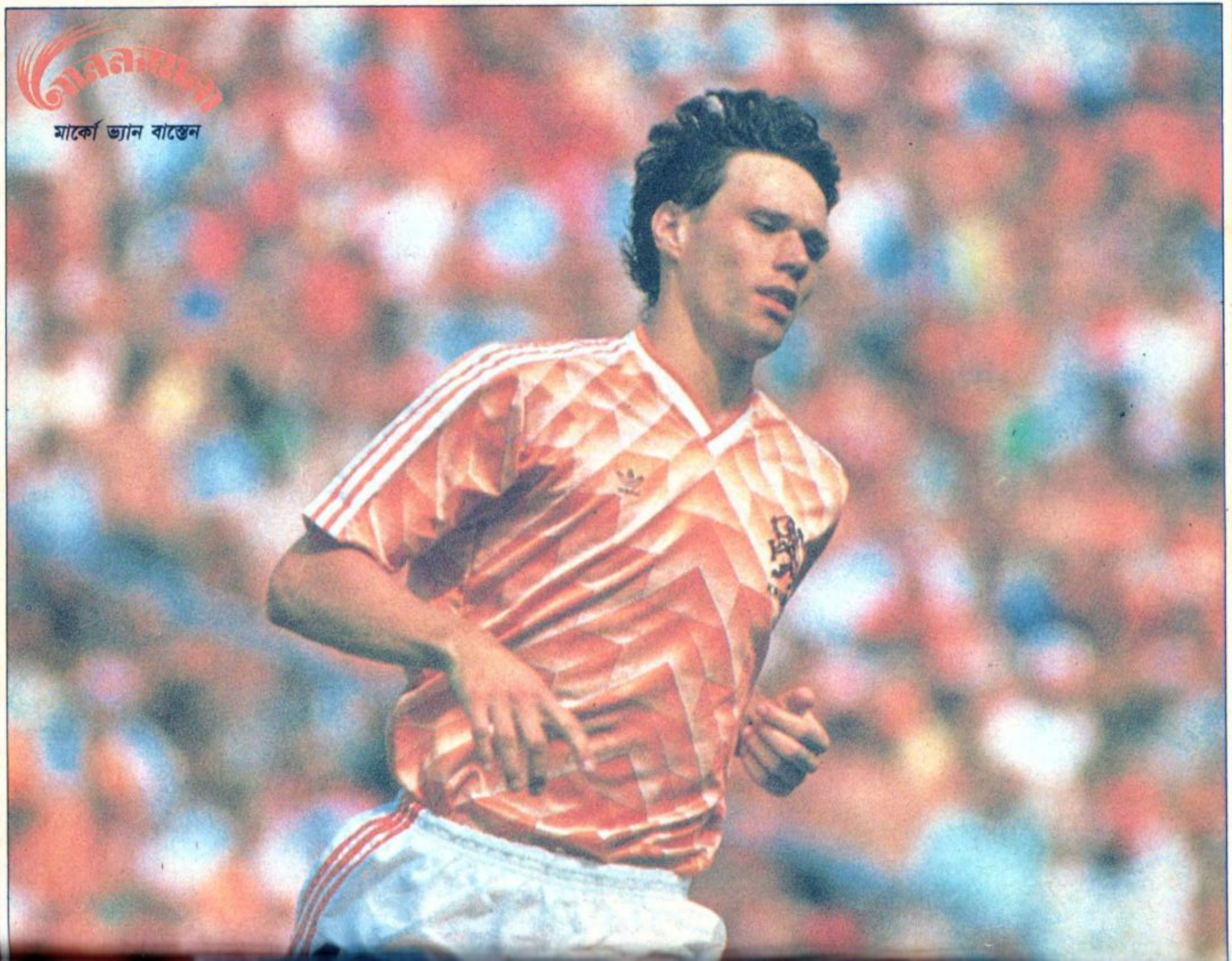
মার্কো ভ্যান বাস্তেন

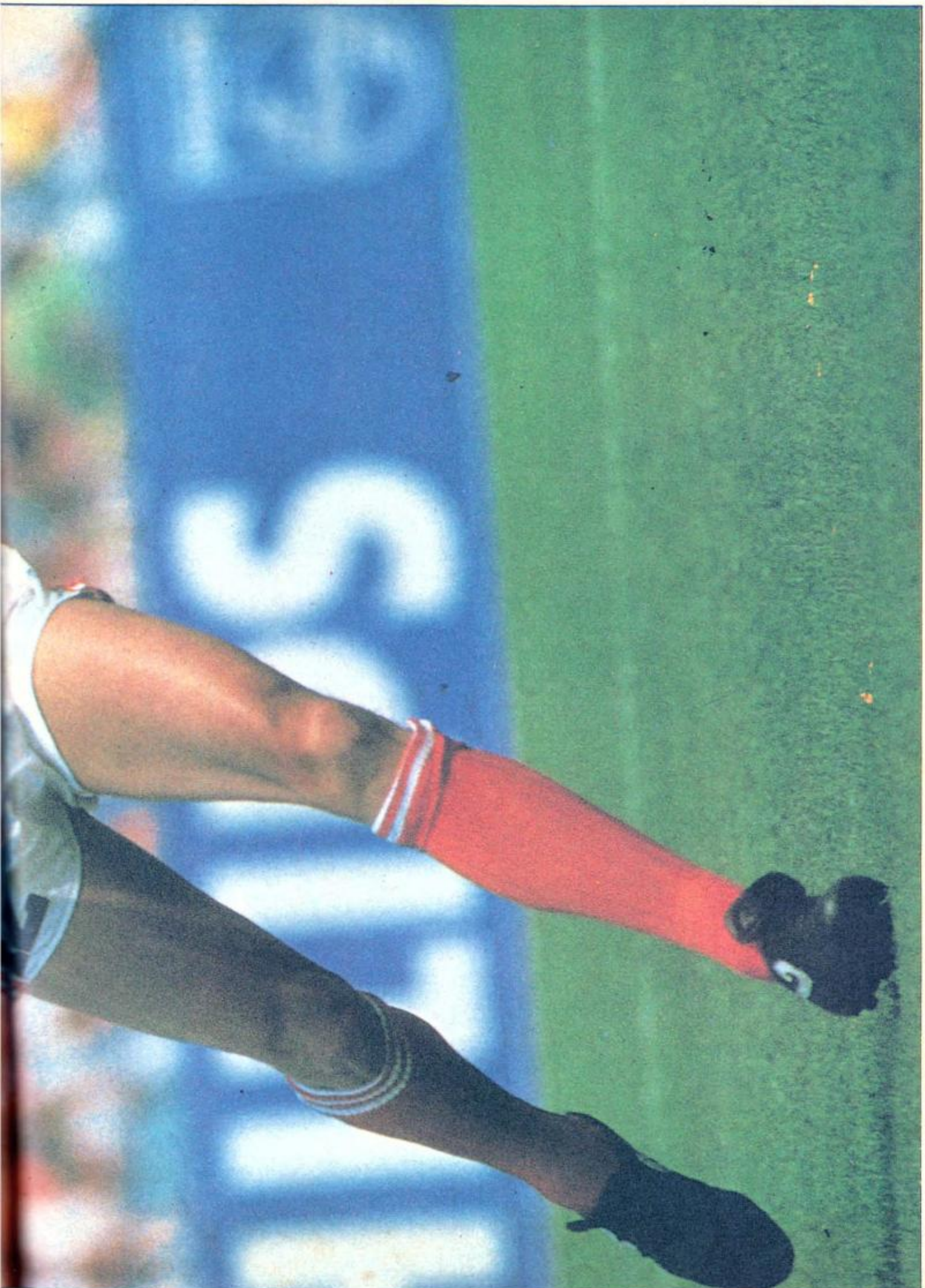

রুড গুলিট

গৌতম সরকার

মাঝমাঠের লড়াই

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার মতো সাধারণ খেলোয়াড় সেদিন পেয়েছিল বিশ্ববন্দিত পেলের স্বীকৃতি। আনন্দে মনে মনে কাঁদছিলাম, আর ভাবছিলাম বহুদিন আগে মায়ের বলা একটা কথা। তখন কতই বা বয়স আমার। আসানসোল থেকে বাবা বদলি হয়ে এসেছেন কলকাতায়। আমার জন্ম অবশ্য আসানসোলেই। থাকি বরানগরের নৈনানপাড়ায়, পড়ি বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে। সেভেন কি এইটে। ফুটবল খেলার নেশা সেই তখন থেকেই আমার মন ও শরীরকে গ্রাস করতে শুরু করেছে।

আমাদের পাড়ায় সে-সময় কিছু লোক ছিল, যারা আমাকে ভাল চোখে দেখত না। তাদেরই একটি ছেলে আমার স্কুলেই পড়ত, তবে আমার চেয়ে ছিল সিনিয়ার। আসল নাম ইচ্ছে করে লিখছি না, ধরা যাক, শ্যামল। ভাল ফুটবলও খেলত। ইতিমধ্যে আমিও নানা জায়গায় ফুটবল খেলে বেড়াচ্ছি, নামও হচ্ছে, কিছু-কিছু পুরস্কারও পাচ্ছি। সেবার একটা ঘটনা ঘটল। খেলে বাড়ি ফিরছি। ওই দলেরই একজন, ধরা যাক তাঁর নাম সুব্রতদা, আমাকে ডেকে বললেন, "তুই খেলে কী করবি ? এ-পাড়ায় খেলে একজনই নাম করবে, সে শ্যামল। তুই ওর ধারে-কাছেও যেতে পারবি না। খেলা ছেড়ে দে।" ছেলেবেলায়, ওই বয়সে, কথাটা শুনে খুব আঘাত পেয়েছিলাম। আমার স্বপ্ন যে ফুটবলকে নিয়েই। আর আমি ফুটবল ছেড়ে দেব ? বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে কেঁদে ফেলেছিলাম। সব শুনে মা বলেছিলেন, "তুই এটুকুতেই ভেঙে পড়লি কুট্টি ? এ তো ছোট্ট আঘাত। তা হলে বড় খেলায় মাঠে মার খেলে তুই কী করবি ? শোন, শুধু শ্যামল নয়, অনেকের চেয়েই তোকে ভাল খেলতে হবে। সেটাই হবে তোর যোগ্য জবাব।"

মায়ের ওই কথায় সব দুঃখ, অপমান ভুলে গিয়েছিলাম। মনের মধ্যে জেগে উঠতে লাগল জেদ, আমি মায়ের কথা রাখবই, দেখাব সত্যিই ফুটবলকে আমি কতখানি ভালবাসি।

এখানে আমি আমার মায়ের কথা একটু বলে নিতে চাই। আমার বাবা মাখনরঞ্জন সরকার ছিলেন একজন ভাল ফুটবলার। ঢাকা ইউনিভার্সিটির হয়ে খেলেওছেন। খেলা ভালবাসতেন। কিন্তু ছেলেবেলায় আমার শুধু খেলা-খেলাভাব দেখে এত রেগে যেতেন যে, তা বলবার নয়। আমরা তিন ভাই, তিন বোন। আমি তৃতীয়। প্রথমে দাদা, তারপর দিদি, তারপর আমি। আমাদের ভাই-বোনদের একটু ভাল রাখার জন্য তিনি প্রবল পরিশ্রম করতেন। সকালে, রাত্রে অফিসের আগে ও পরে ছ-সাতটা টিউশনি করতেন। বাবার ইচ্ছে ছিল, আমরা মন দিয়ে লেখাপড়াও করি। এইজন্য নিজে ফুটবলার হয়েও বাবা যে আমার কত বল রাগের চোটে কেটে ফেলেছেন তার ঠিক নেই।

মা সব-কিছু বুঝেও খেলার ব্যাপারে কিন্তু আমাকে প্রশ্রয়ই দিতেন। একদিনের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। কাছাকাছি কোথাও একটা টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা সেদিন। আমি খেলব সব ঠিকঠাক। বাবার অফিস, টিউশনি করে ফিরতে বেশ রাত হবে। সুতরাং আমার কোনও চিন্তা নেই। মাকে বলে বেরিয়ে পড়লেই হল। কিন্তু হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত। বাবা অফিস গেলেন না। শরীরটা ভাল ছিল না। আমি প্রমাদ গুনলাম। বাবা নিশ্চয়ই আমাকে পড়াতে বসাবেন। যথারীতি হলও তাই। খাওয়াদাওয়ার পর বাবার ঘরে আমার ডাক পড়ল। শুরু হল অঙ্ক দিয়ে, কয়েকটা ঝটপট করেও ফেললাম। এদিকে ঘড়িতে দুটো বাজতে চলল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, আমি যে ক্লাবের হয়ে খেলব, সেই ক্লাবের এক কর্মকর্তা বাসুদা এসে হাজির। মা বাইরে বেরিয়ে তাঁর সঙ্গে কী কথা বলছেন। আমি আর থাকতে পারলাম না। একটু পরে বাথরুমে যাওয়ার নাম করে বাবার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এক দৌড়ে এসে হাজির হলাম ভেতরের ঘরে মায়ের কাছে। মাকে বললাম, "মা, আমি খেলতে যেতে পারব না ?" মা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বললেন, "কী করে যাবি, বাবা তোকে এখন পড়াচ্ছেন না ?" কথাটা শুনে প্রচণ্ড রাগ হল। কিছু না বলে এসে আবার অঙ্ক কষতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর জানালা দিয়ে চোখ যেতেই লক্ষ করলাম, বাসুদা সামনের বাড়ির রকে তখনও বসে আছেন। কী ব্যাপার। মা তো বাসুদাকে বলেই দিয়েছেন যে, আমি যেতে পারব না। সাড়ে তিনটে তো বাজে ঘড়িতে, চারটেয় খেলা শুরু। আমার জন্য বসে লাভ কী ! একটু পরেই পড়ার ঘরে মা এলেন। বাবাকে বললেন,"কুট্টি অনেক্ষণ পড়েছে, এখন ছেড়ে দাও। আমি ওকে একটু কাজে পাঠাব।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবা আমাকে তখনকার মতো রেহাই দিলেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি মায়ের দিকে। ভেতরের ঘরে আমায় টেনে নিয়ে এসে মা আস্তে করে বললেন, "তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। জামা, প্যান্ট, জুতো নিয়ে নে। তোর জন্য বাসু অপেক্ষা করছে।" ওঁর কথা শুনে আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। একছুটে তৎক্ষণাৎ রাস্তায়। বাসুদা আমায় দেখেই লাফিয়ে উঠলেন, "গৌতম, তখন থেকে তোর জন্যই বসে আছি। তুই না খেললে আজ কিছুতেই জিততে পারব না। আমার প্রেস্টিজ একেবারে চলে যাবে। শিগগির চল।" আমি অবাক হয়ে বললাম, "আমার জন্য তুমি বসে ছিলে কেন, মা তোমায় বলেননি আমি যেতে পারব না ?" বাসুদা বললেন, "সে কী রে ! মাসিমাই তো আমায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললেন। তোর বাবার ভয়ে আমি তো চলেই যাচ্ছিলাম। মাসিমাই আমায় বললেন, গৌতম যাবে, খেলবেই।"

ইস ! তখন কেন যে মায়ের ওপর রাগ করেছিলাম। কী বুদ্ধি করে মা আমায় খেলতে পাঠালেন। কী ভাল আমার মা (সবার মা-ও অবশ্য ভাল)। মাকে ভুল বোঝার জন্য কষ্ট হতে লাগল। আর সেই কষ্টই যেন জেদ হয়ে ঝরে পড়তে লাগল মাঠে। (ক্রমশ)

অনুলিখন : তানাজি সেনগুপ্ত

হাতের আঙুলের জোর বাড়াতে হবে

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

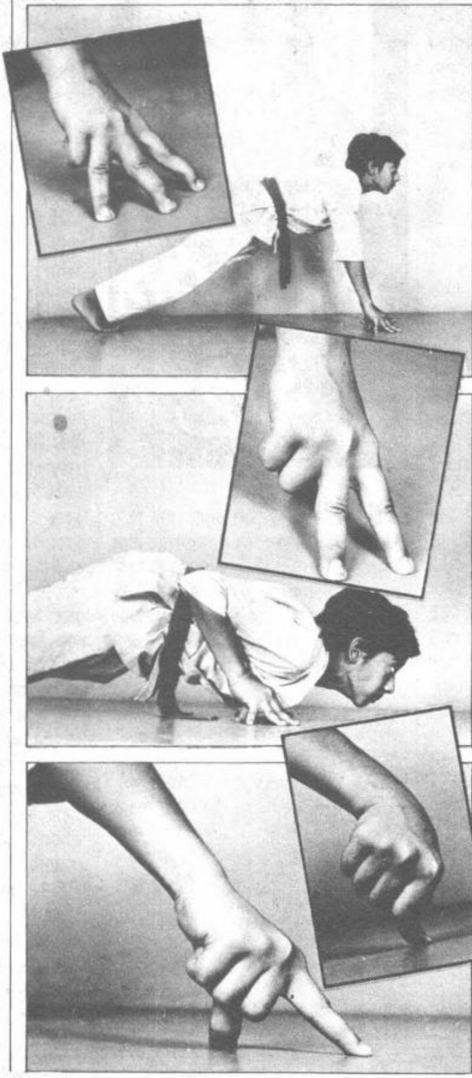

আগের সংখ্যায় আমি হাতের আঙুলের জোর বাড়ানোর ব্যায়াম নিয়ে আলোচনা করেছি। এবারও হাতের আঙুলের জোর বাড়ানোর ব্যায়াম নিয়ে আলোচনা করছি। হাতের আঙুলের জোর সম্বন্ধে কিওকুশিন ক্যারাটের স্রষ্টা শ্রদ্ধেয় গ্র্যান্ড মাস্টার মাসুতাত্সু ওইয়ামা বলেন, 'যদি কোনও ব্যক্তির শরীরের ওজন ৮০ কিলোগ্রামের বেশি হয় এবং তিনি যদি দু' হাতে যে কোনও দুটো + দুটো অর্থাৎ মোট চারটে আঙুলের ওপর ভর দিয়ে হ্যান্ড স্ট্যান্ড (পা ওপরে) করে পাঁচ থেকে ছ' মিনিট থাকতে পারেন বা ওই চার আঙুলের ওপর ভর দিয়ে হাঁটতে পারেন তবে অভ্যাস করলে এক ঘুসিতে ষাঁড়ের মাথার খুলি পর্যন্ত ফাটিয়ে দিতে পারেন। শ্রদ্ধেয় ওইয়ামার এই কথাগুলি কতখানি সত্যি তাঁর প্রমাণ তিনি নিজেই। তাঁর যুবা বয়সে তিনি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট ৫২টি ষাঁড়ের সঙ্গে খালি হাতে লড়াই করেছেন, এবং প্রায় সবক'টি ক্ষেত্রে তিনি ষাঁড়ের শিং ভেঙে দিয়েছেন এবং ঘুসি মেরে মাথার খুলি ফাটিয়ে দিয়েছেন। এবং যোদ্ধা ষাঁড়গুলোর প্রায় তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর আঙুলের জোর সম্বন্ধে আর-একটি কথা বলছি। তিনি একটি ১০০ জাপানি ইয়েন (পয়সা)—যেটা আমাদের দেশে একটা ২৫ পয়সার মতো—সেটা হাতের বুড়ো আঙুল এবং তর্জনীর সাহায্যে খাড়াখাড়িভাবে ধরে আঙুলের চাপ দিয়ে ওই পয়সাকে দুমড়ে দিতেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর আঙুলে কী অসম্ভব জোর ছিল। আরও বোঝা যায়, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, মনোনিবেশ, একাগ্রতা ও সর্বোপরি প্রতিদিনের অভ্যাসে মানুষ কোথায় পৌঁছতে পারেন! এবার আমি আঙুলের ব্যায়াম নিয়ে আলোচনা করছি। আগের সংখ্যায় যে ব্যায়াম করতে বলেছিলাম সেটা ভালভাবে রপ্ত করে আঙুলের বেশ কিছুটা জোর বাড়িয়ে নিয়ে নিজের ওপর আস্থা অর্জন করে এবারের ব্যায়াম করা যেতে পারে।

প্রথমে দু'টো হাঁটু মাটিতে রাখতে হবে এবং পা দুটো পেছনে ছড়িয়ে দিতে হবে। এবার দু' হাতের পাঁচটা +পাঁচটা, অর্থাৎ, সবক'টা আঙুল ঠিকভাবে মাটিতে রাখতে হবে। হাতের মধ্যে নিজের বুক যতটা চওড়া ততটাই ফাঁক থাকবে। শরীরের ওজন হাতের দশটা আঙুল এবং পায়ের ওপর থাকবে। এবার শরীরের উপরিভাগ ও কোমরের অংশ মাটির দিকে নামবে, কিন্তু মাটিতে শরীরের কোনও অংশ, যেমন, বুক, পেট, হাঁটু কখনওই মাটি স্পর্শ করবে না। এবার সম্পূর্ণ নীচে নামা হয়ে গেলে আবার ওপরে উঠে আসতে হবে ব্যায়াম শুরুর অবস্থার মতো। এভাবে যে ক'বার ঠিকভাবে পারা যায়, খেয়াল রাখতে হবে যেন আঙুল বা হাতের কবজি মচকে না যায়। নীচে নামার সময় হাতের কনুই থেকে মুড়তে হবে শরীরের দু'পাশে, কনুই কখনওই বাইরের দিকে মুড়বে না। এভাবে আস্তে-আস্তে অভ্যাস করতে হবে। ব্যাপারটা কঠিন, কিন্তু ঠিকমতো মনের জোর নিয়ে চেষ্টা করে যেতে হবে। কিছুদিন ভালভাবে অভ্যাস করার পর তারপর প্রতি হাতের কনিষ্ঠ মুড়ে চার + চার, অর্থাৎ, মোট আট আঙুলের ওপর অভ্যাস করতে হবে। এইভাবে আস্তে আস্তে প্রতি হাতের আর একটি করে আঙুল মুড়ে তিন + তিন, অর্থাৎ, ছয়, তারপর দুই + দুই, অর্থাৎ, চার, তারপর এক + এক, অর্থাৎ, দুই আঙুলের ওপর শরীরের ওজন রেখে এই ব্যায়াম অভ্যাস করতে হবে। সব ব্যাপারটাই অতি সতর্কতার সঙ্গে অনুশীলন করা উচিত।

ফোটো : উৎপল সরকার

ধারাবাহিক উপন্যাস

ঝিঁঝির খই লাল বাতাসা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

"দু' পাশে পাহাড়, পাথর কেটে রাস্তা উঁচুতে উঠে গেছে। তারপর আবার নেমে গেলে নদী। নদীর হাড়মাস নেই, কঙ্কাল। পাথর থেকে জল চুঁইয়ে নামছে। সামনে সেই উপত্যকা। ঝিঁঝির ঘাস মাইলের পর মাইল। লোকালয় নেই। নির্জন। তারপরই তেনার রাজত্ব। ছোটখাটো রাজার বাড়ি।"

ইন্দুর কথা শুনতে-শুনতে কেমন আবিষ্ট হয়ে গেয়েছিল বাচ্চু। হঠাৎ নদী কী মনে হতেই বলল, "ফিরলি কী করে ?"

"পালকিতে। হু হুম না।"

"ফিরলি কী করে ?"

"নৌকায়। নদীতে জল। হেঁইয়া মার টান ভাইয়া। ছোট নদী থেকে বড় নদী— তারপর ঘোড়ার পিঠে। দুলকি-চালে ফিরে এলাম। মন খারাপ। সোজা ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম চিতপাত হয়ে। কান্নায় ভেসে গেলাম।"

বাচ্চুর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

এ তো বড়ই দুর্গম অঞ্চল। ইন্দুর সঙ্গে সে যদি তখন যেতে পারত। এমন দুঃসাহসিক অভিযানের কথা সে একমাত্র বই-এ পড়েছে।

"তারপর কী হল জানিস বাচ্চু ?"

"কী করে জানব।"

"রাত পার না হতেই হল্লা, যে যেদিকে পারছে ছুটছে। বাড়ির ভিতরে ত্রাসে পড়ে গেছে সবাই। বল্লম, লাঠিসোঁটা, বন্দুক নিয়ে ছুটছে সবাই। আমিও ছুটলাম। দু' লাফে সিঁড়ি ভেঙে সদর দেউড়ি পার হয়ে দেখছি নদী পার হয়ে লক্ষ্মী ছুটে আসছে। আর কী চিৎকার! সামনে যেতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। পায়ের নীচে ফেলে চেপটে দিচ্ছে সব-কিছু। বাঁশের জঙ্গল উপড়ে শুঁড় দিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। এক মহাপ্রলয় আর কি। কেউ এগিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না। যে যেদিকে পারছে ছুটছে। বড়দার হাত থেকে বন্দুক বাবা হাতে নিতেই ছুটে গিয়েছিলাম। হয় আমি আছি, নয় লক্ষ্মী আছে।"

বাচ্চু কিছু বলছে না। সে কেমন বোবা হয়ে গেছে সব শুনে।

"তুই বিশ্বাস করছিস না! দ্যাখ, তবে!" বলেই হাতির পায়ের শেকল খুলে দিল। হাতির গলার ঘণ্টা খুলে ফেলল। তারপর হাতির পিঠে শুঁড় বেয়ে উঠে গেল। বাচ্চু বোধ হয় পালায়। ইন্দুর মাথা ঠিক থাকতে না পারে। কিন্তু পালাবে কোথায়! তার আগেই শুঁড়ে তুলে বাচ্চুকে ইন্দুর পাশে বসিয়ে দিল। এখন আর জ্যোৎস্না নেই। গভীর অন্ধকারে জলের ঢেউ— তার ছলাত-ছলাত শব্দ। দূরে কনসার্ট বাজছে কর্ণার্জুন পালায়।"

বাচ্চুর সংবিৎ ফিরে এলে বলল, "আরে করছিস কী ইন্দু! কোথায় যাচ্ছিস! হাতির পিঠে দাঁড়িয়ে আছিস কী করে! পড়ে যাবি। তুই সত্যি পরি না দেবী, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

"আমি পরিও না, দেবীও না। আমি ইন্দু। আমার ভাল লাগে লক্ষ্মীকে কোথাও নিয়ে চলে যেতে। আমার ইচ্ছে হয় কোথাও চলে যাই। লক্ষ্মী আর আমি। আর সেই সুসঙের পাহাড়। কী যে ভাল লাগে।"

ইন্দু অজস্র কথা বলে চলছে। আর বাচ্চু হাতির পিঠে শক্ত হয়ে বসে আছে। পড়ে গেলেই হাতির পায়ের তলায়।

"মনে হয় না, এই নিরন্তর আকাশের নীচে এক অবিরাম যাত্রা আছে মানুষের!"

ইন্দুর কোনও কথাই মন দিয়ে শুনতে পারছে না। কেবল বলছে, "ইন্দু ফিরে চল। তোর মাথা সত্যি ঠিক নেই। তুইও আর-এক ঘোরে পড়ে গেছিস!"

ইন্দু কী সঙ্কেত করল কে জানে! হাতিটা স্থির দাঁড়িয়ে গেল। কুয়াশার মধ্যে তারা যেন ঢুকে গেছে। কার্তিক মাসের শুরু, হিম পড়তেই পারে। কুয়াশায় সব স্পষ্ট দেখাও যায় না। নদী থেকে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। ইন্দু বসে পড়ল বাচ্চুর পাশে। উপরেও কুয়াশার ভিতর থেকে দুটো-একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র উঁকিঝুঁকি মারছে নীচে কাশের জঙ্গল দিগন্তপ্রসারিত। এখানে নদী অনেকটা চওড়া, বোঝাই যায়।

ইন্দু বলল, "জানিস, হাতির পিঠে চড়লেই নিশিকাকার কথা মনে হয়, কত অদ্ভুত কথা বলত। হাতির পিঠে ভেসে গেলে মনে হয়, আমার সত্যি দুটো পাখা গজিয়ে গেছে। আমি দুরন্ত বেগে নক্ষত্রপুঞ্জের ভিতর দিয়ে ছুটছি। নিশিকাকার কথা শুনলে তোরও এমন মনে হত, ঠাকুর-দেবতা, গুরুঠাকুর-কাপালিক, সব কত তুচ্ছ মনে হত। কাকা বলত, ভারতমাতা ছাড়া আপাতত আর কোনও আমার দেবী নেই। মানুষের মুক্তিই আসলে জীবনের শেষ কথা। এই মুক্তি মানুষ নাকি নিজেই নিতে জানে না। সে চারপাশে অজস্র বেড়াজালে আটকে পড়ে যায়। মানুষেরই নাকি শুধু ঠাকুর-দেবতা, গুরুঠাকুর, ধর্মবাবা থাকে। গাছপালা পাখি প্রজাপতি,প্রাণী-জগতের আর কারও মধ্যে তার অস্তিত্ব নেই। তারাও জন্মায়, বাঁচে, বড় হয়, প্রকৃতির নিয়মে শেষ হয়ে যায়। অথচ দ্যাখ ইন্দু, কোথাকার একটা লোক এসে তোর বাবার জমিদারি ছারখারে দিচ্ছে।"

"ইন্দু, এবার চল। আর দেরি করিস না!"

ইন্দু কেমন মুহ্যমান হয়ে যায় নিশিকাকার কথা বলতে-বলতে।

"জানিস, নিশিকাকা আমাকে ছাদে নিয়ে গিয়ে বলত, ওই দ্যাখ, ওটা কী নক্ষত্র জানিস ? অরুন্ধতী। কত শত আলোকবর্ষ দূরে অরুন্ধতীর স্বামী মহামুনি বশিষ্ঠ বসে আছেন। নক্ষত্র যা দেখি, আমাদের মুনি-ঋষিরা তাদের কত সুন্দর-সুন্দর নাম রেখে গেছেন।

"ভেবে দ্যাখ, পৃথিবীতে কত কলরব, কত গান, কত কর্মব্যস্ততা, তবু মানুষের মতো নিঃসঙ্গ কোনও প্রাণী নেই। এক অব্যক্ত অদ্ভুত

তৃষ্ণা—কী যে পেতে চায়, সে নিজেও জানে না।

"তিনি বলতেন ব্রহ্মাণ্ডের এই অন্তহীন পথের নাকি শেষ নেই। মানুষ জানেই না— তার ভেতর এমন কোনও দূরবিনও নেই সেই মহা-রহস্যময় মায়া জানতে পারে। তাঁর নামে পৃথিবীতে কতরকম ভাবে, কত মানুষ ধোঁয়া দিয়ে যে মহাপুরুষ সেজে বসে আছে তার শেষ নেই।

"জানিস, নিশিকাকা বলত, মহাসমুদ্রে জীবন-অণু সৃষ্টি হওয়ার পরই আত্মবিকাশের কোটি-কোটি পথ খুলে গেল। এ-পৃথিবীতে তারই নানা পরিচয়। কেউ ইন্দু, কেউ লক্ষ্মী, কেউ গাছ, কেউ সর্বজ্ঞ। সেই কবে সামুদ্রিক জীবন শুরু করে আজ তুই ইন্দু। কেউ ছোট নয়। কেউ বড় নয়।

"বলত, জানিস ওই যে অরুন্ধতী দেখছিস, তা পৃথিবীর কয়েক লক্ষ গুণ বড়। ভেবে দ্যাখ, সূর্য একটি নক্ষত্র। ভেবে দ্যাখ, পৃথিবী তার চারপাশে বছরে পাক খাচ্ছে। আরও কত গ্রহ তার, বুধ, বৃহস্পতি, শনি, এই একটি মাত্র সৌরজগতে আমরা বেঁচে থেকে মানুষকে কত রকমের ধোঁকা দিচ্ছি। এরকমের লক্ষ-কোটি সৌরজগৎ— যদি তুই ইন্দু কোনও অলৌকিক উপায়ে উড়োজাহাজের মতো যানে চড়ে আলোর চেয়েও দ্রুতগতিতে ছুটে যেতে থাকিস, দেখতে পাবি সেই সীমাহীন অন্ধকার মহাকাশে কোটি-কোটি নক্ষত্র ভ্রমরের ঝাঁকের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে। মহাকাশের মহাশ্মশানে কত নক্ষত্র মৃত্যুকূপে ঝাঁপ দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ আকাশের এক প্রোজ্জ্বল নীহারিকার প্রান্তদেশে পাঁচ হাজার সূর্যের দীপ্তি নিয়ে বসে আছেন ঋষি অগস্ত্য— পলকহীন ধ্যাননেত্রে বিস্ময়কর কম্পমান শান্ত সৌন্দর্য।"

বাচ্চু হতবাক হয়ে শুধু শুনে যাচ্ছে। সত্যি সে ইন্দুকে চেনে না। জীবনেও চিনতে পারবে না। এ-যেন মহাকাশের আর-এক ঘোর। সে শুধু মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। ইন্দু এবার তাকেই এক মহাঘোরে ফেলে দিচ্ছে। তার নড়বার শক্তি নেই। ইন্দু তাকে এভাবে বশ করে ফেলবে সে চিন্তাও করতে পারেনি।

"নিশিকাকা কত হাসিখুশি মানুষ ছিল জানিস। কোনও দেবদেবী, কারও কাছে মাথা নোয়াত না। অসাধু কাজ করত না। ঈশ্বর বলতে বুঝত, সেই মহাব্রহ্ম, যার স্বাদ নাকি মানুষ সহজে পেতে পারে না। পেলেও আংশিক— যারা পায় তারা নাকি, পৃথিবীর লোভ মোহ কাম সব সহজেই অবহেলা করতে পারে। বলত, যদি ইন্দু তুই কারও কাছে মাথা নোয়াস তবে সেই অনন্ত অন্তহীন জিজ্ঞাসার কাছে মাথা নোয়াবি। আর কারও কাছে নয়।"

ইন্দু দীর্ঘশ্বাস নিল একটা। বলল, "সেই নিশিকাকাকে লোকটা খুন করল। বাবাকে প্রায় উন্মাদ করে দিয়েছে। শূল টঙ্কেশ্বর।" বলেই পাগলের মতো হাহা করে হাসতে থাকল ইন্দু।

"তুই হাসছিস ইন্দু! এই, কী হয়েছে!"

"আমি না, নিশিকাকা হাসছে।"

"হাসবে কী করে? সে তো নেই।"

"আছে।"

"বেঁচে আছে বলছিস?"

"আমার মধ্যে বেঁচে আছে। নিশিকাকা বলত, কিছুর বিনাশ নেই। কিছুই শেষ হয়ে যায় না। বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফল, আবার বীজ। গাছ মরে গেলে কাঠ। কাঠে আগুন দিলে ছাই। শেষ হয় না। হয় না বলেই কিছু থেকে যায়।"

তারপর ইন্দু হাতির উপর বসে কানের কাছে পা নিয়ে গেল। ঠেলে দিল পা'টা সামান্য। এত অন্ধকারেও বুঝতে কষ্ট হল না বাচ্চুর, ইন্দু হাতিটাকে পিলখানায় যেতে বলছে। হাতি নদীর চর থেকে উঠে যেতে থাকল।

ইন্দু যেন অন্য এক জগৎ থেকে কথা বলছে "নিশিকাকা বলত, ইন্দু, তোকে কেন্দ্র করে কোটি নক্ষত্রের ফুল দিয়ে সাজানো মহাচক্র আবর্তিত হচ্ছে— উদাসীন, নিরপেক্ষ, নির্বিকার। ভয় কী শূল টঙ্কেশ্বরকে। ওটা সাঁচের পেতলের মূর্তি। পেছনে ফুটো থাকে। জানিস বাচ্চু। একটা পুতুল এনে দেখাল, এই দ্যাখ সাঁচ থেকে তৈরি, পুতুলের পিঠে ফুটো। ফুটোতে ব্যাঙ ঝুলিয়ে রাখলে হাতের নাগালে ব্যাঙ ছাড়া কী পাবে। দাদা কেন যে সর্বজ্ঞের ধোঁকা টের পেলেন না বুঝি না।"

পিলখানায় উঠে যাওয়ার মুখে বলল, "নিশিকাকা বাড়িতে ঢুকলে গোটা বাড়িটা জেগে যেত। সবার দুঃখ সহজে হেসে উড়িয়ে দিতে পারত। আমরা ছুটে যেতাম। কী দশাসই মানুষ ছিল নিশিকাকা। তোকে দেখাতে পারলাম না।"

ইন্দু হাতির পিঠ থেকে নেমে গেল।

বাচ্চু এবার ইন্দুর সাহায্য ছাড়াই হাতির পিঠ থেকে নেমে আসতে পারল।

আর নেমেই যা শুনল, তাতে সে কেমন অবশ হয়ে গেল।

ইন্দু জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সরসর করে শব্দ হচ্ছিল, বেজি কিংবা কোনও গো-সাপ তাড়া খেয়ে ছুটছে।

ইন্দু বলল, "তা হলে এই কথা থাকল। লক্ষ্মীর জন্য আশা করি এটুকু করতে পারবি। লক্ষ্মীকে বাবা গুলি করবেনই। লক্ষ্মী কারও কথা শোনে না। সর্বজ্ঞকে মানে না। যতবার দিয়ে আসা হয় পালিয়ে আসে। সর্বজ্ঞের এক চেলাকে শুঁড়ে তুলে আছড়ে মেরেছে। দেবীপক্ষেই বাবা লক্ষ্মীকে শেষ করে দেবেন। পাগলা হাতি কে পোষে!"

বাচ্চু কোনও কথা বলতে পারছে না।

ইন্দুকে অবজ্ঞা করারও সাহস নেই।

ইন্দু তাকে শুধু লাল বাতাসা বিন্নির খই খাওয়ায়নি— জীবনের আরও দূরবর্তী রহস্যের খবর দিয়েছে।

সে শুধু ইন্দুকে অনুসরণ করল।

ইন্দু তবে সর্বজ্ঞকে দেবীদর্শন করাবেই। ইন্দু পারে। যেভাবে ইন্দু তার এই দেবীদর্শনের রাজসূয় যজ্ঞে তার সাহায্য চাইছে তাতে বিষয়টা ইন্দুর পক্ষে খুবই সোজা। বন-দুর্গাপুরে আছে বিশাল গভীর বন— শাল জারুল শিমুল আকন্দ কাঁটার ঝোপ। নির্জন সব তৃণভূমি, বনজঙ্গলের টিলা পার হয়ে পাহাড়ের দু'পাশে মরুপথ। খাড়া পাহাড় দু' দিকে। শেষ মাথায় মহামায়ার থান। সর্বজ্ঞ থানের সেবাইত।

তিনি মহামায়ার পূজা সেরে গভীর রাতে নেমে আসেন নিজের ডেরায়। ইন্দু এই সুযোগ অবহেলায় ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়।

এত অন্ধকার যে, সুপারি গাছগুলো এখন আর আলাদা করে চেনা যায় না। ঝোপে-জঙ্গলে জোনাকি জ্বলছে। কোথাও মানুষের কোনও সাড়া নেই। শুধু দূর থেকে বিবেকের গান, কিংবা ক্ল্যারিওনেটের সুর ছাড়া কিছুই কানে আসছে না। ইন্দুর এই পথ এত চেনা, সে সহজেই হেঁটে যেতে পারছে, গাছে মাথায় ঠোকাঠুকি না হয় সেজন্য বাচ্চুর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, "দেখিস, এখানটায় গর্ত আছে, পড়ে যাস না। বাঁ দিকে পা ফেল।" গভীর নিশীথে এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার পথে হাঁটতে বাচ্চুর এতটুকু ভয় করছিল না। ইন্দু সত্যি বিপদনাশিনী। তার মা বিপদনাশিনীর ব্রত করেন— ইন্দু যেন আর-জন্মে সেই দেবী ছিল। শাপভ্রষ্ট হয়ে ইন্দু বাবুমশাইয়ের ছোট কন্যে। এখন বন্দিনী রাজকন্যা।

বাচ্চুর মনে সহসা ধন্দ দেখা দিল, বাবুমশাই তো চেয়েছিলেন, বাচ্চু আসুক। ইন্দুর ঘোর বিপদে বাচ্চুর আসার দরকার। আশ্চর্য,

এবারে বাবুমশাই তাকে ডেকে কোনও কথাই বলেননি। এমনকী, সে কোন ক্লাসে পড়ে তাও জানতে চাননি। সে দুষ্টুমি করে কি না, সাঁতার কেটে পুকুর পার হতে পারে কি না, তাও জানতে চাননি। অথচ তিনিই তো চেয়েছিলেন সে এলে ভাল হয়। কিন্তু...

এই কিন্তুটার জন্যই বাচ্চু না বলে পারল না, "আচ্ছা, বাবাকে দিয়ে কে চিঠি লিখিয়েছিল ? বাবুমশাই, না তুই ?"

ইন্দু বলল, "কেন, আমি।"

"বাবুমশাইয়ের নাম করে লেখালি কেন ?"

"তুমি যা একখানা বিচ্ছু, বাবাকে ছাড়া আর কাউকে তো পাত্তা দিতে না।"

বাচ্চু হলুদ জমিতে ঢুকে বলল, "ইন্দু, আর-একবার ভেবে দ্যাখ, ঠিক কাজ হবে কি না ! ধরা পড়লে বাবা আমার ছাল-চামড়া তুলে নেবে।"

"লক্ষ্মীকে শেষ করে দেওয়া হবে, আমার বাবা বাবাঠাকুর-বাবাঠাকুর করে উন্মাদ হয়ে যাবে— তুই কিনা তোর ছাল-চামড়ার কথা ভাবছিস ! এত স্বার্থপর তুই ! যেতে হবে না। আমি একাই পারি। তুই সঙ্গে থাকলে দূরের জঙ্গলে ভয় থাকবে না। ফিরে আসতে না পারলেও না। পথ হারিয়ে ফেললেও না।"

বাচ্চু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল— সেই বিন্নির খই লাল বাতাসার কথা মনে পড়ছে। জীবনে যে এর আলাদা এক ঘ্রাণ আছে টের পাবে। সে বলল, "আমাকে কী করতে হবে বলে দে।"

ইন্দু দু'লাফে পাঁচিলে উঠে গেল কড়ি বেয়ে। তারপর জামগাছটায় উঠে যাবার মুখে বলল, "কাছারিঘরের বারান্দায় বসে থাকিস। সকালে ! মনে থাকবে, সকালে। আমাদের হাতে সময় কম, বুঝলি ! ভেবে দ্যাখ, এবারে লক্ষ্মীকে বাঁচাতে গিয়ে বাবার সামনে দাঁড়ালেও রেহাই পাব না। দু'জনেই মুখ থুবড়ে পড়ব। সবটাই দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেবে। ভেবে দ্যাখ, তোর সামনে মরে পড়ে আছে, ইন্দু আর লক্ষ্মী। ভেবে দ্যাখ, রক্তে ভেসে গেছি। আমার মরা মুখ দেখতে তোর ভাল লাগবে ? কিংবা বাবা হয়তো রাতে সবার অজ্ঞাতে সুকুমারদাকে নিয়ে যাবে। নিজে লক্ষ্মীকে খুন করবে। কেউ জানতেই পারবে না। সকালে উঠে শুনব, লক্ষ্মী নেই।" বলে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল ইন্দু।

বাচ্চুর চোখ ছলছল করছিল। ইন্দু বেপরোয়া, দোষ নেই। ইন্দুর মরা মুখ দেখতে হবে ভেবেই সে মাথা ঠিক রাখতে পারল না। সে হঠাৎ চিৎকার করে বলল, "সকালে বসে থাকব। রাতে আর ঘুমাব না।" যেন এক আলাদা শস্যখেতে সে দাঁড়িয়ে আছে। পাখির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে, নদী কোথায় যায়— এই শব্দমালা যেন বারবার তাকে কোনও গভীর অরণ্যের মধ্যে নিয়ে যেতে চাইছে। সেখানে সে আর ইন্দু আর লক্ষ্মী। পৃথিবীর নতুন দ্বীপ, নতুন নক্ষত্রের জন্ম এবং জন্মাবধি, এভাবেই কীটপতঙ্গ থেকে মানুষের আবাস তৈরি হয়ে যায়—ইন্দু বলেছে, আমরা সেখানেই চলে যাব,

যেখানে মানুষের তৈরি ঈশ্বর আমাদের তাড়া করবে না।

ইন্দু কার্নিসের উপর দিয়ে অবলীলায় হেঁটে যাচ্ছে। একবার পেছনে ফিরে তাকে বোধ হয় দেখল। কারণ কার্নিসের মাথায় যতই অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি হয়ে যায়, এবং যতই উপরে থাকুক, ইন্দুর সঙ্কেতে সে টের পেয়েছে, "বাচ্চু, চলে যা। আর দাঁড়িয়ে থাকিস না। আমি ঠিক ছাদে নেমে যেতে পারব। কার্তিকের হিম বড় খারাপ। দাঁড়িয়ে থেকে আর ঠাণ্ডা লাগাস না।"

বাচ্চু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। পায়ে ঘাস-পাতা লেগে আছে। জুতোর নীচে। সে আলগা করে এক পাশে জুতো রেখে দিল। মোমবাতি উসকে ঘাসপাতা পা থেকে তুলে বাইরে ফেলে দিল। তারপর বালিশ টেনে শুয়ে পড়তেই ভিতরে তার মোষ-বলির বাজনা শুরু হয়ে গেল। একটা নির্বোধ জীবকে অকারণ টেনে টেনে নিয়ে হাড়কাঠে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ঢাকিরা ঘুরে-ঘুরে বাদ্য বাজাচ্ছে। ইস, এটা কী দেখল, ওটা মোষ নয়, ধর্মের নামে ইন্দুকে উচ্ছুন্ন করা হচ্ছে। বাবুমশাইয়ের হাতে বিশাল খাঁড়া। কপালে রক্তচন্দনের তিলক। খাঁড়ার মাথায় সিঁদুরের ফোঁটা— মা-জগদম্বা, মা-তারা, মা-মাগো, খাঁড়ার কোপে ঘ্যাচাং করে দু'খানা হয়ে গেল। দৃশ্যটা এত তাড়া করতে থাকল যে, বাচ্চু ছটফট করতে থাকল। সে শুতে পারছে না। সে পায়চারি করছে। তার এখন আর সেভাবে ভয়ডরও নেই। আগে হলে ঘর থেকে দৌড় লাগাত, কিন্তু যাবেটা কোথায়, পৃথিবীর অন্য এক নতুন কনসার্ট তার মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে, সে আর ভীরু বালকের মতো উদোম হয়ে ছোটার জন্য পাগল হবে না, ইন্দু তাকে কীভাবে যে মুহূর্তে সাবালক করে দিয়ে গেল সে টের পায়নি।

আজ প্রথম লক্ষ্মীর জন্য মায়া বোধ করল। সরল অকপট সোজা-সাপটা হাতিটারও নিস্তার নেই।

লোকটা অবতার, না কাপালিক। কাপালিকরা কি এখনও আছে। বাচ্চুর ভিতর থেকে কে যেন বলল, আছে। তারা থাকে। তারা মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। দম্ভ, আত্মম্ভরিতায় তারাই আসলে পাগলা হাতি। সরল মানুষের দুর্বলতার সুযোগে কীটের মতো বাসা বেঁধে ফেলে। এক-এককালে এক-এক ছলে তারা আসে। কপালকুণ্ডলার কাপালিক, ইন্দুর সর্বজ্ঞ, যখন যেরকম।

তবে ইন্দু তাকে সব খুলে বলেনি।

যেটুকু বলেছে, তাতেই সে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। ধীরে-ধীরে সেটা সে কাটিয়ে উঠেছে। সে আর কোনও কারণেই সরে আসতে পারবে না। ভিতরে তার উত্তেজনা বাড়ছে। যেন এক গভীর সমুদ্রে অজানা ভূখণ্ড আবিষ্কারের প্রত্যাশায় সে অধীর। সেই অরণ্যের মধ্যে কোনও মহামায়ার থান, তার নীচে সে আর ইন্দু হাতির পিঠে— দু' দিনের যাত্রা, দশ ক্রোশ রাস্তা রাতে পার করে দেওয়া যাবে— তারপরই ভাওয়ালের গড়, রাস্তায় কখনও সুমার মাঠ, কখনও নির্জন বসতি অঞ্চল, কখনও নদীর নালা, হাঁটুজল পার হয়ে যাওয়া— কানে কানে এটুকুই শুধু বলেছিল। ফিরে আসবে কী করে? দু' দিন কিংবা তারও পরে অভিযান সফল করে ফিরে আসা হবে কি না— না অন্য কোনও মতলব আছে ইন্দুর, সে জানে না। কাল সকালে সে জানতে পারবে হয়তো। কাল আবার একটা উড়োজাহাজ ভেসে আসবে তার কাছে।

॥ ৩০ ॥

সকালে আবার সেই লম্বা বেঞ্চি— বাচ্চু বেঞ্চিতে বসে আছে তীর্থের কাকের মতো। কখন ছাদ থেকে ইন্দু কাগজের উড়োজাহাজে আবার আজকের সঙ্কেত পাঠাবে। বসে থাকাও বিড়ম্বনা। সবার এক প্রশ্ন, "কী রে, চুপচাপ বসে আছিস কেন।" "কী রে, মুখ গোমড়া কেন।" "কী রে, এখনও হাতমুখ ধুলি না? কখন খাবি!"

অষ্টমীর বাজনা বাজছে।

দাদারা ঘুম থেকেই ওঠেনি— তাই রক্ষা। সকাল-বিকাল ঘুমাবে। রাত জেগে যাত্রা দেখবে। তারা উঠলেও নানা প্রশ্ন করত। সে যে সবাইকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। কারও কথার জবাব দিতেই ইচ্ছে হচ্ছে না। বলতে গেলে তার এখন শিরে সংক্রান্তি। তার কিছুই ভাল লাগছে না।

বিশ-পঁচিশ ক্রোশ দূরে কর্মিটোলার ঘাঁটি। ঝাঁকে-ঝাঁকে যুদ্ধবিমান নেমে যায়। দাদারা বিকেলে নদীর চরে নেমে গেছিল যুদ্ধবিমানের মহড়া দেখতে। সে যায়নি। সকালেও একঝাঁক উড়ে গেল— তার উৎসাহ কম। তার কাছে এখন একটা কাগজের উড়োজাহাজই আসল যুদ্ধের খবর নিয়ে আসবে। সেই অপেক্ষায় সে বসে আছে। আজ কী সঙ্কেত পাঠাবে কে জানে।

তার রাগ হয়, ইন্দু সব খুলে বলছে না বলে। আসল মতলবটা কী? হাতি! ইন্দু নিজে না সর্বজ্ঞ। ফিরবে কী করে। ফিরে এলে হাতিটাও ফিরে আসবে। তা হলে শেষে কী দাঁড়াল! না, আবার মাথা ঘুরছে। সে বুঝতে পারছে না ইন্দু কীভাবে লক্ষ্মীর প্রাণ বাঁচাবে। একবার ভাবল, আচ্ছা, লক্ষ্মীকে শেকল খুলে ছেড়ে দিলেই হয়। রাতের বেলা, তারা দু'জনে মিলে হাতিটাকে নদীর ও-পাড়ে দিয়ে আসবে। বলবে, বাছা, তুমি জঙ্গলে চলে যাও। ইন্দু যদি বুঝিয়ে বলে লক্ষ্মী ঠিকই বুঝতে পারবে। ইন্দুর এত কথা বোঝে, এটা বুঝবে না হয় না। মাথায় বুদ্ধিটা আসতেই ভাবল, রাতে ইন্দুর সঙ্গে পরামর্শ করলে হয়— কী বলিস ইন্দু, এই ভাল না। লক্ষ্মী জঙ্গলে চলে গেলে কেউ নাগাল পাবে না। কিন্তু ইন্দু যে বলল, সর্বজ্ঞকে দেবীদর্শন করাবে! সে তো বাজে কথার মেয়ে নয়। সেই দেবীদর্শনই বা কীভাবে হবে। দেবীদর্শন করিয়ে লাভই বা কী হবে! ইন্দুর দুঃসাহসিক অভিযানের কথা ভাবলেই সকালবেলায় মাথা ঠিক রাখতে পারছে না।

দাদাদের সঙ্গে পরামর্শ করলে হয়। সে ভাবতে-ভাবতে কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। দাদারা তাকে উপায় বাতলে দিতে পারে— জানিস বড়দা, লক্ষ্মীকে নাকি মেরে ফেলা হবে। লক্ষ্মীকে মেরে ফেললে ইন্দু মাথা ঠিক রাখতে পারবে না।

কিন্তু সে জানে, যতই উতলা হোক, কাউকে কিছু বলতে পারবে না। বললে পাঁচ কান হয়ে যাবে। ইন্দুর এতে বিপদ আরও বাড়তে পারে। সে এখন সব-কিছু ছাড়তে রাজি, কিন্তু ইন্দুর মরা মুখ দেখতে রাজি না।

বেলা বাড়ছে, কিন্তু উড়োজাহাজের পাত্তা নেই। তার রাগ হচ্ছিল। এই   বলল, সকালে খবর পাবি, কী করতে হবে না হবে জানতে পারবি, খবর পাওয়ার এই নমুনা। ইন্দুর সব টের পেয়ে যায়নি তো। এই যে রাত করে সে তাকে নিয়ে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, কেউ দেখে ফেলেনি তো! তা হলে গেছে। সেও গেছে, ইন্দুও গেছে। ভয়ে-ভয়ে কেমন গলা শুকিয়ে উঠছে।

বাবা খুব সকালে নদীতে স্নান করতে গেছেন, দেখে গেছেন সে বসে আছে বেঞ্চিতে। বাবার সকালে উঠেই জপতপ থাকে। কথা বলেন না। নদী থেকে স্নান সেরে এসে তিনি মুক্ত হন। নানা বিঘ্ন মানুষকে কতভাবে যে দুশ্চিন্তায় রাখে বাবার মুখ দেখলে সে টের পায়।

বাবা ফিরে এসেও দেখলেন, বাচ্চু বেঞ্চিতে বসে আছে। বাবা অবাক হতেই পারেন। যাত্রা দেখে এত সকালে কেউ ওঠে না। বেলা অবধি ঘুমায়। এত সকালে উঠে বসে থাকলে দুশ্চিন্তা হওয়ারই কথা।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

(ক্রমশ)

রোভার্সের রয়
“ওকে পেয়েছি··· ও রান-আউট হয়েছে, আম্পায়ার !”
রোভার্স ক্যাভেলিয়ার্সের সঙ্গে কয়েকটি একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ খেলছিল । প্রথম খেলায় দুর্দান্ত ফাস্ট বোলার র‍্যালফ মিকারের বলে মারভিন ওয়ালেস আহত, এবং তাড়াতাড়ি একটা রান নিতে গিয়ে রয় বিপদে পড়েছে···
র‍্যালফ, জোরে !
নোয়েল ব্যাক্সটার নিশ্চয় পাগল হয়েছে ! রান ছিলই না !
ওকে পেয়ে গিয়েছি···
STEVE REGAN
হাউজ্যাআ্যাআ্যাট !
নিশ্চয় আউট, আম্পায়ার ! ও এক মাইল দূরে ছিল !
MODIQUE FURNISHING
রয়ের গতি আর দক্ষতা ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ! পৌঁছে গিয়েছে !
কীইইইই ?
আপনার চশমা দরকার ! অথবা ফুটবলের তারকা রেস সম্পর্কে আপনি অন্ধ !
র‍্যালফ, চুপ করো···
মিকারকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করানো হল···
আবার যদি এমন হয় তবে··· !
ঠিক আছে, বলেছি তো আমি দুঃখিত ! ওই 'সুপারস্টার' রয় রেসকে শিক্ষা দেবার অন্য ব্যবস্থা করছি !
মিকার এমন কৌশল আয়ত্ত করেছে যার ফলে নিখুঁত লেংথের বল হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে···
উউউউহ !
কিন্তু ওটা সত্যিই বাউন্সার ! মনে হয় বাছা র‍্যালফি খেপে গিয়েছে !
মিকার পরের বল দেবার আগে···
সম্ভবত এ বলটা ও আগে ঠুকে দেবে । আমি যদি এগিয়ে গিয়ে মারি···

পরের সংখ্যায় : রয় সিদ্ধান্ত নিল সব বলই পেটাবে !

মহাকাশ-দৈত্য একটি স্বপ্ন ও বিজ্ঞানের ক্লাস

সতীশ অগ্নিহোত্রী

আজও দেরিতে বাড়ি ফিরলেন প্রোফেসর অভিযান। ক'দিন ধরেই সব কাজ পণ্ড হয়ে যাচ্ছে। রিসার্চের পরিকল্পনাটা এতদিন পর দিব্যি মাথায় এসে গেছিল, হঠাৎ জানতে পারলেন রঞ্জিতের হাত থেকে পড়ে লেসার-টর্চটাই ভেঙে গেছে। লেসার-রশ্মি ছাড়া এক্সপেরিমেণ্টটা করাই যাবে না।

একহপ্তা এখন ছুটি। সব কাজ বন্ধ। কিচ্ছু হবে না। মনে-মনে বিড়বিড় করছিলেন প্রোফেসর। বন্ধু সদাশিবনের কথাটা হঠাৎই মনে পড়ে গেল। সদাশিবন ক'দিন আগে সাবধান করে দিয়েছিলেন, "অভিযান, তোমার কুষ্ঠিতে শনির সাড়ে-সাতি আরম্ভ হয়েছে—সামলে চলো!"

হুঁ। শনির দশা! সাড়ে-সাতি! অন্যমনস্ক অবস্থাতেই মুচকি-মুচকি হাসেন প্রোফেসর। শনির চাঁদ টাইটানে পৃথিবীর কলোনি তৈরি হয়ে গেছে। এখনও এইসব ভদ্রলোকেরা শনির দশা-টশা নিয়ে মাথা ঘামান। অনেকবার সদাশিবনকে বলেওছেন অভিযান, "দ্যাখো, শনির একারই ন'টা উপগ্রহ, যাদের তোমরা বলো শনির চাঁদ। টাইটান হচ্ছে তাদের মধ্যে সবচাইতে বড়। সেখানে আমরা পৃথিবীর মহাকাশ-বিজ্ঞানকেন্দ্র খুলেছি। সেখানে আবার শনির সাড়ে-সাতি কী হে? যে বাচ্চারা টাইটানে জন্মাবে, তাদের কুষ্ঠিতে কি পৃথিবীর দশা হবে?"

প্রোফেসর অভিযান একজন ডাকসাইটে মহাকাশবিজ্ঞানী,

মহাকাশ-যোগাযোগের একজন বিরাট এক্সপার্টও বটে। আন্তর্জাতিক মহাকাশ-বিজ্ঞান কেন্দ্রের লাইফ মেম্বারশিপও পেয়েছেন। গত কয়েক মাস ধরেই সৌরজগতের বাইরের গ্রহদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পরিশ্রম করার ক্ষমতা আর আন্তরিকতা দুটোই ওঁর অসাধারণ। লেসার-টর্চটা ভেঙে গিয়ে সব কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেল।

হেলি-গ্যারাজের ছাতে যখন ওঁর হেলিকপ্টারটা ল্যাণ্ড করল, তখনও উনি আন্দাজ করতে পারেননি যে, চৌধুরীসাহেব এসে বসে আছেন। আসাটা কিছু আশ্চর্য নয় অবশ্য। চৌধুরীসাহেব হচ্ছেন ওঁদের শহরের সবচেয়ে নামকরা স্কুল 'বিজ্ঞান'-এর প্রিন্সিপাল। প্রোফেসর অভিযান বছরে তিনমাস ওঁদের স্কুলে নিয়ম করে ফিজিক্স পড়ান ক্লাস সিক্স আর সেভেনের ছেলেদের। গত সাত-আট বছর ধরে পড়িয়ে আসছেন। অভিযানকে এই নিয়ে বন্ধুদের ঠাট্টা-তামাশা কম সইতে হয়নি। ওঁর কিন্তু বেশ লাগে বাচ্চাদের পড়াতে। বলেন, "আরে, হলই-বা স্পেস সায়েন্স! বাচ্চাদের একবার পড়িয়েই দ্যাখো না, ভাবছ সোজা! আরে বাবা, এ একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। ওদের পড়িয়ে কত আনন্দ পাই।" যেসব বন্ধুরা ওঁকে এই পড়ানো নিয়ে ঠাট্টা করে আসছেন, তাঁরাও অবশ্য নিজেদের ছেলেমেয়েদের ওঁর স্কুলেই ভর্তি করেন, বিশেষ করে ক্লাস সিক্স-সেভেনের জন্য।

আজ কিন্তু চ্যালেঞ্জ বা আনন্দ কোনও কিছুর ভাবনাই প্রোফেসরের মনকে ভোলাতে পারছিল না। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর পড়ানোর প্রসঙ্গ যখন উঠল, প্রোফেসরের গলায় অবসাদের আভাস স্পষ্ট, "ভাই এ-বছরটা থাক। ভাবছি লম্বা ছুটি নিয়ে হিমালয়-টিমালয় কোথাও গিয়ে বসে থাকব। এই এক্সপেরিমেন্টের পাল্লায় পড়ে সুখশান্তি সব গেল।"

চৌধুরী বুঝতে পারলেন, আজ সত্যিই প্রোফেসরের মন ভাল নেই। না হলে এভাবে বারণ করার লোক উনি তো নন। বুঝতে পেরেই, কথার মোড় ঘোরালেন উনি।

ওঁর যাবার পর অনেকক্ষণ আনমনা হয়ে বসে রইলেন অভিযান। ওঁর ভাল লাগেনি এভাবে চৌধুরীসাহেবকে ফিরিয়ে দিতে। কোনওমতে চিন্তাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছিলেন।

ওঁর নিজের যন্ত্রমানুষ 'স্বাধীন'কে অনেক নির্দেশ দিয়ে অভিযান কম্বলের মধ্যে ঢুকলেন। খানিকক্ষণ পর আপনা থেকেই ঘুমে ডুবে এল ওঁর দু'চোখ।

স্বাধীন এক ভারী মজার মানুষ, মানে, রোবো। ওর মাথায় অভিযান এমন এক শক্তিশালী কম্পিউটার জুড়ে দিয়েছেন যে, স্বাধীন ওঁর সখা-সহচর-বিশ্বকর্মা—একাধারে সব। ওর গলার খ্যানখেনে ধাতব বাংলা শুনতে বেশ মজার লাগে। কেউ-কেউ ওর কথা শোনবার জন্যই একই প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞেস করে। দু'বার উত্তর দেবার পর তৃতীয়বার খ্যানখেনে গলায় আওয়াজ আসে, "দয়া করে মজা করবেন না···।"

"সরি প্রোফেসর গুড মর্নিং—টাইটান থেকে এস· ও· এস·—সরি প্রোফেসর, গুড মর্নিং—টাইটান থেকে এস· ও· এস· ওঁর কানের কাছে জোরে-জোরে পড়ে যাচ্ছে স্বাধীন। ধড়মড় করে উঠে বসলেন অভিযান।

এস· ও· এস·! মানে···বাঁচাও! বাঁচাও! স্বাধীনের নাকটা ঘুরিয়ে ভল্যুম অফ করে প্রোফেসর টেলিপ্রিন্টারের দিকে দৌড়লেন।

সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা টেলিপ্রিন্টার মেসেজ পড়তে পড়তে ওঁর মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে এল, "হায় ভগবান! টাইটানে অচেনা মহাকাশ-দৈত্য···মোকাবিলা অসম্ভব···নিজের গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে···তারপর সৌরজগতের ওপর কব্জা করবে···ওর ট্রান্সমিটার খারাপ হয়ে গেছে···ঠিক হবার আগে আমাদের বাঁচান···তাড়াতাড়ি আসুন···রাও ০১৭৩। ডঃ রাও টাইটানে আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্রর সংযোগ বিভাগের অধ্যক্ষ।"

এক্ষুনি যাওয়া দরকার। অভিযান তাড়াতাড়ি প্রোফেসর গাসকে ধরতে চাইলেন। প্রোফেসর গাস জেনেভার মহাকাশ-বিজ্ঞান সংস্থার ডাইরেক্টর। গাসকে বোঝালেন ব্যাপারটা। তারপর স্বাধীনের মাথায় কতগুলো নির্দেশ ভরলেন, যাতে উনি যখন বাইরে থাকবেন, তখন স্বাধীন রোজকার কাজগুলো করে রাখে। বেরোবার আগে অন্য সব জিনিসের সঙ্গে নিজের লেসার-বন্দুক নিতে ভুললেন না। এই বন্দুক থেকে দারুণ শক্তিশালী লেসার-বিম বেরিয়ে সবচেয়ে কঠিন ধাতুকেও কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ফুটো করে দিতে পারে।

কচ্ছথিউ-এর রকেট পোর্ট-এ ওঁর আকাশযান তৈরিই ছিল। এই কচ্ছথিউ এতদিন ছিল ভারত আর শ্রীলঙ্কার মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ। আজ কচ্ছথিউ এক আন্তর্জাতিক রকেট-বন্দরে পরিণত হয়েছে।

টাইটানে পৌঁছতে লাগবে পুরো পাঁচ ঘণ্টা। রাওকে আগেভাগে খবর না দিয়ে যাওয়াই ঠিক করেছিলেন প্রোফেসর। ফ্লাইট শুরু হবার দশ মিনিট পরই রকেটের কন্ট্রোল চলে গেল অটোমেটিক সিস্টেমের হাতে। এই সিস্টেমকে চালায় কম্পিউটার। গন্তব্যস্থল বলে দিলে যাবার রাস্তা নিজেই খুঁজে নেয় এই সিস্টেম। কোনও বাধা বা অসুবিধে থাকলেও সেটা শুধরে নিতে পারে। টাইটানের ফাইল খুলে বসে পড়তে আরম্ভ করলেন প্রোফেসর অভিযান।

হঠাৎ অ্যালার্মের তীক্ষ্ণ আওয়াজে চকিত হয়ে উঠলেন প্রোফেসর। লাল সঙ্কেত দেখা দিয়েছে কন্ট্রোল-রুমের বাইরে। তার নীচে স্ক্রিনের ওপর ফুটে উঠেছে সবুজ অক্ষর:

"মনে হচ্ছে কোনও তীব্র চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব। রকেট চলে যাচ্ছে একই দিকে। চেষ্টা ব্যর্থ। বিপদের আশঙ্কা। টাইটানের পাঁচশো কিলোমিটার ওপরে আমরা।"

অটোমেটিক সিস্টেম সাধারণত ছোটখাটো অসুবিধেগুলোকে নিজেই ঠিক করে নেয়। বোঝা যাচ্ছে, এবারের সমস্যা সাধারণ নয়।

প্রোফেসর কন্ট্রোল-রুমে ঢুকলেন। চৌম্বক ক্ষেত্রের মিটারের ওপর চোখ পড়তেই ওঁর পিলে চমকে গেল—আরেব্বাস! টাইটানের রাস্তায় এত বড় ম্যাগনেটিক ফিল্ড! এ তো আগে ছিল না। তাও আবার মাত্র তিনশো কিলোমিটার দূর টাইটান! রকেটের মুখ ঘোরালেন প্রোফেসর—চেষ্টা করতে লাগলেন আকর্ষণের উলটো দিকে যাবার—কিন্তু শিগগিরই বুঝতে পারলেন, কোনও অপার্থিব শক্তির পাল্লায় পড়েছেন উনি। যতই চেষ্টা করছেন রকেটকে উলটোদিকে নিয়ে যেতে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের শক্তি ততই তীব্র হয়ে চলেছে! মরেছে! এ নিশ্চয়ই সেই আকাশ-দৈত্যের কারসাজি! প্রোফেসর ভাবলেন। টিভি-ক্যামেরা অন করে চারদিকে দেখতে লাগলেন এবার।

টাইটানের 'আবহাওয়া' আজ একদম পরিষ্কার! একফালি বালিভরা জমির এক কোনায় দাঁড়িয়ে সেই জীব, যার দিকে অসহায়ের মতো উড়ে চলেছে রকেট! টাইটানের মাটিতে নেমেও মৃদুমন্দ ঝাঁকুনি লাগছিল রকেটে। প্রথমেই অভিযানের মাথায় এল লেসার-বন্দুকের কথা। বন্দুক অন করে তাক করলেন। হরি, হরি! প্রাণীটার সবুজ শরীরে লেসার-আলো পড়ে কমলা রঙের গোল-গোল আলোর চাকতি খেলে যেতে লাগল। এর ওপর লেসার-রশ্মির কোনওই প্রভাব নেই! হতাশ হয়ে বন্দুক ফেলে দিলেন প্রোফেসর!

রকেটের ভেতরই দাঁড়িয়ে রইলেন অভিযান। দেখা যাক জীবটা এবার কী করে। এমন সময় দরজা খুলে গেল আপনা থেকেই।

আওয়াজ শোনা গেল, "স্বাগতম্, প্রোফেসর অভিযান, জানতাম আপনি আসবেন ! 0173-এর মেসেজটা আপনাকে পড়ে শুনিয়ে দিই ? কী বলেন ?"

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে প্রাণীটা। মেটে-মেটে অদ্ভুত সবুজ রঙের গা, শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জ্যামিতিক আকারে তৈরি—যেন মেশিনে বানানো, মাথাটা কিউব, গা-টা সিলিণ্ডারের মতো—গোল-গোল হাত-পা—বোতামের মতো আঙুলগুলো।

"তুমি দরজা খুললে কী করে ?" অভিযান খুব আশ্চর্য হচ্ছিলেন। "আর, তুমি বাংলাই-বা বলছ কী করে ?" অনেকগুলো প্রশ্ন ওঁর মাথায় ঘুরছিল।

"সোজা কথা। উত্তর নম্বর এক : শব্দতরঙ্গের সাহায্য নিয়ে আমি দরজার তালাটা পড়ে নিলাম। তালা খুলে গেল। উত্তর নম্বর দুই : তোমার দু'-তিনজন সহকর্মীর ব্রেন খুলে পড়ে নিলাম আর নিজের মেমোরিতে ভরে নিলাম। এখন ওরাও যতটুকু জানে, আমিও ততটুকু জানি।"

"তুমি···ব্রেন···কী করলে ?" অভিযানের বুকটা ধক্ করে উঠল।

"খুলে পড়ে নিলাম। এবার শোনো, কাজের কথায় আসি। এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহ-নক্ষত্রে সঙ্কেত পাঠানোর সিস্টেম তুমি কতখানি জানো ? বলে ফ্যালো চটপট।"

অভিযান মুশকিলে পড়ে গেলেন। কী বলবেন ? জানেন ? জানেন না ? জানেন বললে আবার সঙ্গে-সঙ্গে ব্রেন খুলে পড়ে না নেয় ! ব্রেন খুলে পড়াটা কী ব্যাপার বুঝতে না পারলেও ওঁর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিম স্রোত নেমে গেল। জানেন না বললে যদি জবরদস্তি করে ওঁকে পৃথিবীতে নিয়ে যাবার জন্যে ? দারুণ দ্বিধার মধ্যে অভিযান বুঝতে পারলেন, চিন্তা বদলানো দরকার। প্রাণীটা যেন বুঝতে না পারে উনি কী ভাবছেন।

খানিকটা সাহস মনে এনে বললেন, "কিছুটা জানি। কিন্তু কতখানি তোমার কাজে লাগবে জানি না। আগে তোমার সমস্যাটা কী বলো, আমরা খানিকক্ষণ বসে কথাবার্তা বলে নিই। তারপর দেখব, তোমায় কতটা সাহায্য করতে পারি।"

"যাক, তুমিই প্রথম সাহায্যের কথা বললে। সবাই তো প্রথমে অ্যাটাক করতে চায় দেখি। অবশ্য তুমিও তো আমার ওপর লেসার-টর্চ মারছিলে দেখলাম। ওগুলোকে তোমরা অস্ত্র বলো নাকি ? ছ্যাঃ। লেসার-রশ্মিগুলো তো আমি শরীরের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে ভোঁতা করে দিই। আমার কিস্যু হয় না ওতে। যাক গে।"

"তোমার নাম কী ?" প্রোফেসর শুধোলেন।

"তোমাদের ভাষায় আমার নাম হল সিগনাল-১৯-২০-১৫৫৬।

"সিগনাল ?" অনেক কথা একসঙ্গে বিদ্যুতের মতো খেলে গেল প্রোফেসরের মাথায়··· প্রাণীটার ভাবলেশহীন কথাবার্তা, ব্রেন খুলে মেমোরিতে ভরে নেওয়া···এটা যন্ত্র-মানুষ না তো ? খুব উন্নত ধরনের রোবো হয়তো ! নিজের মনের কথা লুকিয়ে ফেলে উনি হাসলেন, "এত বড় নাম ? যদি তোমায় উনিশ-বিশ বলে ডাকি ?"

"আমি জানি প্রোফেসর, তোমাদের ভাষায় এর আর-একটা কী মানে আছে। তোমরা সংখ্যা জুড়ে মানে কী করে বার করো বলো তো ? আমার কিন্তু মেমোরিতে ঠিক মানে খুঁজতে ভারী অসুবিধে হয়।"

উনিশ-বিশের কাছ থেকে যা জানা গেল তাতে প্রোফেসর আরও দমে গেলেন। সৌরজগতের থেকে তিন আলোকবর্ষ দূরের এক গ্রহের জীব ওরা। (মানে, ৩×১০^১৩ কিলোমিটার। এক আলোকবর্ষ মানে ১০^১৩ কিলোমিটার রাস্তা) এতদিন পরমাণুশক্তিতেই ওদের সব কাজ চলত। কয়েক বছর হল ওদের পরমাণুশক্তির ভাঁড়ার শেষ হয়ে এসেছে। ওরা একটা গ্রহ খুঁজছে, যেখানে প্রচুর পরমাণুশক্তি আছে। আগামী চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সেখানেই সভ্যতা গড়ে তুলতে চায় ওরা। মহাকাশের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের রকেট, এমনই এক গ্রহের খোঁজে। উনিশ-বিশের রকেট ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ খারাপ হয়ে এসে পড়েছে টাইটানে। ভাগ্য ভাল যে, উনিশ-বিশের রকেট আর ট্রান্সমিটার দুটোই বেশ ভালরকম বিগড়েছে। উনিশ-বিশ কিন্তু ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে যে, পৃথিবীতে আছে—থোরিয়ম ধাতুর অগাধ ভাণ্ডার—থোরিয়ম হচ্ছে পরমাণু-জ্বালানি। এখন উনিশ-বিশ চেষ্টা করছে কোনওমতে ট্রান্সমিটারটা সারিয়ে ফেলে নিজের গ্রহে খবর পাঠাতে।

শুনে যা বোঝা গেল, উনিশ-বিশদের গ্রহের সভ্যতা বেশ ভালরকমের উন্নত। বিশেষ করে বিজ্ঞান আর কারিগরিতে ওরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ওরা যদি পৃথিবীতে নেমে আসে, মানুষকে বানাবে নিজেদের ক্রীতদাস।

অভিযান অবশ্য এটাও বুঝতে পারলেন যে, বেশ উন্নত ধরনের হলেও উনিশ-বিশ যন্ত্র-মানুষ ছাড়া অন্য কিছু না।

একদিকে ওঁর পক্ষে সেটা সুবিধেরই। ও রোবো বলে ওর মাথাটা একটা কম্পিউটার। কাজেই ভেবেচিন্তে বানিয়ে কথা বলা কিংবা ভুলভাল খবর ইচ্ছে করে দেওয়া, এসব উনিশ-বিশের পক্ষে সম্ভব না। সুখ-দুঃখ, হাসি-ঠাট্টা এসবের বোধও নেই ওর। তবে হ্যাঁ, ওর মগজে একটা জিনিস নিশ্চয়ই ভরে দেওয়া আছে—ওর নিজের গ্রহ নিয়ে হামবড়াই। কথাবার্তায় সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

ওকে যারা বানিয়েছে, সেই বৈজ্ঞানিকেরা বোধ হয় এমন সব নির্দেশ ওর কম্পিউটার-মগজে ভরে দিয়েছেন, যাতে চলনে-বলনে ও ওর নিজের গ্রহের কথা বড়াই করে বলে বেড়ায়।

আবার দেখা হবে, এই কথা বলে, উনিশ-বিশ-এর কাছে বিদায় নিয়ে নিজের আকাশযানের দিকে ফিরে চললেন প্রোফেসর। চিন্তায় এমনই ডুবে গিয়েছিলেন যে, টাইটানের আকাশে পৃথিবী-উদয়ের দৃশ্যও দেখতে ভুলে গেলেন।

রাস্তায় ডক্টর রাওয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। "সার, আপনার জন্য আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।" রাওকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। "রাজারে দেখলাম আপনার রকেট নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উড়ে আসছে। তবে আপনার সঙ্গে আকাশ-দৈত্যের বেশ ভাল আলাপ জমেছে মনে হচ্ছিল সার। যেন আমরা না, ও-ই খবর পাঠিয়ে ডেকে এনেছে।"

"রাও, ও দৈত্য নয়, যান্ত্রিক-মানুষ।" উনিশ-বিশের সঙ্গে আলাপের খানিকটা রাওকে শোনালেন প্রোফেসর। "মনে হয় ওর মাথায় শক্তিশালী একটা কম্পিউটার বসানো হয়েছে। কারণ তা না হলে ও মেমোরিতে কথা ভরার কথা বলবে কেন ? আবার নিজের নাম বলল—সিগনাল-১৯-২০-১৫৫৬।

জানো তো কম্পিউটারে একটা শব্দসঙ্কেতের একটাই মানে হয় এইজন্য ও বলেছিল বাংলায় উনিশ-বিশের নাকি অন্য কী একটা মানে আছে, যেটা ও জানে না। ফোরটোয়েন্টির মানে খুঁজে বার করতেও নাকি ওর বেশ কষ্ট হয়েছে। বলছিল—জাপানি ভাষা নাকি ভাল। জাপানিতে এসব কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। আরে হ্যাঁ, ব্রেন খুলে পড়ার কথা কী বলছিল ও ?"

রাও হাসল, "এক নম্বরের পাজি আপনার ওই উনিশ-বিশ। ওর কাছে একটা হেলমেট আছে। সেটা আর-একজন কারও মাথায় পরিয়ে নিজের মাথার সঙ্গে জুড়ে নেয়। তারপর প্রায় আধঘণ্টা ধরে হেলমেট-এর ভেতর থেকে গুনগুন করে একটা আওয়াজ আসতে

থাকে। মাথার মধ্যে সুড়সুড়ি লাগার মতো একটা মজার অনুভূতি হতে থাকে। আর এর মধ্যেই, একজনের মাথার সব বিদ্যেবুদ্ধি ওর মাথায় চলে যায়। এখানে আসার পর, মিলার, শ্রীনিবাসন আর ওহিরার ওপর ওর এক্সপেরিমেন্ট করা হয়ে গেছে। এই করেই ও বাংলা আর জাপানিটা শিখেছে। শ্রীনিবাসন মোটামুটি কাজ চালানো বাংলা জানে। কিন্তু সার, ওর এক্সপেরিমেন্টের পর ওদের তিনজনের মাথা দারুণ পরিষ্কার হয়ে গেছে। স্মৃতিশক্তি বেড়ে গেছে অনেক গুণ। শ্রীনিবাসন বলছিল, ওর ছ'বছরের জন্মদিনের দিনে ও কী জামা পরেছিল, তাও মনে পড়ে গেছে ওর। আজ সারাদিন কলোনিতে হাসি-ঠাট্টা হইচই চলেছে। ওরা তিনজন স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে একের-পর-এক।"

প্রোফেসরের হাসি পাচ্ছিল শুনে। রাও বলল, "কিন্তু সার, একটা কথা বলবার আছে। যে ব্রেনটা ও খুঁজছিল, সেটা পায়নি। তবে ও এমন একজনকে খুঁজছে যে গ্রহান্তরে সঙ্কেত দেওয়া-নেওয়ার সব কিছু জানে।"

"স্-স্-স্ যদি ভুলে বলে ফেলতাম যে আমি ওই বিষয়ের একজন এক্সপার্ট, তা হলে এতক্ষণে আমার মেমোরি শ্রীনিবাসনদের মতন···"

"হ্যাঁ, সার, আমাদের এ-কথাও বলে গেছে যে, যদি ওকে ভুলভাল কোনও খবর দেবার চেষ্টা করি, তা হলে পাগল না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত হেলমেটটা মাথা থেকে খুলতে দেবে না। অদ্ভুত সব আধুনিক যন্ত্রপাতি আছে ওর কাছে···।"

"মানে, কীরকম?"

"যেমন, সার, আমরা ওর ওপর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের শক্তিশালী প্রভাব দেখাতে যেতেই, ও হাতের তালু থেকেই আরও তীব্র ম্যাগনেটিক ফিল্ড বানিয়ে সবকিছু নষ্ট করে দিল। আমরা ওকে একটা ধাতব জালে জড়িয়ে তুলেও নিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম কোনও গর্তে-টর্তে পুঁতে কবর দিয়ে দেব। কিন্তু ও সঙ্গে-সঙ্গে নিজের শরীর থেকে লেসারের মতো কিন্তু লেসারের থেকেও শক্তিশালী রশ্মি বার করে কয়েক সেকেণ্ডে জাল কেটে বেরিয়ে এল। তারপর অনেকটা ভূমিকম্পের মতো কয়েকটা ঝাঁকুনি দিল। বোধ হয় আমাদের সাবধান করে দিল যে, ওকে জ্বালাতন করলে আরও বড় ধরনের কিছু বিপদ ঘটবে।"

"সব মিলিয়ে মামলা বেশ ঘোরালো মনে হচ্ছে। সাবধানে এগোতে হবে। দেখে-শুনে।"

ডঃ রাওয়ের বাড়ির দরজায় শ্রীমতী গীতা রাও দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্রীমতী রাও নিজেও একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। চায়ের টেবিলেও ওঁরা আকাশ-দৈত্য উনিশ-বিশকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ঠিক হল একটা মিটিং ডাকবেন। যেখানে উনিশ-বিশকে কী করে নিকেশ করা যায় তার উপায় ঠিক করা যাবে।

ডঃ রাও-এর ছেলে সন্দীপ ওর অ্যাটমসফিয়ার স্যুট খুলে ফেলে নমস্কার করে দাঁড়াল।

"কেমন আছিস দিপু?"

"ভাল আছি আঙ্কল। আঙ্কল, জানো, আমি ক্লাস সিক্সে উঠে গেছি। আমাদের টিচিং-মেশিন বলেছে আমি রকেটের মডেল নাকি দারুণ বানাই। কিন্তু আঙ্কল, আপনি তো···"

"হ্যাঁ, বল না, কী আমি?"

"আপনি তো ওখানে সিক্স-সেভেন-এ পড়ান, না?"

"বাঃ, তার বিজ্ঞাপন এখানেও পৌঁছে গেছে বুঝি? পড়াতাম রে, আগে পড়াতাম। এ বছর আর পড়াব না।"

সন্দীপের চোখে উৎসাহ ম্লান হয়ে আসছে দেখে প্রোফেসর বললেন, "বল না, কী বলছিলি?"

"এই, কয়েকটা জিনিস জানবার ছিল।" হাসিমুখে কাছে ঘেঁষে এল সন্দীপ। ডঃ রাও হেঁকে উঠলেন, "এই আঙ্কল আকাশ-দৈত্যের সমস্যা আগে মেটাবেন না তোকে পড়াবেন?"

"আঃ, রাও, তোমার মিটিং-এর তো এখনও একঘণ্টা দেরি। ততক্ষণ পড়ুক না ও। বল রে দিপু, কী বলছিলি?"

"কিছু না আঙ্কল, স্যাটেলাইটের ওপর একটা প্রশ্ন ছিল—পরে জেনে নেব'খন।" বাংলার পাঁচের মতো মুখ করে দিপু টেবিলে গিয়ে দোসা খেতে লাগল।

ল্যাবরেটরির কনফারেন্স হল-এ মিটিং-এর জন্য সবাই এসে পৌঁছেছে। অভিযান বিশেষ ভূমিকা না করেই বললেন, "বন্ধুগণ, মহাকাশের এই নতুন জীব আমাদের সামনে এক বিরাট বিপদ। যদিও এখনও বিশেষ কিছু করতে পারেনি, তবে চাইলেই আমাদের যে-কোনও ক্ষতি করতে পারে। ওকে যত শিগগির সম্ভব অকেজো করে দিতে হবে। আমার ধারণা, ও একটা খুব উন্নত ধরনের যন্ত্র-মানুষ। তবুও, এই ধারণা সত্যি না মিথ্যে জানবার জন্য শ্রীনিবাসনের সঙ্গে ওকে এক দান দাবা খেলায় বসাতে হবে।"

"তার দরকার নেই প্রোফেসর। আমি আর-একটা জিনিস জানি, যাতে নিশ্চিত বলতে পারি, ও যন্ত্রই, আর কিছু নয়।" ওহিরা বললেন।

"কী জিনিস?" সবাই ওহিরার দিকে উৎসুক ভাবে চেয়ে আছে। "সার, কথায় কথায় ডঃ রাও উনিশ-বিশকে হাড়বজ্জাত বলেছিলেন। শুনে খানিকক্ষণ একদম চুপ হয়ে গেল ও। তারপর বলল, "হাড় আবার বজ্জাত? এর মানে কী? আমার মেমোরিতে তো খুঁজে পাচ্ছি না, কোথাও হারালো নাকি? কম্পিউটার এমন কথা বলতে পারে। তা ছাড়া, বাংলা ও শিখেছে শ্রীনিবাসনের ব্রেন থেকে। শ্রীনিবাসন নিজেও হাড়বজ্জাত মানে জানে না।"

"সার, উনিশ-বিশ নিশ্চয়ই রোবো। তা হলে ওর মাথায় ইলেকট্রনিক সার্কিট তো থাকবেই। সার্কিটে বিদ্যুৎপ্রবাহ বইছে। আমরা চেষ্টা করলে তীব্র বৈদ্যুতিক ফিল্ড তৈরি করে ওর মাথাটা খারাপ করে দিতে পারি।" চেস্লোভ বলল।

"আমিও সেরকমই ভাবছিলাম।" অভিযান বললেন, "আমি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি করার যন্ত্রও নিয়ে এসেছি সঙ্গে। কিন্তু ছোট্ট একটা মুশকিল আছে। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সবচেয়ে বেশি তীব্র হতে খানিকটা সময় লাগে। সেইটুকু সময়ের ভিতরে যদি ও বুঝতে পেরে যায়, আমরা কী করতে যাচ্ছি, তা হলে···? আর কিছু না হোক, ডজনখানেক ভূমিকম্প করে তারপর ছাড়বে।"

শ্রীনিবাসন উৎসাহ ভরে বলল, "আচ্ছা, ওকে দাবা খেলে-খেলে পাগল করে দেওয়া যায় না? এমন সব প্যাঁচালো চাল মারব যে, ভাবতে ভাবতে ওর মগজের সার্কিট কোথাও না কোথাও জ্যাম হয়ে যাবে?"

"পাগল নাকি?" শ্রীমতী রাও বলে উঠলেন, "এমন কখনও হতে পারে? দাবার খেলার নিয়ম তো ওর জানা। খানিকক্ষণ বাদে যখন মগজ হাতড়ে কোনও চাল পাবে না, তখন নিয়মের হিসেবেই কিছু একটা চাল দেবে। ওর উন্নত মগজের কাছে এটা এক কি দু' মিনিটের ব্যাপার।"

"ঠিক আছে," শ্রীনিবাসন দমে না, "অন্তত দাবা খেলে খানিকক্ষণ তো ওকে ভুলিয়ে রাখা যাবে। ততক্ষণে যদি বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র চালু করা যায়, তবে···"

"সেটা অবশ্য করা যায়। তবে একটা উপায়ের আশায় বসে থাকলে চলবে না আমাদের। আরও দু'-একটা উপায় ভাবতে হবে।"

"সার, আমার একটা প্ল্যান ছিল।" আমেরিকান রকেট-বিশেষজ্ঞ

রবার্ট এগিয়ে এল, "আমরা তো ওকে পৃথিবীতে নিয়ে যাব বলে রকেটে বসাতে পারি, তারপর মাঝরাস্তায় রকেট বম্বিং করে উড়িয়ে দিলেই হল। এতে পাইলটের জীবন অবশ্য বাঁচবে না, তবে প্রয়োজন হলে আমি পাইলট হতে রাজি আছি স্যার।"

গভীর প্রশংসার দৃষ্টিতে সবাই রবার্টের দিকে দেখল। রবার্ট কিন্তু গম্ভীর।

"আর-একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে।" ওহিরা বলল।

"কী সমস্যা?"

"আমি যদি উনিশ-বিশ হতাম, তা হলে আগেই ব্রেন খুলে পাইলটের উদ্দেশ্যটা কী, জেনে নিতাম। তবে অন্য কোনও রাস্তা না থাকলে আমাদের এটাই করতে হবে। বিপদ সত্ত্বেও।"

"মাই গড, এই দিকটা তো আমরা এতক্ষণ ভেবেই দেখিনি।" ডঃ রাও এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার মুখ খুললেন। "ওর মাথায় যদি আমাদের সবার ব্রেন খুলে পড়ার খেয়াল চাপে, তবে তো কথাই নেই! একাই আমাদের নিকেশ করে ও পৃথিবীর দিকে চলে যাবে!"

সবার গায়ে এবার কাঁটা দিয়ে উঠল। অপ্রিয় হলেও ডঃ রাওয়ের কথায় জোর ছিল। আকাশযান চালানো যদি একবার জেনে যায়, উনিশ-বিশ অনায়াসেই পৃথিবীতে পৌঁছে যেতে পারবে, আর নিজের ক্ষমতায় ওখানকার বিজ্ঞানীদের বশ করে বাধ্য করবে নিজের গ্রহে খবর পাঠাতে। অভিযানের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। একটাই রক্ষে, এখনও পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা গ্রহান্তরে সঙ্কেত পাঠানোর বিজ্ঞান ভাল করে রপ্ত করেনি।

নিজেকে সামলে নিয়ে ডঃ অভিযান বললেন, "বন্ধুগণ, রাও যা বলেছে, ঠিকই বলেছে। উনিশ-বিশ আমাদের মধ্যে যে-কোনও একজনের ব্রেন যদি পড়ে নেয় তা হলে আকাশযান চালিয়ে পৃথিবীতে ও পৌঁছে যাবেই। সেইজন্য আমাদের মধ্যে একজন কাউকে না বলে রকেটের কয়েকটা যন্ত্রপাতি খুলে নিয়ে লুকিয়ে রাখলে ভাল হয়। যাতে উপায় জানলেও রকেট ও চালাতে না পারে। আর হ্যাঁ, আর-একটা কথা, আমাদের এমন ভান করতে হবে যে, আমরা ওকে সাহায্য করতে চাইছি, যাতে আমাদের ব্রেন পড়ার বা পৃথিবীতে যাবার প্রয়োজনই ওর মনে না আসে।"

অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হল কিন্তু বিশেষ সমাধান কিছু বার হল না। মোটামুটি ঠিক হল, বৈদ্যুতিক-ক্ষেত্রের প্রভাব দিয়ে উনিশ-বিশের মাথাটা অকেজো করে দেবার চেষ্টা করা যাবে।

আকাশযান থেকে প্রোফেসরকে নামতে দেখে হাত নাড়ল উনিশ-বিশ। "এসো, এসো। প্রোফেসর, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আজ ট্রান্সমিটারটা পুরো সারিয়ে নিয়েছি। এখন সিগন্যাল যন্ত্রটা ঠিক করতে তোমার সাহায্য দরকার।"

খবর শুনে প্রোফেসরের মন একদম ভেঙে গেল। কিন্তু মুখে হাসি টেনে এনে বললেন, "অভিনন্দন।" ট্রান্সমিটার দেখে উনি তো থ! এত আধুনিক আর এত শক্তিশালী! এ দিয়ে তো মহাকাশের এক কোনা থেকে অন্য কোনায় সঙ্কেত পাঠানো যাবে! ভাগ্য ভাল যে, সিগন্যাল যন্ত্রটা ভেঙে অকেজো হয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরে যন্ত্রগুলো পরীক্ষা করে প্রোফেসর বললেন, "দ্যাখো উনিশ-বিশ, মনে হচ্ছে, সিগন্যাল যন্ত্রটা নতুন করে তৈরি করতে হবে। তার জন্য আমার একটু সময় দরকার। অবশ্য তোমার ট্রান্সমিটার দেখে আমি তাজ্জব হয়ে গেছি!"

"হেঁ হেঁ," বেশ গর্বের সুরে উনিশ-বিশ বলল, "হবে না কেন? তৈরি কোথায়? আমাদের গ্রহে!"

"'অহঙ্কারেই মরল।" মনে-মনে বললেও, মুখে অভিযান বললেন, "চলো, রকেটের ভিতরে যাই। আমি তোমার সিগন্যাল যন্ত্র নিয়ে কয়েকটা বই দেখে নিই, তুমি ততক্ষণ শ্রীনিবাসনের সঙ্গে বসে

একহাত দাবা খেলে নাও।"

"বেশ, ভালই তো!" উনিশ-বিশ বলল, "দাবা খেলতে আমার ভালই লাগে।"

আকাশযানের মধ্যে শ্রীনিবাসন ছাড়াও স্পেসস্যুট-পরা আরও তিন-চারজনকে দেখে নিল যন্ত্র-মানুষ। কিন্তু অভিযানের আশ্বাসের প্রতিশ্রুতিতে ওর মনে হল, আক্রমণ করার মতো ভুল এরা দ্বিতীয়বার আর করবে না। তবুও দাবা খেলতে বসার আগে নিজের কন্ট্রোলকে অ্যালার্ট করে রাখল ও।

অভিযান একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলেন। শ্রীনিবাসন বেশ কয়েকটা চালু দান দিল। উনিশ-বিশও তার চালু জবাব দিল সঙ্গে-সঙ্গে। এর মধ্যে চেম্ব্রোভ বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র চালু করার মেশিন উনিশ-বিশের শরীরের ওপর ফোকাস করে চালু করে দিয়েছে।

শ্রীনিবাসন এবার যে দানটা দিল সেটা ভারী কঠিন। যন্ত্র-মানুষের খানিকটা সময় লাগল পালটা দান দিতে। এর পরের চাল আরও প্যাঁচালো। যন্ত্র-মানুষের নিজের মেমোরিতে খুঁজে নিল, পেল না। খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে দাবার নিয়মগুলো মেমোরিতে একবার পড়ে নিয়ে দান দিল। এবার বেশ খানিকটা সময় লাগল।

বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের তীব্রতা বেড়েই চলেছে।

পরের দানে শ্রীনিবাসন হাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সময় আঙুলের ধাক্কায় একটা বোড়েকেও আগে নিয়ে গেল। দু'-তিনটে দান দেবার পর যন্ত্র-মানুষের মেমোরিতে হিসেবের গণ্ডগোল হল। ছকের ওপর বোড়ে যেখানে আছে, সেখানে তো ওর থাকার কথা না! নিয়মগুলো মনে-মনে পড়ে নিয়ে পেছনের দানগুলোয় ঘুঁটিগুলো কোথায় কোথায় ছিল আবার মনে করে নিল যন্ত্র-মানুষ। কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে।

বৈদ্যুতিক-ক্ষেত্রের তীব্রতা বাড়তে বাড়তে শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। অভিযান কপালের ঘাম মুছলেন।

খট করে শব্দ হল। নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে যন্ত্র-মানুষ। অভিযান বই থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন ভরা চোখে চাইলেন, যেন কিছুই জানেন না।

"প্রোফেসর অভিযান, আবার তুমি বোকামি করলে। আমার ওপর আক্রমণ করার চেষ্টা করলে...,"

উনিশ-বিশ-এর গলা নির্বিকার।

"তোমরা মানুষেরা বৈদ্যুতিক আর চৌম্বক-ক্ষেত্রের ওপর এতটা নির্ভর কেন করো— আমি তো কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। আমার শরীরের ওপর এদের কোনওই প্রতিক্রিয়া নেই। শব্দতরঙ্গের খেলা দেখতে চাও, যদি দেখতে চাও তো দেখাতে পারি। একবার দেখলে বোধ হয় আমার পেছনে লাগার ইচ্ছেটা আর থাকবে না তোমাদের। আর প্রোফেসর অভিযান, তুমি আমাকে সিগন্যাল-যন্ত্র তৈরি করার সব রাস্তা দেখাবে, এবং এক্ষুনি! চলো!"

কোনও উপায় নেই। আবহাওয়া-টাওয়ারের কাছে সবাইকে ধরে নিয়ে গেল উনিশ-বিশ। টাইটানের মহাকাশ-রাডারও রাখা আছে এই টাওয়ারেই। "এবার দ্যাখো, শব্দ-তরঙ্গ দিয়ে কী করে একটা পুরো বাড়িকে বিধ্বস্ত করে দিই....। এবার আমি শব্দতরঙ্গ বানাব। তার দৈর্ঘ্য বড় থেকে ক্রমশ ছোট হতে থাকবে, ছোট হবার সঙ্গে-সঙ্গে তরঙ্গের লয় বেড়ে চলবে...তারপর পুরো বাড়িটা সেই লয়ের সঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে একসময় ধরাশায়ী হয়ে যাবে...।"

সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। অনেকদিন আগে পৃথিবীতেও এরকম নিয়ম ছিল। সেতুর ওপর সৈন্যরা মার্চ করতে পারবে না। কারণ কখনও কখনও মার্চ করার তালে তালে পুলও কাঁপতে কাঁপতে ভেঙে যেত! কিন্তু এই ব্যাপারটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার কথা কেউ ভাবতে পারেনি।

সবাই বিস্ফারিত চোখে ব্যাপারটা দেখছে। টাওয়ারের নীচের অংশ কাঁপতে আরম্ভ করেছে থরথর করে। উনিশ-বিশ তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াল। টাওয়ারের ওপর দিক এক দিকে হেলে পড়েছে, দেখতে দেখতে ভেঙে পড়ল টাওয়ার।

বেশ আত্মপ্রসাদের সঙ্গে সকলের দিকে একবার দেখে নিল যন্ত্র-মানুষ। তারপর ভাবলেশহীন গলায় বলল, "তা হলে, প্রোফেসর অভিযান, তুমি দু'ঘণ্টার মধ্যে আমার কাজ করছ! না হলে এই শব্দ-তরঙ্গ তোমার ওপর চালু করে দেব।"

সকলের মুখ গম্ভীর। পাশার দান ওলটাল এবার। প্রোফেসর অভিযান কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভেবে চলেছেন। যে করেই হোক, সিগনাল-যন্ত্র বানাবার কাজটা পেছোতেই হবে। ওঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেছে ইতিমধ্যে।

"তোমার যন্ত্রের জন্য দরকার সিলিকন ক্রিস্টাল! কিন্তু এত শক্তিশালী সিগনালের জন্য বেশ বড় সাইজের ক্রিস্টালই দরকার, ৫ সেমি ×৫ সেমি×৫ সেমি।" প্রোফেসর জানতেন, এত বড় সাইজের ক্রিস্টাল বানানো ছেলেখেলা নয়, দশ-পনেরো দিন কম করে লেগে যাবে। তার ভিতরে অন্য কোনও উপায় একটা-না-একটা বেরোবেই।

উনিশ-বিশ-এর মন থেকে সন্দেহ তখনও যায়নি। অভিযানের কাছ থেকে যন্ত্রপাতির সার্কিট বিষয়ে তন্নতন্ন করে জেনে নেবার পর অবশ্য ওকে খানিকটা আশ্বস্ত দেখাচ্ছিল। অভিযান ওকে ল্যাবরেটরির ভেতর নিয়ে গিয়ে ওর সামনে সিলিকন ক্রিস্টাল বানানোর পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। অবশ্য জেনেশুনেই পুরনো একটা টেকনিক নিলেন, যাতে সময় বেশি লাগে।

আজকের ঘটনা সারা কলোনিতে হইচই ফেলে দিয়েছে। অভিযান ফিরে আসার পর চিন্তিত মুখে বৈজ্ঞানিকরা এসে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন ওঁকে।

রাত্তিরে বিছানায় শুতে যাচ্ছেন, এমন সময় সন্দীপ এসে হাজির। উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে ওর দু' চোখ।

"আঙ্কল, আঙ্কল একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"কী কথা...সেই স্যাটেলাইটের?"

"উহুঁ, কিন্তু সেরকমই আর-একটা প্রশ্ন।"

"বলো।"

"আঙ্কল, আজ আমাদের টিচিং-মেশিন বলছিল, একটা স্যাটেলাইটকে যদি টাইটানের চারদিকে ঘোরাতে হয়, তা হলে একটা কক্ষপথে তাকে ছাড়তে হবে। আর টাইটান থেকে একটা নির্দিষ্ট বেগে ছাড়লে তবেই ওটা চারদিকে ঘুরতে থাকবে।"

"হ্যাঁ, দিপু সেটাকেই আমরা বলি মুক্তি-বেগ বা এসকেপ ভেলোসিটি। তুমি তো জানো, মাধ্যাকর্ষণ আছে বলে যদি কোনও জিনিস তুমি উপরে ছুঁড়ে দাও, সেটা নীচে এসে পড়বে। যদি কোনও জিনিস মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্তি পেয়ে ওপরে চলে যায়। আর নীচে না এসে, টাইটানের চারদিকে কেবলই ঘুরতে থাকে, সেটা হয়ে যাবে টাইটানের উপগ্রহ। তোমাদের টাইটান যেমন শনির উপগ্রহ, আমাদের চাঁদও তেমন পৃথিবীর উপগ্রহ।"

"তা হলে আঙ্কল, যদি কোনও জিনিস একবার মাধ্যাকর্ষণ থেকে বেরিয়ে গিয়ে তার কক্ষপথে পৌঁছে যায়।"

"সেটা তো ওখানেই রয়ে যাবে?"

"নিশ্চয়ই, রয়ে যাবেই তো!"

"ফিরে আসবে না?"

"না রে পাগল, আসতে পারবেই না।"

"যদি চায়, তা হলেও ?"

"আরে, চাওয়ার কথা উঠছে কোত্থেকে, জড় পদার্থ !"

"জড় পদার্থ না আঙ্কল, তোমাদের যন্ত্র-মানুষ !"

"ওঃ, আমাদের উনিশ-বিশ কিন্তু সে কক্ষপথে করবেটা কী ?"

"ওঃ হো, কাকু, তুমি কিচ্ছু বোঝো না। যদি ওকে আমরা মুক্তি৺বেগের চেয়ে বেশি বেগে বাইরে পাঠিয়ে দিই তা হলে তো ও আর ফিরে আসতে পারবে না। কেবলই পাক খেতে থাকবে টাইটানের চারদিকে ?"

"ওফ্ এই কথা !" এতক্ষণে মাথায় ঢুকল অভিযানের। বেজায় হাসি পেল ওঁর, আর হাসতে-হাসতে চোখে জল এসে গেল প্রায়। "কিন্তু দিপুসোনা বেড়ালের গলায়, ঘণ্টাটা বাঁধবে কে ? আমরা ওকে ধরে বাইরে ফেলে দেবার আগে ও-ই তো আমাদের ঘণ্ট বানিয়ে দেবে !"

দিপুর শুকনো মুখ দেখে ওঁর খারাপ লাগছিল। এমন করে হাসাটা উচিত হয়নি। ওর ছোট্ট মাথার হিসেবে উপায়টা মন্দ অবশ্য বাতলায়নি দিপু। শুধু উনিশ-বিশকে ধরতে পারা··"

দিপু চলে যাবার পর অনেকক্ষণ বিছানার ওপর বসে রইলেন প্রোফেসর অভিযান। ওঁর ঘুম আসছিল না। দিপুর কথাগুলো মনের মধ্যে ঘুরে-ফিরে আসছিল—যন্ত্র-মানুষটাকে যদি বাইরে কোনওমতে ছুঁড়ে ফেলা যায় ? ভাবছিলেন। মজার অনেকগুলো সমাধান মনে আসছিল, তার মধ্যে একটা হল—যদি ও নিজেই যাবার জন্য তৈরি হয় ? নিজেই তৈরি হয় ? নিজের ছেলেমানুষিতে খানিকটা হাসিও পাচ্ছিল। হঠাৎ চিন্তার ওপর ব্রেক্ এসে পড়ল। "কেন রাজি হবে না !"

চিন্তার প্রবাহ দ্রুত বয়ে যাচ্ছিল ওঁর মাথার মধ্যে। শেষে স্লিপিং-স্যুট পরে 'ইউরেকা, ইউরেকা' বলতে বলতে ডঃ রাও-এর রুমে আর্কিমিডিসের মতো আনন্দে আত্মহারা হয়ে দৌড়লেন।

উনিশ-বিশের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে অভিযান জানতে পেরেছিলেন, ওদের গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের শক্তি টাইটানের প্রায় ৫০০ গুণ বেশি। কাজেই ওদের গ্রহে যে এসকেপ-ভেলোসিটি বা মুক্তি-বেগে রকেট ছোঁড়া হয়, সেটা টাইটানের রকেটের মুক্তি-বেগের ঢেরগুণ বেশি। সুতরাং যদি ওকে এমন একটা মুক্তি-বেগে লাফ মারানো যায়, যেটা টাইটানের মুক্তি-বেগের থেকে অনেক অনেক বেশি—তা হলে চিরদিনের মতো ও টাইটানের মাধ্যাকর্ষণের বাইরে চলে যাবে। আর টাইটানের চারপাশেই ঘুরতে থাকবে।

"কিন্তু লাফ কেন দিতে যাবে আমাদের যন্ত্র-মানুষ ?" ডঃ রাও-এর গলায় হঠাৎ ঘুম ভাঙা জড়িমা।

"সেটাও ভেবে দেখেছি বইকী। ওর মাথায় ভর্তি নিজের গ্রহের হামবড়াই। সেটাই ব্যবহার করতে হবে। কথায়-কথায় ওকে পৃথিবীর সভ্যতা, খেলাধুলোর মান, তারপর হাই জাম্প লং জাম্প-এর কথা শোনাব। ও নিশ্চয়ই নিজের গ্রহের কথা লম্বা-চওড়া করে বাড়িয়ে বলতে থাকবে !"

"তারপর আপনি ওকে বলবেন লাফ দিয়ে দেখাতে। তাই না ?" গীতা রাও বুঝতে পেরেছেন কথাটা। "সার, আপনি উপায়টা বার করেছেন ভালই···। অনেকগুলো 'কিন্তু' এরমধ্যে থাকলেও কপাল ঠুকে দেখা তো যাক্। তবে ওকে লাফাতে বলার আগে একটা কথা নিশ্চয়ই জুড়ে দেবেন—'মনে করো, তুমি নিজের গ্রহে আছ।' যদি একবার ওর মাথায় ঢোকানো যায় যে ও নিজের গ্রহে আছে, তা হলে টাইটানের মাধ্যাকর্ষণের শক্তি সম্বন্ধে জানলেও সেটাকে ও হিসেবের মধ্যে নেবে না।"

"মনে করো তুমি নিজের গ্রহেই আছ···" বলতে গিয়ে অভিযানের

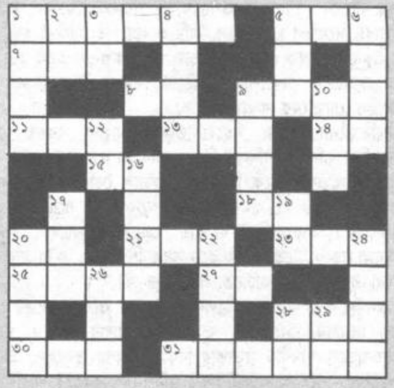

সংকেত : পাশাপাশি : (১) বেঁচে থাকার জন্য যা করতে হয়, তবে এটা সহজ সরল হলেই ভাল। (৫) পেঁচা। (৭) বলীবর্দ। (৮) কর্ণ যে-বিশেষণে বিখ্যাত। (৯) ত্রিফলার এক ফল। (১১) যে-আঙুল শাসন করে। (১৩) ঢাকাই হলে খাস্তা। (১৪) দৈত্যরাজ, এঁর দর্প চূর্ণ করেছিলেন বিষ্ণু। (১৫) শিব যাদের পতি। (১৮) বাংলাতেও এর সংখ্যা যত ইংরেজিতেও তত। (২০) শত্রুতা। (২১) বাচ্চা। (২৩) ডাহুক পাখি। (২৫) আফ্রিকার মরুভূমি। (২৭) অর্জিত। (২৮) জ্ঞাত। (৩০) এর খোঁচাকে অনেকেই ভয় পায়। (৩১) জলসা।

উপর-নীচ : (১) বেঁচে থেকেও যে মৃতকল্প। (২) শক্তি। (৩) সিন্ধু কিন্তু গঙ্গা নয়। (৪) আপসোস। (৫) '—বিহনে কার পূরে মনোরথ।' (৬) পৌরাণিক যুদ্ধকাহিনীমূলক নাচ। (৯) দক্ষিণ-আমেরিকার মরুভূমি। (১০) শুকনো ফুল, মসলারূপে যার ব্যবহার। (১২) কদম। (১৬) সুর করে ছড়া কেটে এই দুজনের দ্বন্দ্ব। (১৭) উচ্চের দাদা। (১৯) সব সময়। (২০) বিকেলবেলার। (২২) শ্রুতিলেখক। (২৪) তাসের চিহ্ন-বিশেষ। (২৬) কথায় বলে, ইনি নড়লেও এঁর হুকুম নড়ে না। (২৮) হাঁটু। (২৯) ভক্তি বা মনোযোগ।

গত সংখ্যার সমাধান

অ	স	ম	ত	ল				অ	ভী
প	রা	ন		ট	ক		পা		ম
রা		প	ণ	ব		সু	রা	সু	র
জি	নি	স		হ	ল	ফ		শ্রু	তি
ত		ন্দ		র		লা		ত	
	বে		মা		ম		ন		ছ
ব	হু		সু	রা	হা		বা	জে	ট
হ	লা	হ	ল		ম	নি	ব		প
মা		য়		মি	হি		জা	ব	র
ন	গ				ম	য়	দা	ন	ব

রঞ্জন

বুকটা কেঁপে গেল। এখন ওঁরা টাইটানের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে। পাহাড়ের ওপর যাবার পরামর্শ সকালের মিটিং-এ চেস্লোবই দিয়েছিল। বলেছিল, "যদি ও লাফাতে রাজি-ই হয়, তবে যত উঁচু থেকে লাফ দেয়, ততই ভাল। ওর কক্ষপথ ততই দূরে হবে আর আমাদের দেখাশোনার বাইরেই থাকবে।" অন্যরাও সায় দিয়েছিল চেস্লোবের কথায়।

অভিযানের কথায় সহযোগিতার মনোভাব বুঝতে পেরে উনিশ-বিশ খানিকটা নিশ্চিন্তই ছিল। বোধ হয় কালকের ধমকে কাজ হয়েছে। অভিযান ওকে সিলিকন ক্রিস্ট্যাল তৈরির কথা বললেন সিগনাল যন্ত্রের মেরামত নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সবিস্তারে বোঝালেন। "আর ক'দিনই বা আছ", প্রোফেসর বললেন, "তোমার সিগনাল যন্ত্রও তো তৈরি হয়ে যাবে শিগ্‌গিরই, ক'টা দিন যদি আমরা বন্ধুর মতো কাটাতে পারি মন্দ কী?"

অনর্গল কথা বলে চলেছিলেন অভিযান। ওকে পাহাড়ের ওপর নিয়ে চললেন, টাইটানের ভূগোল বোঝাবার জন্য। পাহাড় চড়তে-চড়তে পৃথিবীর সভ্যতার বিকাশের কথা তুললেন, তারপর খেলাধুলো, শেষে অ্যাথলেটিকস্। উনিশ-বিশ বুঝতেই পারছিল না পৃথিবীর মানুষেরা এসব নিয়ে এত মাথা কেন ঘামায়। "লাফানোর কথাই ধরো। ওতে আছেই বা কী? কতটা উঁচু লাফাতে হবে তুমি জানো। বায়ুমণ্ডলের প্রতিরোধ বা রেজিস্ট্যান্স জানো। এই দুটোর ওপর ভিত্তি করে প্রাথমিক গতিটা (ইনিশিয়াল-ভেলোসিটি) কষে নাও। পা দুটোকে তোলো। লাফ দাও।" সেইজন্য অভিযান যখন হাই জাম্পের, লং জাম্পের সব রেকর্ডের কথা ওকে শোনাচ্ছিলেন, ওর হাসিই পাচ্ছিল। তবে কার গ্রহ বেশি এগিয়েছে, তাই নিয়ে কথা! উনিশ-বিশ বলল, "আমাদের গ্রহে তো আমরা তোমাদের চেয়ে দশগুণ উঁচু লাফ দিতে পারি।"

অভিযান অবাক হবার ভান করে বললেন, "হাই জাম্প দিয়ে দেখালে অবশ্য বোঝা যাবে!"

"হুঁ হুঁ, লাফ তো হাজার গুণ উঁচুই দিতে পারি, কিন্তু পৃথিবীর লোকেদের দেখানোর জন্যে একশোগুণ উঁচুই যথেষ্ট।" কথা বলতে বলতে ওঁরা পাহাড়ের চূড়ায় এসে পৌঁছেছেন।

"মনে করো তুমি নিজের গ্রহে দাঁড়িয়ে আছ।" অভিযানের বুক ঢিবঢিব করছিল। "এখান থেকে ২০০০ মিটার উঁচু আর ৩০০০ মিটার লম্বা লাফ দাও তো দেখি!"

সঙ্গে-সঙ্গে উনিশ-বিশ-এর মাথা 'স্টার্ট'-এর অবস্থায় চলে গেল। নিজের গ্রহে দাঁড়িয়ে থাকা। নিজের গ্রহের বায়ুস্তর প্রতিরোধ শক্তি। তারজন্য প্রাথমিক গতি। পা দুটোকে কত শক্তিতে কোন কোণ থেকে ওপরে তুলতে হবে। ও জানতে পারছিল না যে, ওর চারপাশে সযত্নে লুকনো বাইনোকুলারে চোখ রেখে বৈজ্ঞানিকরা নিশ্বাস বন্ধ করে এক আশ্চর্য ঘটনার জন্য অপেক্ষা করে আছেন!

"আমি দশ থেকে উলটো গুনছি? ও. কে.?"

অভিযান বললেন, "সাত ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক...জাম্প!"

সঙ্গে সঙ্গে তীরের মতো বেগে যন্ত্র-মানুষকে ওপরে উঠে যেতে দেখলেন অভিযান। বেগ দেখেই বুঝলেন, নিজের গ্রহের হিসেবেই লাফ দিয়েছে ও। খুশিতে গলার কাছটা ব্যথা-ব্যথা করছিল ওঁর।

দিপু আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আজ ও কলোনির হিরো, কনফারেন্সের মধ্যেই অভিযান ওকে কাঁধে তুলে বসিয়ে ছিলেন। দিপুকে প্রমিস করেছেন, এবার থেকে সিক্স আর সেভেনে ফিজিক্স পড়াবেন, বন্ধ করবেন না। ফিরে গিয়েই চৌধুরীসাহেবকে জানিয়ে দেবেন, আর, সব ক'টা লেসন্ দিপু-কে পাঠিয়ে দেবেন টাইটানে।

দিপুর করুণ মিনতি, "আঙ্কল, তুমি নিশ্চয়ই পড়াবে..."

উনি মন থেকে মুছতে পারছিলেন না। পৃথিবীতেও এমন এক সন্দীপ হয়তো এমন সমস্যার সমাধান বার করবে একদিন! সমবেত করতালির মধ্যে টাইটানের নতুন উপগ্রহের নাম রাখা হল 'সন্দীপ'।

অভিযানের সাফল্যের খবর পৃথিবীতেও পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে। ওখানে ওঁকে অভ্যর্থনা জানানোর তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেছে। দিপুকে স্কুলের ছুটিতে পৃথিবীতে আসার নিমন্ত্রণ দিয়ে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আকাশযানে বসলেন অভিযান। প্রোফেসর গাসকে ওঁর আসার খবর আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। ফ্লাইট শুরু হবার ক' মিনিট পর অটোমেটিক সিস্টেমের হাতে আকাশযানকে সঁপে দিয়ে আরামে চোখ বুঝলেন উনি।

অ্যালার্মের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ওঁর ঘুম ফালাফালা করে দিয়ে গেল। কন্ট্রোল-রুমের বাইরে লাল আলো জ্বলে উঠেছে—স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে সবুজ অক্ষর—"তীব্র চৌম্বক-ক্ষেত্র—পুরনো সমস্যা—সমাধান হচ্ছে না—বিপদ!"

অভিযানের বুক ধড়াস করে উঠল। আবার উনিশ-বিশ! টিভি-ক্যামেরা অন করে চোখ বোলালেন উনি।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যন্ত্র-মানুষকে, টাইটানের চার-পাশে ঘুরে চলেছে সে। ওরই দিকে অসহায়ভাবে ভেসে চলেছে রকেট। ওর হাতে রকেট একবার পড়া মানে, সব গেল! একমুহূর্তের মধ্যে অভিযান ভেবেছিলেন, কী করবেন। তারপর পৃথিবীতে শেষ মেসেজ পাঠিয়ে দিলেন, "রকেটকে যন্ত্র-মানুষের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে ভেঙে দিচ্ছি। নিজেও শহিদ হতে চললাম, বিদায়।"

উনিশ-বিশ-এর কাছে এটাই ছিল শেষ চেষ্টা। ওর ভিতর ব্যাটারি সব দ্রুত শেষ হয়ে আসছিল। সব শক্তি বড় তাড়াতাড়ি খরচ করে ফেলেছে ও। রকেটটা কব্জা করতে পারলে পৃথিবীতে পৌঁছনো যায়। আকাশযান ধীরে-ধীরে আসছে ওর দিকে। হয়তো অভিযান উলটো দিকে ওটাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন প্রাণপণে।

এবার রকেট মাত্র দু'শো মিটার দূর। অভিযান হঠাৎ স্পিড বাড়িয়ে দিলেন। রকেট-এর মুখ ঘোরালেন যন্ত্র-মানুষের দিকে। অ্যাকসিলারেটর সবচেয়ে বেশি গতিবেগে এসে থরথর করে কাঁপছে, অভিযান উলটো দিকে গুনছেন—চার...তিন...দুই...এক...।

ধড়াম! একটা প্রচণ্ড শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন অভিযান। আরে! উনি তো নিজেরই ঘরে, পৃথিবীতে। অ্যালার্ম ঘড়িতে সাড়ে চারটে বেজেছে, কফির জল ফুটে এল, অটোমেটিক মেশিনে জলের তাপমাত্রা দেখা যাচ্ছে।

তা হলে টাইটন...যন্ত্র-মানুষ...ধাক্কা...? কী আশ্চর্য এই স্বপ্ন! পুরো স্বপ্নটাই চৌধুরীকে 'না' বদলে 'হ্যাঁ' বলার জন্যে ছিল না কি? দিপুকে স্বপ্নে যে প্রমিস করেছিলেন— মনে ছিল ওঁর। চৌধুরীর নম্বর ডায়াল করলেন উনি।

স্ক্রিনে অভিযানের মুখ দেখে চৌধুরী তো অবাক। "প্রোফেসর...এত সকালে?"

"হ্যাঁ। শোনো। এ-বছরও আমি পড়াতে আসব। আজ ল্যাবরেটরিতে এসো। বাকি কথা সেখানে হবে। আর, ডঃ রাও-এর ছেলেকে থ্যাংকু বোলো। ওর জন্যেই আমি মত পালটালাম।"

"কিন্তু ...সন্দীপ সে তো টাইটানে...?"

চৌধুরীসাহেবকে হতভম্ব অবস্থায় রেখেই অভিযান ফোন নামিয়ে রাখলেন। দারুণ খুশি-খুশি লাগছিল ওঁকে। অবশ্য কারণের মাথামুণ্ডু না বুঝেই, চৌধুরীরও ভীষণ ভাল লাগছিল।

অনুবাদ : অনিতা অগ্নিহোত্রী

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

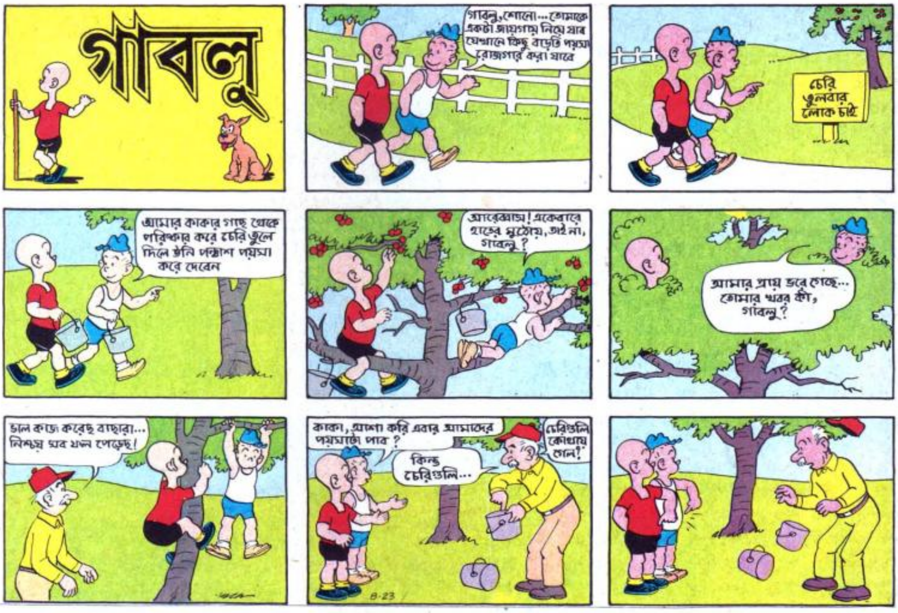
গাবলু
গাবলু, শোনো… তোমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে কিছু বাড়তি পয়সা রোজগার করা যাবে
চেরি তুলবার লোক চাই
আমার কাকার গাছ থেকে পরিষ্কার করে চেরি তুলে দিলে উনি পঞ্চাশ পয়সা করে দেবেন
আরেব্বাস! একেবারে হাতের মুঠোয়, তাই না, গাবলু?
আমার প্রায় ভরে গেছে… তোমার খবর কী, গাবলু?
ভাল কাজ করেছ বাছারা… নিশ্চয় সব ফল পেড়েছ!
কাকা, আশা করি এবার আমাদের পয়সাটা পাব?
কিন্তু চেরিগুলি…
চেরিগুলি কোথায় গেল!
8-23

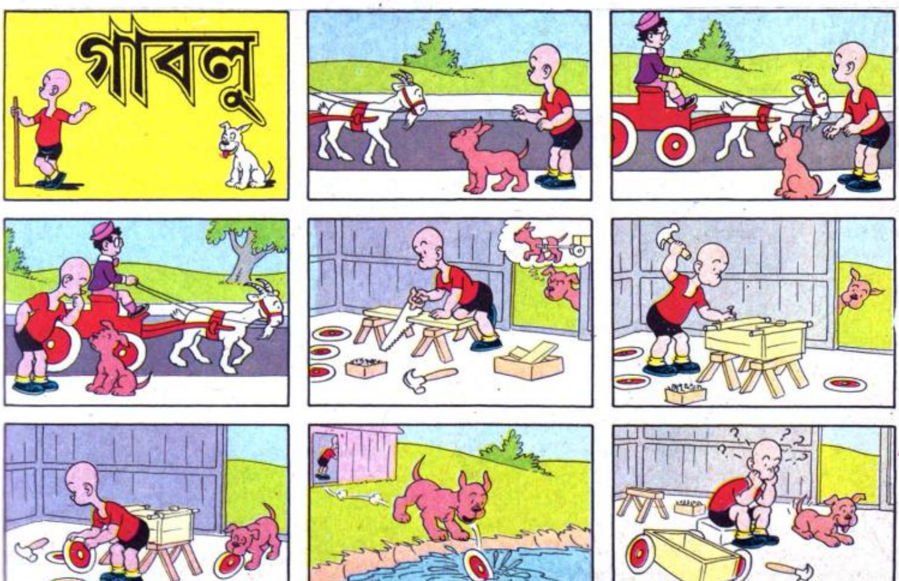
গাবলু
6-7

গোয়েন্দা তাতারের দ্বিতীয় অভিযান

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সেদিন দুপুরে ছোট্ট টিঙ্কুটা তাতারের ঘরে একবার উঁকি দিয়েই পাশের ঘরে ওর মায়ের কাছে ছুটে গেল। নন্দা দেবী তখন গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিলেন। টিঙ্কু গিয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, "মা! তুমি যে বলো দাদার চোখে ঘুম নেই। তা দ্যাখো একবার দাদার কীর্তিটা।"

"কেন রে! কী হয়েছে?"

"দ্যাখোই না।"

নন্দা দেবী মেয়ের কথায় পাশের ঘরে গিয়ে দেখেন, খাটের ওপর উপুড় হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে এমনভাবে ঘুমোচ্ছে তাতার যে, আর-একটু নড়াচড়া করলেই টিপ করে পড়ে যাবে ও। মায়েদের যা কাজ, তাড়াতাড়ি গিয়ে ছেলের গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন শরীর খারাপ করেছে কি না। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের মনেই বললেন, "না। গা তো ভালই আছে দেখছি। যাক গে, ঘুমোক। কোনওদিন

তো ঘুমোয় না, আজ একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকিস না যেন।" বলে ছেলেকে একটু সরিয়ে নিরাপদ দূরত্বে শুইয়ে দিলেন।

যেই না দেওয়া অমনি নড়াচড়া পেতেই ঘুম ভেঙে চোখ মেলে তাকাল তাতার। তারপরই ঝেড়ে উঠে বসল। দু' হাত টান করে হাই তুলে চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে এক লাফে খাট থেকে নেমেই ঢুকে পড়ল বাথরুমে।

মা বললেন, "হয়ে গেল ঘুম ?"

তাতার সে-কথার উত্তর দিল না। একটু পরেই আবার এসে বিছানায় উপুড় হয়ে শুল। তারপর পিছনের পা দুটো মুড়ে দোলাতে-দোলাতে বলল, "আচ্ছা মা, এখন সকাল না বিকেল ?"

"ওমা ! এ কী কথা ? এখন তো বিকেল।"

"আমি তো দুপুরে ঘুমোই না। তাই ঘুম ভাঙতেই বাথরুমে গিয়ে দাঁত মাজার ব্রাশটা নিয়ে দাঁত মাজতে গেছি। তারপর হঠাৎই মনে হল আমি বোধ হয় ভুল করছি। এখন তো সকাল নয়। খুব বোকা বনে গেছি, কী বলো ?"

"বোকাই তো। তুই আবার চালাক কবে থেকে হলি ? এখন দুপুরও ঠিক নয়, বিকেলও নয়, সবে আড়াইটে বাজে।"

এমন সময় পিয়নের গলা শোনা গেল, "চিঠি।"

তাতারের আগে টিঙ্কুই ছুটে গেল। তারপর একটা খাম এনে মায়ের হাতে দিয়ে বলল, "কার চিঠি মা ?"

"খুলে দেখি আগে ?"

নন্দাদেবী খাম ছিঁড়ে চিঠি বার করে পড়লেন। তারপর খুশি-খুশি মুখে বললেন, "সত্যি ! কতদিন পরে জামাইবাবুর চিঠি পেলাম।"

তাতার বলল, "কী লিখেছেন একটু পড়ে শোনাবে ?"

"জামাইবাবু লিখেছেন, আমাদের সবাইকে একবার অতি অবশ্যই ওঁদের ওখানে যেতে।"

টিঙ্কু বলল, "যাবে মা ?"

"আমার ইচ্ছাতেই কি ইচ্ছা ? তোর বাপি ঠিক একটা-না-একটা অজুহাত দেখাবেন। তা ছাড়া যাব বললেই যাওয়া যায় না। আজকাল ট্রেনের যা অবস্থা, তাতে রিজার্ভেশন পাওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার।"

তাতার অভিমানের সুরে বলল, "এত লোকে পায় আর আমাদের বেলাতেই অসম্ভব ?"

"অসম্ভব কেন হবে ? টিকিট এবং রিজার্ভেশন দুই-ই পাওয়া যাবে। তবে কাল যাব বললেই তো পাওয়া যাবে না। যেদিনের পাওয়া যাবে সেদিনেই যেতে হবে। সেটা দশ দিন পরেও হতে পারে আবার এক মাসও লাগতে পারে।"

"আমাদের খুব কাশী যেতে ইচ্ছে করে মা। তোমাদের মুখে কত গল্প শুনেছি কাশীর। কিন্তু তোমরা একবারও আমাদের কাশীতে নিয়ে গেলে না।"

টিঙ্কু বলল, "কাশী কী রে দাদা, বেনারস বল।"

তাতার ভেংচি কাটল।

মা বললেন, "ওই কাশী-বেনারস একই ব্যাপার। যে কাশী সেই বেনারস। সেই বারাণসী।

তাতার বলল, "কাশীতে অনেক বাঁদর আছে। তাই না ?"

"বাঁদর তো আমার ঘরেও আছে।"

"কী হচ্ছে কী ? তুমি শুধু ওইসব বলে আমাদের ভুলিয়ে দিতে চাইছ। আসলে নিজেরা তো গেছ, তাই আর যাবার ইচ্ছেটাই নেই।"

"আমার যাবার ইচ্ছে ঠিকই আছে বাবা। কিন্তু আমি তো তোদের নিয়ে যাব না।"

"তুমি তা হলে বাপিকে বুঝিয়ে বলো।"

"দেখি না, ও অফিস থেকে আসুক। চিঠিটা দেখাই। তারপর কী বলে দেখি।"

"তুমি যেভাবেই হোক বাপিকে রাজি করাও।"

"আচ্ছা রে, আচ্ছা।"

নন্দাদেবী ছেলে-মেয়েদের জলখাবারের ব্যবস্থা করে কেটলিতে চায়ের জল চাপালেন। আর তাতার বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কল্পনার চোখে ছবিতে দেখা কাশীর গঙ্গার ঘাটগুলোকে অনুভব করতে লাগল।

বিকেলে জলখাবার খেয়ে দেবু ও শঙ্কুকে নিয়ে তাতার চলল সোনাইদের বাড়ি। বাড়ি তো নয়, ছিটেবেড়ার ঘর একখানি। খুব গরিব লোকেদের বস্তি। এখানে ভালমন্দ কতরকমের লোক থাকে। সেই বস্তিতে অমন লাল টুকটুকে সোনাই যেন পাঁকের পুকুরে পদ্মফুল। সোনাই বড় একা। ওর আব্বাজান এখনও জেলে আছে। আব্বাস খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছে। কবে ছাড়া পাবে কে জানে ? তবে তাতার কথা দিয়েছে ওর আব্বাজানকে। বলেছে, "সোনাই আমাদের বোন। ওকে আমরা দেখব।" তা সেই কথার ভিত্তিতেই তাতার রোজ এসে সোনাইয়ের খোঁজ-খবর নেয়। তাতার অবশ্য একা আসে না। শঙ্কু, দেবু—সবাই আসে।

তা ছাড়া সোনাই মেয়েটিও তো খুব ভাল। যেমন ফুলের মতো ফুটফুটে, তেমনই মিষ্টি কথাবার্তা। সোনাইকে তাই সকলেই খুব ভালবাসে। অবশ্য সোলেমানের সঙ্গে যে দু-একজনের শত্রুতা আছে, তারা ছাড়া। সোনাইকে লোকে ভালবাসবে না-ই বা কেন ? সোনাই যখন হাসে, তখন ওর হাসিতে মুক্তো ঝরে। সোনাই যখন দড়ির ওপর দিয়ে চলে তখন মনে হয় যেন একটা পরি মেঘের স্তর ভেদ করে ডানা মেলে উড়ে আসছে। তবে সোনাই একেবারে নিঃসঙ্গ না হলেও খেলা দেখাবার সময় একটু অসুবিধে অনুভব করে ও। ওর ডুগডুগির তালে-তালে সোলেমানের ঢোলের কসরত দেখাবে কে ? ডগার ও মালিনী ওর সঙ্গে আছে। কিন্তু ওরা তো ঢোল বাজাতে পারে না। তাতার, শঙ্কু, দেবু আছে। তারা ঢোলের কী জানে ? কাঠি দিয়ে পিটলেই হল না। তাল, লয় ঠিক রাখতে হবে। বোল জানতে হবে। দিনের পর দিন রেওয়াজ করতে হবে। তবে না ঢোলের বোলে বাজনার ফুল ফুটবে। সোনাই তাই ডগার, মালিনীকে নিয়ে বিনা বাদ্যিতেই খেলা দেখায়। খেলা দেখানোর সময় হিসেবে দুপুরের দিকটাই বেছে নিয়েছে ও। বিকেল হলেই রেলবাঁধে বসে তাতার, শঙ্কু-দেবুর প্রতীক্ষা করে।

তাতারেরা কথা বলতে-বলতেই আসছিল। তাতার বলছিল, "জানিস, আমরা হয়তো খুব শিগগির কাশী যাব।"

দেবু বলল, "তাই নাকি ? কবে ?"

"সেটা ঠিক বলতে পারছি না। আজ আমার মেসোর চিঠি এসেছে। তাতে আমাদের সবাইকে যেতে লিখেছেন। এখন দেখি বাপির কবে সময় হয়।"

শঙ্কু বলল, "তোর বেশ আনন্দ। কেমন রেলগাড়ি চাপবি। কাশী যাবি। তোর কেমন মেসোমশাই আছেন। আমার কেউ নেই রে।"

দেবু বলল, "আমি অবশ্য খুব ছেলেবেলায় একবার দেওঘর গিয়েছিলাম।"

"কতদিন আগে ?"

"সে অনেকদিন আগে। আমার তখন ছ' মাস বয়েস।"

তাতার, শঙ্কু দু'জনেই হেসে উঠল, "এটা কি যাওয়া হল ? এখন তোর চোদ্দ বছর বয়েস। সেই সাড়ে তেরো বছর আগে..."

ওরা তখন রেলবাঁধের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

রেলবাঁধের ওপর ডগার, মালিনী ও সোনাইকে প্রতীক্ষারত দেখা

গেল। ডগার ও মালিনী দেখতে পেয়েই ছুটে এল ওদের কাছে।

ডগারের সঙ্গে এখন দারুণ বন্ধুত্ব ওদের। আর তেমনই ভাব মালিনীর সঙ্গে। মালিনী তো আগে সবার কোলে-কাঁধে উঠবে। তারপর সকলের কাছে আদর খেয়ে ডগারের পিঠে চেপে গলা জড়িয়ে বসে থাকবে। কখনও বা ফটাফট হাতে তালি লাগাবে। ডিগবাজি খাবে। কত কী যে করবে তার ঠিক নেই। তবে আজকাল বড় চালাকি শুরু করেছে ও। সহজে পয়সা রোজগারের ভারী চমৎকার একটা ধান্দা ঠিক করে নিয়েছে। অর্থাৎ,কোথাও কোনও চেনা-অচেনা লোককে একসঙ্গে দেখলেই ও বলা নেই কওয়া নেই তাদের সামনে গিয়ে ফটাফট ডিগবাজি খাবে। তারপর মিটিমিটি চোখে তাকিয়ে এক হাত কোমরে রেখে ঘুরে-ঘুরে ঘুঙুর পায়ে নাচবে। তারপর এক বিশেষ ভঙ্গিমায় হাত পেতে সবার কাছে 'কিচ কিচ' করে পয়সা চাইবে। বাঁদরের অনেকরকমের বাঁদরামি পথেঘাটে দেখা যায়। কিন্তু এটা একটু অভিনব। লোকে তাই খুশিই হয়। আট আনা, এক টাকা দেয়। সোনাইও বিনা মেহনতে বেশ-কিছু টাকা-পয়সা রোজগার করে। অবশ্য খেলা দেখিয়েও আয় নেহাত মন্দ করে না। এই ব্যাপারে সোলেমানের অভাবটা খুব একটা কষ্ট দেয় না ওকে। কথায় আছে, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। তাই সোনাই ওর মিষ্টি চেহারা ও সুন্দর মুখের আকর্ষণে মানুষের মন এমনভাবে জয় করে ফেলে যে, খেলা দেখিয়ে আগের চেয়েও বরং অনেক বেশি রোজগার করে ও।

যাই হোক, ডগার ছুটে এসেই ঘনঘন লেজ নেড়ে তাতারকে তার আনুগত্য দেখাতে লাগল। আর মালিনী শঙ্কুর কাঁধে উঠে 'চিকি চিকি' করে ডাকতে লাগল। মাঝে-মাঝে তালি দিতে লাগল ফটাফট করে।

সোনাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকে ওদের দেখতে লাগল। ওর মুখটা কেমন যেন থমথম করছে।

তাতার প্রতিদিনের মতো হাত নেড়ে জানাল, "সো-না-ই-! আমরা এসে গেছি।"

বাঁধের ওপর থেকে সোনাইও হাত নাড়ল। কিন্তু কিছু বলল না।

তাতার অবাক হয়ে গেল। অন্যদিন সোনাই কেমন "ভাইয়া, ভাইয়া" করে ছুটে আসে, কিন্তু আজ আর এল না। আজ আর ওর মধ্যে যেন কোনও প্রাণ-চঞ্চলতা নেই। কেন? ব্যাপারটা কী!

শঙ্কু, দেবুকে নিয়ে তাতার বাঁধের ওপর উঠে গেল। তারপর ওদের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে বসল সবাই।

কী চমৎকার জায়গা। ওই জায়গার সন্ধান পাওয়ার পর থেকে তাতারেরা খেলাধুলো পর্যন্ত ভুলে গেছে। তাই রোজ বিকেল হলেই স্কুল থেকে ফিরে এখানে এসে বসে ওরা। যেমন নির্জন এখানটা, তেমনই সুন্দর। চারিদিকে সবুজ প্রকৃতি। আর দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া রেলের লাইন। কত যে গাছপালা এখানে তার ঠিক নেই। বাঁধের গাগুলো পর্যন্ত লতাগুল্মে সবুজে ভরা।

তাতার সোনাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়ে বলল, "তোর কী হয়েছে সোনাই? আজ তোকে অন্য দিনের মতো খুশি-খুশি লাগছে না তো! কেমন যেন হয়ে গেছিস তুই। আব্বাজানের জন্যে মন খারাপ করছে? কাঁদছিলি বুঝি?"

সোনাই বলল, "না ভাইয়া। তা ঠিক নয়। তবে একটা খুব খারাপ খবর আছে। একটু বিপদে পড়ে গেছি।"

তাতারের কপালে ভাঁজ পড়ল। বলল, "ডগার, মালিনী, আমরা থাকতে তোর বিপদ?"

"হ্যাঁ। আমাদের বস্তির মালিক এসে নোটিস দিয়ে গেছে, সাত দিনের মধ্যে আমাদের ঘর খালি করে দিতে হবে।"

"কেন? ভাড়া বাকি পড়েছে বুঝি?"

"না,না। তা নয়। বস্তির সবাইকেই ঘর ছেড়ে দিতে হবে।"

"কারণ?"

"ওই বস্তি নাকি ওরা রাখবে না। এখানে বিল্ডিং উঠবে। ফেলাট বাড়ি তৈরি হবে।"

"মামার বাড়ি নাকি? বস্তির লোকেরা এত সহজে ওদের আবদার মেনে নেবে?"

"তা হয়তো নেবে না। তবে অনেক দিন থেকেই ওরা বলা-কওয়া করছিল। নোটিস দিচ্ছিল। এখন জোর হুকুম। তাই ভাবছি ওরা সত্যিই যদি আমাদের উঠিয়ে দেয়, তা হলে কী হবে?"

শঙ্কু, দেবু বলল, "তা হলে তো ভয়ের ব্যাপার। যাবি কোথায় তুই? তোর আব্বাজান থাকলে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এখন যা দিনকাল পড়েছে, তাতে চট করে কোথাও কোনও ঘরও তো পাবি না।"

সোনাই বলল, "আমার খুব ভয় করছে।"

তাতার বলল, "ভয় পাবারই কথা। তবে ঘাবড়াস না। সেরকম যদি সত্যিই হয়, তা হলে তুই আমাদের বাড়িতেই থাকবি। আমি আমার বাপিকে-মাকে বলে যেভাবেই হোক তোর একটু থাকার ব্যবস্থা করে দেব।"

"ওঁরা কি আমাকে থাকতে দেবেন?

"কেন দেবেন না?"

"আমি তো একা নই। আমার সঙ্গে ডগার আছে, মালিনী আছে। তা ছাড়া তোমরা বাবুলোক। বড়লোক। কত বড় বাড়ি তোমাদের। আমরা গরিব। তা ছাড়া রাস্তার মেয়ে আমি।"

তাতার বলল, "তাতে কী? তবুও তুই একটা মেয়ে তো। তুই তো আমাদের বাড়িতেও গেছিস। আমার বাপি-মা, সবাই চেনেন তোকে। ও-ব্যাপারে তুই নিশ্চিন্দি থাক। আমি অন্তত তোকে ভেসে যেতে দেব না।"

সোনাই আনন্দের আতিশয্যে তাতারকে জড়িয়ে ধরে ওর পিঠে মাথা রেখে বলল, "তুমি আমার সত্যিকারের ভাইয়া।"

আর ঠিক সেই সময় ওদের সামনে যারা এসে দাঁড়াল, তাদের দেখেই ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওদের। কী ভয়ানক চেহারা সব। একজনের মুখ অ্যাসিডে পোড়া। একজনের গালটা কাটা। অন্যজনের মাথা ন্যাড়া। এই মাথা-ন্যাড়া লোকটিকে দেখেই মনে হল পাক্কা শয়তান একখানি। গায়ের রং তামাটে, আর কী ভয়ঙ্কর তার চোখের চাউনি। ওরা এসে সোনাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই সোলেমানের লেড়কি না?"

সোনাই ভয়ে-ভয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"সোলেমান এখন জেলের ঘানি টানছে তো?"

সোনাই ঘাড় নেড়ে জানাল, "হ্যাঁ।"

"এই ছেলেগুলো কোথায় থাকে?"

তাতার বলল, "সেটা ওকে জিজ্ঞেস না করে আমাদের করলেই তো হয়।"

ন্যাড়া-মাথা তাতারের দিকে তাকিয়ে রক্তচক্ষুতে বলল, "খুব র‍্যালা নিয়ে কথা বলছিস যে? সন্ধে হয়ে আসছে। এখনও এখানে বসে কী করছিস সব? যা ঘরে যা।"

তাতার বলল, "সন্ধে যখন হয়ে আসছে তখন তোমরাই বা এখানে কী করছ? তোমরাও ঘরে যাও।"

ন্যাড়া-মাথা ঠাস করে একটা চড় মারল তাতারকে। যেই না মারা মালিনী অমনি এক লাফে ন্যাড়া-মাথার কাঁধে উঠে ওর মাথায় ফটাং করে একটা চাঁটি মেরেই ঝুলে পড়ল একটা গাছের ডাল ধরে।

তাতার, সোনাই, শঙ্কু, দেবু মজা দেখে হো-হো করে হেসে উঠল।

ন্যাড়া-মাথা পালটা কিছু করার আগেই ডগার 'আঁউ' করে এমন তাড়া লাগাল যে, পালাতে পথ পেল না বাছাধনরা।

সে-রাতে ভাল করে ঘুমোতেই পারল না তাতার। বারবার ওর সোনাইয়ের কথা মনে হতে লাগল। দুষ্টু লোকগুলো সোনাইকে ও-কথা কেন জিজ্ঞেস করল, "তুই সোলেমানের লেড়কি না?" ওরা কারা! কী চায় ওরা? ওদের মনে কোনও বদ মতলব নেই তো?

টিঙ্কু ওর পাশে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে বলল, "তুই কী ভাবছিস রে দাদা?"

"কই! কিছু না তো?"

"আমার কাছে লুকোবি তুই?"

তাতার বলল, "সোনাইয়ের কথা ভাবছিলাম। ওর খুব বিপদ রে।"

"কেন, কী হয়েছে?"

"ওদের বস্তিটা নাকি উচ্ছেদ হবে।"

"তা হলে যাবে কোথায় ও?"

"সেই কথাই তো ভাবছি। আচ্ছা টিঙ্কু, সোনাইকে আমাদের বাড়িতে এনে রাখলে কেমন হয়?"

টিঙ্কু আনন্দে উল্লসিত হয়ে বলল, "তা হলে তো খুব ভাল হয়। তুই ওকে এখানেই নিয়ে আয় দাদা। আমরা বেশ একসঙ্গে থাকি। খেলা করি। তা ছাড়া ও এলে ডগার, মালিনীকেও সবসময় কাছে পাব আমরা।"

"তা তো পাব। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে…"

"কী মুশকিল?"

"না থাক। তুই তো আবার মাকে সব কথা বলে দিবি।"

"আমি কোনও কথা বলব না রে দাদা। সেবারে রাতের অন্ধকারে সেন্টুদার পাইপ বেয়ে ওঠার কথা কি আমি বলে দিয়েছিলাম?"

"তা অবশ্য বলিসনি। তবে শোন, আজ বিকেলে আমরা যখন রেলবাঁধে বেড়াতে গেছি, তখন তিনজন লোক না আমাদের কাছে এসেছিল।"

"খারাপ লোক নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ। তা ডগার ওদের এমন তাড়া লাগিয়েছে যে, পালাতে পথ পায়নি বাছাধনরা। আর মালিনী কী করেছে জানিস? ওদের ভেতর একজন ন্যাড়া-মাথা লোক ছিল। তার মাথায় ফটাং করে একটা চাঁটি মেরে গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়েছে।"

"বলিস কী রে! তারপর?"

"তার আর পর নেই। তবে এখন চিন্তা করছি লোকগুলো ওইভাবে আমাদের কাছে এল কেন? আমার ভয় সোনাইকে। ওরা কেমন চোখে যেন দেখছিল ওকে। বেচারি একা থাকে।"

"একা কোথায়? ডগার আছে, মালিনী আছে।"

"তা আছে। তবু…।"

"নে, অনেক রাত হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়। তুই বরং কাল ওকে আমাদের বাড়িতেই নিয়ে আয়।"

তাতার আর কথা না বলে ঘুমোবার জন্য চোখ বুজল।

কতক্ষণ শুয়ে ছিল খেয়াল নেই। একটু তন্দ্রাও এসে গিয়েছিল বুঝি। হঠাৎ টিঙ্কুর ডাকে ঘোর কাটল।

টিঙ্কু ঠেলা দিয়ে ডাকল, "দাদা! এই দাদা!"

"কী রে!"

"ঘুমিয়ে পড়লি?"

"না।"

"আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল। তাই ডাকলাম তোকে।"

"কী কথা?"

"সোনাইকে তুই আজই নিয়ে এলি না কেন? যদি লোকগুলো ওর কিছু করে? মানে ওকে যদি রাত্তিরবেলা ধরে নিয়ে পালায়?"

তাতার এবার উঠে বসল। তারপর বলল, "তুই ঠিক বলেছিস তো! এই কথাটা আমার একবারও মনে হয়নি। তবে ডগারের কবল থেকে ওকে কি ওরা সত্যিই নিয়ে যেতে পারবে?"

"না পারবার কী আছে? কোনও বিষাক্ত জিনিস ওরা ডগারকে খাইয়ে দিতে পারে। ওকে গুলি করতে পারে।"

"তা হলে?"

"তুই ভুল করলি দাদা। তাই বলছিলাম কী…।"

"কী বলছিলি?"

"এখন ক'টা বাজে?"

"রাত বারোটা!"

"আজ রাতেই দু'জনে গিয়ে ওকে নিয়ে আসি চল।"

ছোট্ট টিঙ্কুটা যে নিজের থেকে এত বড় একটা দুঃসাহসের কথা বলবে তা ও ভাবতেও পারেনি। এইটুকু মেয়ের পক্ষে এই রাতদুপুরে নৈশ অভিযানের সাহস মনে আনাও তো একটা প্রশংসার ব্যাপার।

তাতার বলল, "ওর বাড়ি অনেক দূর। যেতে ভয় করবে না তোর?"

"ভয় কী? তুই যে গোয়েন্দা-গল্পের বইটা এনেছিলি, ওতেও কিন্তু বিচ্ছু নামের একটা মেয়ে একবার গভীর রাতে একা একটা ভাঙা বাড়িতে গিয়েছিল।"

"কিন্তু ওর সঙ্গে পঞ্চু নামের একটা কুকুরও ছিল।"

"আমার সঙ্গে তাতার নামে আমার এক সাহসী দাদা তো আছে।"

তাতার, টিঙ্কু দু'জনেই উঠে পড়ল এবার বিছানা থেকে। তারপর মতলব আঁটল কী করে বাড়ির বাইরে যাওয়া যায়। দরজা খুলে নীচে নামতে গেলে বাপি-মা দু'জনেই জেগে উঠবেন। অতএব ওরা ঠিক করল বারান্দার গ্রিলে মায়ের দুটো শাড়ি বেঁধে ঝুলে পড়বে নীচে। যেই ভাবা সেই কাজ। ওপরের ঘরের আলো নিভিয়ে ওরা দরজাটা আলতো করে ভেজিয়ে শাড়ির বাঁধন ধরে নীচে নামল। তারপর লন পার হয়ে গেটের রেলিং টপকেই একেবারে রাস্তায়। আর ওদের পায় কে?

রাস্তায় নেমেই দ্রুত পা চালিয়ে অচেনা অন্ধকারে এগিয়ে চলল ওরা। তখন সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। পথ নির্জন। কেউ কোথাও নেই। মাঝে-মাঝে রাস্তার কুকুরগুলো ওদের দু'জনকে দেখে ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করতে লাগল। ওরা কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে চলল ওদের গন্তব্যস্থলের দিকে।

অনেক পথ পার হয়ে এসে এক সময় রেলবাঁধটা দেখতে পেল ওরা। এখানে কোথাও কোনও আলো নেই। তাই গভীর অন্ধকারে ঢাকা চারিদিক। হঠাৎ সেই অন্ধকারে এক উজ্জ্বল আলোর আভাস দেখতে পেল ওরা। সেইসঙ্গে কানে এল এক প্রচণ্ড কোলাহল।

কী ব্যাপার! এত চেঁচামেচি কিসের?

ওরা পরস্পরের হাত ধরে দ্রুত রেলবাঁধের ওপরে উঠেই যে দৃশ্য দেখতে পেল, তা যেমন ভয়াবহ তেমনই রোমহর্ষক। ওরা দেখল এক লেলিহান অগ্নিশিখা রাতের অন্ধকারে সোনাইদের বস্তি ঘিরে যেন তাণ্ডব নৃত্য করছে। দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। চারিদিকে কোলাহল। অসহায় মানুষ ও পশুর চিৎকার। জলের বালতি নিয়ে লোকজনের ছুটোছুটি।

সেই দিকে তাকিয়ে টিঙ্কু ও তাতার শিউরে উঠল।

টিঙ্কু বলল, "এই সর্বনাশা আগুন কী করে লাগল রে দাদা?"

তাতার বলল, "আগুন কি লাগে? লাগানো হয়। বস্তি উচ্ছেদের এই একটাই তো রাস্তা।"

"তুই আর দেরি করিস না দাদা। তাড়াতাড়ি চল। যেভাবেই হোক সোনাইকে রক্ষা করতেই হবে।"

ওরা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ছুটে গেল বস্তির দিকে। সেই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের মাঝখানে লোকজনের ছুটোছুটি ও দৌড়দৌড়িতে কে যে কোথায় আছে তার ঠিক কী?

তবুও তাতার চেঁচিয়ে ডাকল, "সো-না-ই···!"

টিঙ্কু ডাকল, "সো-না-ই-রে-এ···!"

ওদের ডাক শুনে ডগার আর মালিনী কোথায় ছিল কে জানে, ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল। ডগার ভয়ানক উত্তেজিতভাবে গড়াগড়ি খেতে লাগল তাতারের পায়ে। আর মালিনী 'মুমু' করে কী সব বলতে লাগল।

তাতার বলল, "সোনাই কোথায়?"

ডগার বলল, "আঁউ, আঁউ।"

সোনাইদের সেই ছোট্ট ছিটেবেড়ার ঘরটি তখন দাউদাউ করে জ্বলছে।

ডগার ও মালিনীর বক্তব্য বোধগম্য হল না তাতারের। শুধু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও সোনাই যখন এল না, তখন ভয়ানক চিন্তিত হল ও। তবে কি ওই জতুগৃহ থেকে বেরোতে পারেনি সোনাই? না, না। এ অসম্ভব। এই ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়েটির অমন মর্মান্তিক পরিণাম হতেই পারে না।

বস্তির লোকেদের দু-একজনকে জিজ্ঞেস করল ওরা, সোনাইকে কেউ দেখেছে কি না, কিন্তু না, সবাই নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত যে কেউ কিছুই বলতে পারল না। অবশ্য এসময় এটাই স্বাভাবিক। কে কার খোঁজ রাখে?

তাতার ও টিঙ্কুর মনখারাপ হয়ে গেল খুব।

একেই বলে নিয়তি। এরই নাম দুর্ভাগ্য। পিতৃমাতৃহীন সোনাই সোলেমানের মতো একজন সহৃদয় মানুষকে আশ্রয় করে বেঁচে উঠছিল যদিও, অদৃষ্টের পরিহাসে সেই সোলেমানকে আজ জেলের ঘানি টানতে হচ্ছে। এই নিষ্ঠুর ভবিতব্যকে মেনে নিয়েও সোনাই যখন একাই লড়ে যাচ্ছিল তার ভাগ্যের সঙ্গে, তখনই এল এই সাঙ্ঘাতিক বিপর্যয়। কিন্তু সোনাই! কোথায় সোনাই? সে কি সত্যিই অগ্নিদগ্ধ হল!

আগুন যেমন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল, তেমনই সব-কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে নিভেও এল তাড়াতাড়ি। দমকলও

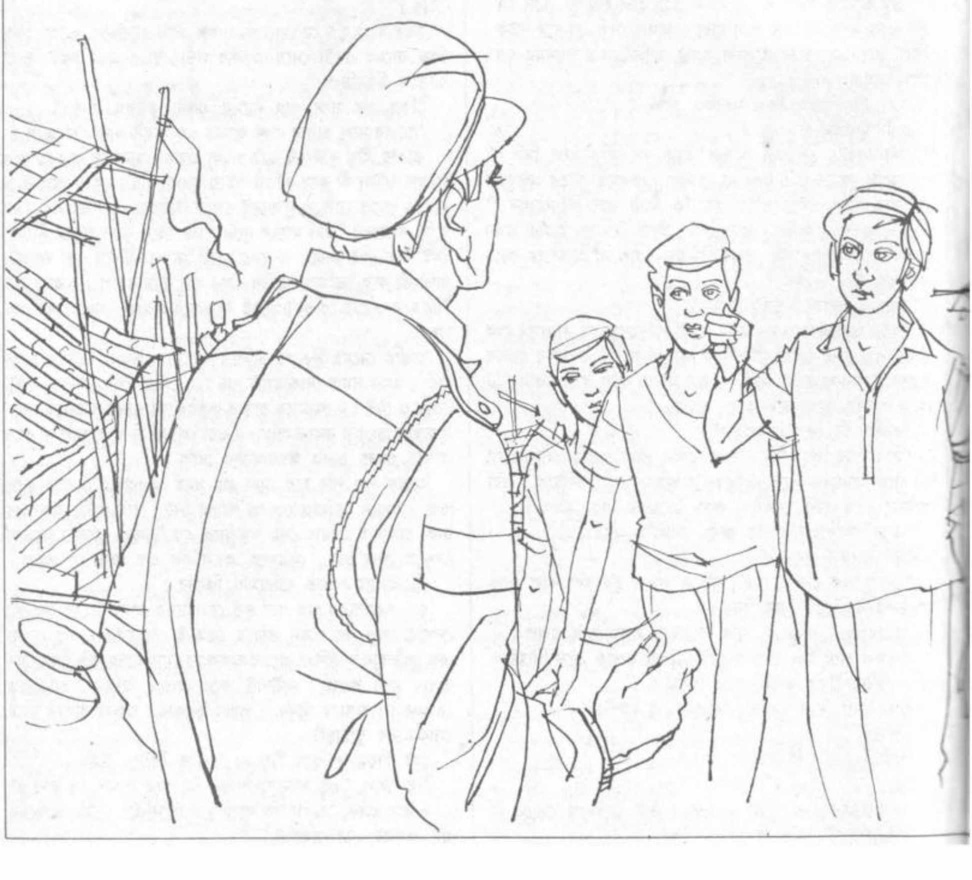

এল, কিন্তু তার আগেই সব শেষ। আগুন যখন নিভল, তখন পোড়া বাঁশ, কাঠ ও ছাই ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বস্তিবাসীর কান্নায় ভরে উঠেছে চারিদিক। সেই জনারণ্যে সবাই আছে। নেই শুধু একজন। সে হল সোনাই।

টিঙ্কু ও তাতার সোনাইয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরল। কেননা ভোর হয়ে আসছে। ভোরের আগে না ফিরলে রাতের পলায়ন জানাজানি হয়ে যাবে। আর তা যদি হয় তা হলে ওদের দু' ভাই-বোনকে ওপরের ঘরে কিছুতেই শুতে দেবেন না বাপি। মা তো দেবেনই না।

পরদিন অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে, মুখ-হাত ধুয়ে শঙ্কু ও দেবুর সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য পা টিপে-টিপে তাতার যেই ঘর থেকে বেরোতে যাবে অমনি পাশের ঘর থেকে শ্যামবাবু ডাকলেন, "তাতার!"

"যাই বাপি।"

তাতার ঘরে ঢুকতেই শ্যামবাবু বললেন, "সাত-সক্কালবেলা দিব্যি তো পালাবার তাল করছিস, এদিকে কী কাণ্ড হয়েছে দেখেছিস?"

"কী হয়েছে?"

"শা-নগরের বস্তিতে কাল রাতে আগুন লেগে গোটা বস্তিটাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।"

এই দুঃসংবাদে সোনাইয়ের জন্য গভীর বেদনায় তাতারের বুক কেঁপে উঠল। ও তো সবই জানে, তবু না জানার ভান করে বলল, "তুমি কী করে জানলে বাপি?"

"এই তো আজকের খবরের কাগজে প্রথম পাতায় ছবি দিয়েছে।"

তাতার ঝুঁকে পড়ে ছবিটা দেখল। চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল ওর।

মা শুনতে পেয়ে ছুটে এলেন, "ও মা! এ কী ভয়ানক কাণ্ড!"

শ্যামবাবু বললেন, "তোদের সেই মেয়েটি সোনাই না কী যেন নাম, তার কী হল খোঁজ নে একবার।"

তাতার বলল, "এক্ষুনি যাচ্ছি বাপি।"

তাতার চলেই যাচ্ছিল।

টিঙ্কু বলল, "আমি যাব রে দাদা?"

নন্দা দেবী বললেন, "না। তুই কোথায় যাবি?" তারপর তাতারকে বললেন, "শুধু মুখে যাস না। কিছু খেয়ে যা।"

তাতার এসে ডাইনিং টেবিল-এর সামনে বসল।

মা বললেন, "যদি সেরকম কিছু বুঝিস, তা হলে মেয়েটাকে নিয়ে চলে আসবি। যতদিন না ওর বাবা জেল থেকে ফেরেন, ততদিন ও থাকবে এখানে।"

তাতার চা-জলখাবার খেয়ে রওনা হল। ওর তো অজানা কিছুই নেই। তবু একবার শঙ্কু, দেবুদের বাড়িতে গিয়ে ওদের সব কথা খুলে বলল। তারপর তিনজন গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে ছুটে চলল সোনাইদের বস্তির দিকে।

সেই ধ্বংসস্তূপের সামনে তখন বহু মানুষের ভিড়। পুলিশও এসেছে অনেক। দারোগাবাবু স্টেটমেন্ট লিখছেন।

ডগার ও মালিনী আবার ছুটে এল ওদের দেখে।

এল না শুধু সোনাই।

পুলিশের তদন্ত অনুযায়ী জানা গেল আগুন যেভাবেই লেগে থাকুক না কেন, একমাত্র সোনাই নামের কিশোরী মেয়েটির উধাও হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও প্রাণহানির ব্যাপার কিছু ঘটেনি।

আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই লোকজন সতর্ক হয়ে পড়ায় এবং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসায় প্রাণে বেঁচে গেছে সবাই। শুধু সোনাইয়ের ব্যাপারটাই যা রহস্যময়।

তাতার পুলিশকে বলল, "রহস্যের কোনও ব্যাপারই নেই এতে। সোনাইকে অপহরণ করা হয়েছে।"

দারোগাবাবু তাতারকে দেখে বললেন, "আরে, তাতারবাবু যে! তুমি এখানে?"

তাতার বলল, "আমি একা নই। আমরা সবাই এখানে। একটি অসহায় মেয়ের বাবা, যিনি আমাদের কিছু নরঘাতকের কবল থেকে রক্ষা করতে একটা খুনের ঝুঁকি মাথায় নিলেন, আপনারা তাঁকেই জেলের ঘানি টানতে পাঠিয়ে আপনাদের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখলেন। কিন্তু আমরা তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না। তাই রোজ এসে মেয়েটির দেখাশোনা করতাম। ইতিমধ্যে কাল বিকেলে একটা ঘটনা ঘটল।"

"কীরকম?"

বিকেলের ঘটনাটা, মানে ওই ন্যাড়া-মাথা ও তার দুই সঙ্গীর কথাটা দারোগাবাবুকে খুলে বলল তাতার। তারপর কাল রাত দুপুরে কীভাবে এসেছে ওরা দু' ভাই-বোনে তাও বলল।

সব শুনে দারোগাবাবু বললেন, "বুঝেছি। এটা তা হলে পুরোপুরি কিডন্যাপিং কেস। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না এর সঙ্গে আগুন লাগার সম্পর্কটা কী? মেয়েটিকে চুরি করার দরকার হলে চোরেরা চুরি করবে। কিন্তু বস্তিতে আগুন লাগাবে কেন?"

দেবু, শঙ্কু বলল, "বস্তির মালিকটাকে আগে অ্যারেস্ট করুন না। তা হলেই সব রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে।"

দারোগাবাবু রেগে বললেন, "আইন তো খুব শিখে গেছ দেখছি। যেহেতু জমির মালিক, অমনি তাকে অ্যারেস্ট করতে হবে? যাকে-তাকে অ্যারেস্ট অমনি করলেই হল?"

এমন সময় হঠাৎই রহস্যকে ঘনীভূত করে বস্তির এক বুড়ি ডুকরে কেঁদে উঠল। আর শক্তসমর্থ পঁচিশ-তিরিশ বছরের এক যুবক ধমকাতে লাগল বুড়িটাকে, "চুপ! চুপ! চুপ করো না। হাতে হাতকড়া পড়বে যে। পুলিশ আছে।"

কী ব্যাপার! ব্যাপার কী?

পুলিশের লোকেরা ধরে আনল বুড়িকে। বলল, "কী হয়েছে বুড়িমা? ঠিক করে বলো তো? ওই ছেলেটি কে?"

"আমার ছেলে বাবা।"

"ও তোমাকে চুপ করতে বলছে কেন?"

"আমি সব বলব বাবা। কিছু লুকোব না। কাল রাত্তিরবেলা আমার এই ছেলে নাইট শো'য়ে সিনেমা দেখে এসে না খেয়েই শুয়ে পড়ছিল। তা আমি ওর জন্যে রাখা একটু দুধ গরম করতে গেছি যেই, অমনি এসটোভটা (স্টোভ) দপদপিয়ে ঘরে আগুন লেগে গেল। শুধু আমার জন্যেই এই সর্বনাশটা হয়ে গেল বাবা। এ-কথা আমি একশোবার বলব। হাজারবার বলব। তোমরা আমাকে জেলে নে চলো।"

সবাই অবাক হয়ে শুনল বুড়ির কথা। কিন্তু করবেটা কী ওর? বাহাত্তর বছরের এই বুড়িকে তো এই অপরাধের জন্য হাজতে ঢোকানো যায় না? হঠাৎ যদি হার্টফেল করে তো বুড়ি মেরে খুনের দায়ী হবে কে?

দারোগাবাবু সব শুনে বললেন, "কী হে ছোকরারা, সব তো শুনলে নিজেদের কানে। এর পরেও কি বস্তির মালিককে অ্যারেস্ট করতে যেতে হবে?"

তাতার বলল, "তা হলে সোনাইয়ের কী হবে?"

"ও-ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। ওকে আমরা উদ্ধার করবই। এখন বেশ বুঝতে পারছি যে, সোনাই-হরণটা পরিকল্পিত, কিন্তু আগুন লাগাটা দুর্ঘটনা।"

শঙ্কু, দেবু ও তাতার হতাশ হয়ে ফিরে এল।

সোনাইদের ওখান থেকে ফিরে তাতারের দল কিন্তু বাড়ি এল না। সোজা চলে গেল সেন্টুদার বাড়ি। সেন্টুদা তখন পাশের মাঠে তার বাইকটা নিয়ে কসরত দেখাচ্ছিল। সেন্টুদা যেন অলরাউন্ডার। সবেতেই তার কিছু-না-কিছু দক্ষতা আছেই। কী এক অদ্ভুত কৌশলে দু' হাত ছেড়ে বাইকটা নিয়ে মাঠময় ঘুরপাক খাচ্ছে। আর তাই দেখতে ভিড় করেছে অল্পবয়সী কয়েকটি ছেলেমেয়ে। সেন্টুদা ভাল মাউথঅর্গান বাজায়। দু' হাতে মাউথঅর্গানটা ধরে জনপ্রিয় একটি হিন্দি গানের সুর বাজিয়ে চলেছে সেন্টুদা। কী সুন্দর। কোথাও সুরের কোনও ঘাটতি নেই। তাল কাটার ব্যাপার নেই। সাদা প্যান্ট আর টাওয়েল গেঞ্জি পরা সুদর্শন সেন্টুদাকে বাইকের খেলা দেখানো অবস্থায় কী ভাল যে দেখতে লাগছিল। এর ওপরে মাথায় যদি একটা টুপি থাকত, তা হলে তো কথাই নেই। একেবারে ফিল্মি হিরো। সত্যি, কেন যে সেন্টুদা সিনেমায় চান্স পায় না, তা কে জানে। সেন্টুদার মতো নায়ক ফিল্মে গেলে অনেক হিরো যে জিরো হয়ে যেত, তা বাজি রেখে বলা যায়।

সেন্টুদা ওদের দেখতে পেয়েই বাইক থামিয়ে কাছে এসে বলল, "কী ব্যাপার, কোনও খারাপ খবর?"

"তুমি কাগজ দ্যাখোনি?"

"না।"

"সে কী! তা হলে তুমি জানবে না।"

"কেন, কী হয়েছে?"

"কাল রাতে রেলবাঁধের ওপারে যে বস্তিটা আছে, তাতে আগুন লেগে সব পুড়ে গেছে। আর সেইসঙ্গে সোনাইকেও পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সোনাই মানে সোলেমানের সেই মেয়েটা?"

"হ্যাঁ।"

"ওকে যে একদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না তা আমি জানতাম। ও যে এতদিন কেন নিখোঁজ হয়নি সেই কথাই ভাবছি। একে ওইরকম পরির মতো দেখতে, তার ওপরে অত ভাল দড়ির ব্যালান্স, ও তো একটা টাকার খনি। এই কিছুদিন আগে আমিই ভাবছিলাম আমার গাড়ির খেলা আর ওর ওই দড়ির ব্যালান্স নিয়ে একটা টিম তৈরি করব। তার জায়গায়...।"

"মেয়েটা একটা দুষ্টচক্রের হাতে পড়ে গেছে সেন্টুদা।"

সেন্টুদা এক মিনিট চুপ করে থেকে বলল, "দাঁড়া একটু।" বলে বাইক নিয়ে মাঠের বাইরে চলে গেল। তারপর একটা পান মুখে দিয়ে এসে বলল, "হ্যাঁ, এবার বল তো কী থেকে কী হয়েছে? পুলিশ এসেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"পুলিশ কী বলছে? শর্ট সার্কিট?"

"না, না। পুলিশ এটাকে আগুন লাগানোর ঘটনা বলেই মনে করছিল। পরে একটা বুড়ি স্বীকার করে রাতদুপুরে সে নাকি তার ছেলের দুধ গরম করতে গিয়ে স্টোভের বিপর্যয় ঘটিয়ে এই কাণ্ডটি ঘটায়।"

"বাজে কথা।"

তাতার বলল, "বাজে কথা কেন হবে? এত বড় অপরাধের বোঝা কেউ কখনও সেধে এসে নিজের ঘাড়ে চাপায়?"

"সেই জন্যই তো বলছি, বাজে কথা। ব্যাপারটা রীতিমত সন্দেহজনক এবং নাশকতামূলক।"

"কী বলছ তুমি সেন্টুদা?"

"ঠিকই বলছি বাবা। তদন্ত এগোতে না দেওয়ার জন্যে এই কল্পিত নাটক। ওদের চালাকি তোরা বুঝবি কী?"

"তার মানে এটা স্বাভাবিক নয়?"

"না। বুড়ির ছেলেকে তোরা দেখেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"কত বড় ছেলে? হামা দিচ্ছে না নিশ্চয়ই?"

"না, না। তোমার মতন বড়।"

"তা হলে? ওই ছেলেটাই বস্তির মালিকের কাছ থেকে নোট খেয়ে এই কাজ করেছে। তার ছেলেকে বাঁচাতে এবং মালিককে বাঁচাতে বুড়ির এই অভিনয়। বস্তির মালিক এসেছিল?"

"না।"

"কেন আসেনি? এইসব ব্যাপার খতিয়ে না দেখলে কী করে

গোয়েন্দা হবি তোরা ? পুলিশও হয়েছে যেমন, তোরাও তেমনই।"

"তা হলে কী হবে সেন্টুদা ?"

"কী আবার হবে ? খুঁজে-পেতে বার করতে হবে মেয়েটাকে। তোরা এক কাজ কর, বুড়ির ছেলের দিকে একটু নজর রাখ।"

তাতার তখন বিকেলের ঘটনাটা বলে বলল, "ওই ন্যাড়া-মাথা আর তার শাগরেদ দুটোকে তুমি চেনো ?"

"না। মনে হয় ওরা কোনও ভাড়াটে গুণ্ডা।"

"তা যদি না হয়, তা হলে সোনাইকে ওরা চিনল কী করে ?"

সেন্টুদা বলল, "ঠিক আছে, দেখছি আমি ব্যাপারটা কতদূর কী করা যায়। তোরা কিন্তু এখন থেকেই বুড়ির ছেলের পিছনে লেগে থাক।"

"তুমি যখন বলছ তখন তোমার কথা অমান্য করব না। তবে সোনাইকে আমাদের চাই-ই।"

"বলেছি তো ব্যবস্থা করব।" বলে ঘড়ির দিকে তাকিয়েই সেন্টুদা বলল, "ইস রে। অনেক দেরি হয়ে গেল। আজ একটা ভাল হিন্দি ছবি রিলিজ করছে। দেখতেই হবে ছবিটা। তোরা যা। আমি একটা টিকিটের ধান্দা দেখি।"

তাতার করুণ সুরে বলল, "সেন্টুদা, আমাদের এই দুঃসময়ে তুমি সিনেমায় গিয়ে সময় নষ্ট করবে ?"

"আরে ও তো দু'ঘণ্টার মামলা। ততক্ষণ তোরা তোদের কাজ করগে যা দিকিনি।"

অগত্যা ফিরেই এল ওরা। এই অস্থিরমতি পরোপকারী চঞ্চল যুবক অঞ্চলের সবার প্রিয় হলেও বড়ই রহস্যময়। তাই আর দেরি না করে যে-যার ঘরে ফিরে গেল। বেলাও তো হয়েছে।

মা বললেন, "কী রে! খবর কী ?"

"খুব খারাপ খবর, মা। সোনাইকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সে কী!"

"হ্যাঁ মা। কেউ নিশ্চয়ই ওকে চুরি করে নিয়ে গেছে।"

"কিন্তু ওর এই কুকুর আর বাঁদরের খপ্পর থেকে ওকে নিল কে ?"

"সেইটাই তো রহস্য।"

"এদিকে তোরা অত করে বললি বলে তোর বাবা তো বেনারস যাবার ঠিকই করে ফেলেছেন। বলছিলেন, সোনাই যদি আসে তা হলে ওকেও নিয়ে যাবেন।"

"আমি এখন বেনারস যাব না, মা। সোনাইকে ফিরে না-পাওয়া পর্যন্ত আমার কোথাও যেতে ভাল লাগবে না। ওকে দেখব বলে ওর আব্বাজানকে কথা দিয়েছিলাম আমি। তার জায়গায় এ কী হল। এমন যে হবে তা কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি।"

মা বুঝলেন ছেলেটা সত্যিই দুঃখ পেয়েছে। তাতারের চোখ-মুখের অবস্থা দেখে শঙ্কিত হলেন মা। সবার অলক্ষ্যে আঁচলের খুঁটে চোখের একটু জল মুছলেন।

সেন্টুদা বলেছে বুড়ির ছেলের ওপর একটু নজর রাখতে। তাই দুপুরে বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে আবার যথারীতি ওরা তিনজনে বেরিয়ে পড়ল শা-নগরের দিকে।

বেশিদূর যেতে হল না, শা-নগরের শ্রমিক-পাড়ার কাছে যে ছোট্ট রেস্টুরেন্টটা আছে, সেইখানেই হঠাৎ কাকে দেখে যেন থমকে দাঁড়াল ওরা। শঙ্কু, দেবু, তাতার— তিনজনেই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল, রেস্টুরেন্টের ভেতর বুড়ির ছেলে বিচ্ছিরি চেহারার দু'জন লোকের সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কী সব কথা বলছে।

তাতার, দেবু ও শঙ্কুকে একটু আড়ালে ডেকে এনে বলল, "এমন মওকা আর পাওয়া যাবে না। এইখান থেকেই শুরু করতে হবে। ভেতরে ঢুকে শুনতেই হবে ওদের কথাবার্তা।

দেবু বলল, "তা তো করবি। কিন্তু আমরা ভেতরে ঢুকলেই যদি ওরা সন্দেহ করে ?"

"যাতে না করে সেইভাবে ঢুকতে হবে। তা ছাড়া বুড়ির ছেলে আমাদের চেনে না। তখন ভিড়ভাট্টায় দেখে থাকলেও অত খেয়াল করতে পারবে না।"

শঙ্কু বলল, "কীভাবে কী করব তা হলে বল ?"

তাতার তখন ওর পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে দিল ওদের।

দেবু, শঙ্কু বলল, "আইডিয়াটা মন্দ নয়। এরকম করলে ওরা ধরতেই পারবে না আমাদের অনুচর বলে।"

তাতার বলল, "হ্যাঁ। স্রেফ অভিনয় করতে হবে।"

দেবু, শঙ্কু বলল, "গো অ্যাহেড। স্টার্ট।"

তাতার পাকা অভিনেতার মতো থিয়েট্রিকাল ঢঙে ডাকল ওদের, "এই এদিকে আয়, এখানেই খেয়ে নেওয়া যাবে।" বলে দোকানদারকে বলল, "মোগলাই স্পেশাল হবে ?"

"হবে।"

"কত করে ?"

"পাঁচ টাকা।"

শুরু হল শঙ্কু ও দেবুর অভিনয়, "না, না। এখানে নয়। ওদিকে চল। ওধারে এক জায়গায় ভাল ফিশফ্রাই তৈরি করে।"

তাতার বলল, "ধ্যুত। ফিস্‌ফ্রাই আমার ভাল্লাগে না, তা ছাড়া অনেকদিন আগে এই দোকানের মোগলাই একবার আমি খেয়েছিলাম। ভালই করে।"

অগত্যা যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঢুকল ওরা।

দোকানদার বললেন, "খেয়েই দ্যাখো না। একবার খেলে রোজ খেতে ইচ্ছে করবে। ছোট দোকান হতে পারে, তবে জিনিস আমি খারাপ দিই না।"

তাতার বলল, "জানি। আমি একবার খেয়েছি।"

ওরা বসলে দোকানদার হাঁক দিলেন, "এই, তিনটে স্পেশাল। তাড়াতাড়ি।"

তাতার বলল, "তাড়াতাড়ির দরকার নেই। একটু দেরি করেই করুন, ভাল করুন।" বলে ওরা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে নিজেদের মধ্যেই ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল, হি-হি করে হেসে এ-ওর গায়ে পড়তে লাগল। এমন ভান দেখাতে লাগল যাতে লোকে দেখে মনে করে তিনটে বখাটে ছেলে নিজেদের মধ্যে কোনও আলোচনা করছে। অথচ এ-সবই অভিনয়। কান ওদের খাড়া রইল অন্য কথাবার্তার দিকে।

ওধারের টেবিলে তখন যে আলোচনা হচ্ছিল, তা এই রকম, "আমি এখনও বলছি টাকা-টাকা করে মাথা গরম করিস না ক্যাবা।"

বুড়ির ছেলের নাম ক্যাবা। বলল, "করব না মানে ? এত বড় একটা বিপদের ঝুঁকি আমি মাথায় নিলাম, আর আমার বেলাতেই অষ্টরম্ভা ? মঞ্জুদার সঙ্গে তো এমন কথা ছিল না আগে।"

"কী কথা হয়েছিল তোর বল ?"

"পাঁচ হাজারের কথা হয়েছিল। বলেছিল অপারেশন সাকসেসফুল হলেই নোট পৌঁছে যাবে।"

"পাঁচ হাজার!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্রাদার।"

"ওই সামান্য কাজ করে তুই যদি পাঁচ হাজার চাস, তা হলে বাকি কাজ করে আমরা কত পাব ? আসল কাজ তো আমরাই করেছি।"

"বেইমানি করিস না নেলো।"

"এতে বেইমানির কী আছে ? তুই-ই বল না, তোর ভূমিকা

হ্যাণ্ডিপ্লাস্ট পথ ধরে এগিয়ে যাও
'শান্তখোকা'
হ্যাণ্ডিবয়ের চাই একটা হ্যাণ্ডিপ্লাস্ট স্পট, স্ট্রিপ ও প্যাচ, কাটাছড়াগুলো ঢাকতে হবেত' ! দেখোদিকি খুঁজে পাও কিনা কোন্‌টা কোথায় যাবে !
খালি পথ ধরে এগিয়ে চলো আর হ্যাণ্ডিবয়ের গায়ে এঁকে ফেলো স্পট, স্ট্রিপ,প্যাচ, যেখানে যেটি করে ম্যাচ।
বন্ধু যেমন স্ট্রিপ
Handyplast®
medicated strips
নিজের ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে এটা কেটে রাখুন
HTA 1425

কতটুকু। বস্তিতে আগুন লাগিয়েছে ভিকি। আর আমি যে কী কাণ্ড করে মেয়েটার মুখে কাপড় গুঁজে ওকে গাড়িতে তুলেছি তা আমিই জানি। ওই অবস্থায় ধরা পড়লে আমার দশাটা কী হত একবার ভেবে দ্যাখ তো ? তুই তো শুধু ডেকে এনেছিলি মেয়েটাকে।"

"ডেকে আনাটাই তো আসল কাজ হে। না হলে তোদের সাধ্যি ছিল ওই কুকুর আর বাঁদরের খপ্পর থেকে মেয়েটাকে বার করে আনা ? আমি ওকে মায়ের অসুখের নাম করে মিথ্যে কথা বলে আমাদের ঘরে ডেকে এনেছিলাম। তবে না ওকে কবজা করতে পেরেছিলি। তারপরেও পাছে গোয়েন্দা-পুলিশ তদন্ত করে, তাই মাকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে বুড়ো মানুষটার অসতর্কতায় আগুনটা লেগেছে এত বড় একটা বদনাম ঘাড়ে নিয়েছি। এরপরও বলছিস কিনা—কী করেছি ? ঠিক আছে, রেখে দে তোদের টাকা। আমার জেল হোক ফাঁসি হোক, আমি নিজেই গিয়ে পুলিশকে খবর দিচ্ছি। মরব, সবাইকে নিয়েই মরব। একা নয়।"

নেলো বলল, "সে সুযোগ কি তুই পাবি ?" বলেই ওর চোয়ালটা লক্ষ্য করে একটা ঘুসি মারল।

অপ্রত্যাশিত ব্যাপার।

ক্যাবা ছিটকে পড়ল চেয়ার থেকে। তারপর টেবিলের ওপর রাখা টাকাগুলো পকেটে ঢুকিয়ে নিয়েই একটা ছুরি বার করে আক্রমণ করতে গেল ওদের।

সঙ্গে-সঙ্গে ভিকি ওর হাতটা শক্ত করে ধরে এমনভাবে মুচড়ে দিল যে, ছোরাটা খসে পড়ল হাত থেকে।

ভিকি আর নেলো ক্যাবাকে বেকায়দায় ফেলে হাসতে লাগল খিখি করে।

দোকানদার এবার রেগে বললেন, "আরে, কী আরম্ভ করেছ তোমরা ? সেই থেকে তো বসে-বসে কথার আর শেষ হচ্ছে না তোমাদের। আবার মারপিট শুরু করেছ ?"

নেলো আর ভিকি এবার ক্যাবাকে টানতে টানতে বার করে আনল দোকান থেকে।

তাতার, শঙ্কু, দেবুও উঠে দাঁড়াল।

দোকানদার বললেন, "বোসো, বোসো। তোমাদের কোনও ভয় নেই। মহা বদ ওগুলো। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারছে এলাকাটাকে। শুনলে তো, এরাই কাল আগুন লাগিয়েছে বস্তিতে। এখন হিস্যা নিয়ে যেই গোলমাল হয়েছে অমনি শুরু হয়েছে মারপিট।"

তাতার বলল, "এদের ঘাঁটিটা কোথায় ?"

"এগুলো হচ্ছে ছিঁচকে বদমাশ। এদের আবার ঘাঁটি কী ? এদের থাকার কোনও ঠিকানা আছে ? লালজির টাকা খেয়ে লালজির হয়ে কাজ করছে।"

"লালজি ! সে আবার কে ?"

"ও বাবা ! লালজিকে চেনো না ? এই বস্তির মালিক। অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করছিল বস্তিটাকে উচ্ছেদ করবার। কিন্তু পারছিল না। এখন নোট ছড়িয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ হাসিল করেছে।"

"কোথায় থাকে বলুন তো লোকটা ?"

"বাব্বাঃ। মানপুরের নামজাদা লোক লালজির আবার ঠিকানা ! লালমহলের নাম শুনেছ ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি। খুব নামকরা হোটেল।"

"ওই লালমহলের পাশেই যে দোতলা বাড়িটা, ওটাই লালজির বাড়ি। এখন এই বস্তির ওপর দেখবে বড়-বড় ফ্ল্যাট তৈরি হবে।"

বাইরে তখন ক্যাবাকে ধরে ঢিপঢাপ লাগাচ্ছে নেলো আর ভিকি।

তাতার বলল, "লোকটাকে ওরা মেরে ফেলবে না তো ?"

"মারুক না, ক্ষতি কী ? একটা কথা জেনে রেখো, প্রবাদবাক্য কখনও মিথ্যে হবার নয়। 'ওঝার মরণ ভূতের হাতে/কুলির মরণ কলে/বেদের মরণ সাপের দাঁতে/মাঝির মরণ জলে।' তেমনই এদের মরণ এদের হাতেই।"

তাতার বলল, "আমরা আসছি। দেখি একটু কী হয়। পরে এসে খাব।"

"কী দেখবে ওদের ? যত্ত সব..."

কী যে দেখবে তা ওরাই জানে। ওরা দোকান থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, ক্যাবাকে মারতে-মারতে নেলো আর ভিকি নিয়ে চলেছে রেলবাঁধের দিকে। তাতার, শঙ্কু আর দেবু রাগে ও উত্তেজনায় ফুলতে লাগল। উত্তেজনা হবারই কথা। চোখের সামনে সোনাইয়ের অপহরণকারী অথচ ওরা ওদের কিছুই করতে পারছে না। ঠিক এই সময়টিতে যদি ডগার, মালিনী কাছে থাকত বা সেন্টুদাকে পাওয়া যেত, তা হলে বিষ-দাঁত উপড়ে নিত ওদের। কিন্তু ওরা নিতান্তই অসহায়। তবু ওরা ওদের পিছু ছাড়ল না।

নেলো, ভিকি, ক্যাবাকে মারতে-মারতে রেলবাঁধের কাছে নিয়ে গিয়ে ওর তলপেটে একটা লাথি মারল। ক্যাবা একটা ঝোপের কাছে ছিটকে পড়তেই নেলো একটা রিভলভার বার করে গুলি করল ওকে। গুলিবিদ্ধ ক্যাবা অন্তিম একটা আর্তনাদ করে ছটফট করতে লাগল।

তাতার, শঙ্কু ও দেবু নীরব দর্শকের মতো দেখতে লাগল দৃশ্যটা। শুধু ওরা নয়, দূর থেকে রেল কলোনির বাসিন্দারাও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল সেই দৃশ্য। সবাই দেখল। কিন্তু কেউ কিছুই করার জন্য এগিয়ে এল না। আসবেই বা কী করে ? যে আসবে বাধা দিতে, তাকে তো ফিরে যেতে হবে না।

ক্যাবাকে গুলি করে নেলো আর ভিকি এগিয়ে এল তাতার, শঙ্কু, দেবুর দিকে। নেলো ক্রুদ্ধ চোখে তাতারকে বলল, "তোরা সেই থেকে আমাদের পিছু নিয়েছিস, কী ব্যাপার বল তো ?"

তাতার বলল, "সোনাই কোথায় ?"

"সোনাইটা কে ?"

"কাল যে মেয়েটাকে তোমরা চুরি করে নিয়ে গেছ।"

নেলো আর ভিকি পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল।

চোখে-চোখে কী ইশারা হল কে জানে ?

নেলো বলল, "ও। তোরা বুঝি ওই মেয়েটার বডিগার্ড ? দোকানে বসে আমাদের কথাবার্তা কী শুনেছিস ?"

"যা-যা বলেছ সব শুনেছি। শুধু মেয়েটাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে রেখেছ সেটাই জানতে পারিনি।"

"সেটা তা হলে এক্ষুনি জানিয়ে দিচ্ছি।" বলেই তাতারের দিকে রিভলভার তাক করল নেলো।

ভুল করল। তাতার চোখের পলকে ওর হাতের কবজিতে একটা রদ্দা দিতেই রিভলভারটি ছিটকে পড়ল ক্যাবার কাছে। মৃত্যুপথযাত্রী ক্যাবাও সে সুযোগ হাতছাড়া করল না। সেটা কুড়িয়ে নিয়েই ট্রিগার টিপল, ডিস্যুম, ডিস্যুম। একটা ফসকাল। আর-একটা লাগল গিয়ে নেলোর মুখে। আর্তনাদ করারও সময় পেল না বেচারি। কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ে ছটফট করতে লাগল। তবে বেশিক্ষণ নয়। একটু পরেই স্থির হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে ভিকি অনেক দূরে পালিয়েছে।

তাতার দূর থেকেই চিৎকার করতে লাগল, "ওকে ধরুন। ওকে যেতে দেবেন না। মনে হচ্ছে ওর কাছে কোনও অস্ত্র নেই। ওকে যেতে দেবেন না। ধরুন ওকে।"

কিন্তু কোনও লাভ হল না। অরণ্যে রোদন। কেউ এগিয়ে গেল না ভিকিকে ধরবার জন্য। কলোনিসুদ্ধু লোকের চোখের সামনে দিয়ে

দৌড়ে পালিয়ে গেল ভিকিটা।

তাতার, শঙ্কু, দেবু ক্যাবার কাছে এল। ও তখনও কাতরাচ্ছে। ওর তলপেটে লেগেছে গুলিটা। সোনাইয়ের ব্যাপারে অনুসন্ধানের একমাত্র সূত্র এই ক্যাবা।

ওরা ক্যাবার কাছে আসতেই ক্যাবা বলল, "জল! একটু জল দিতে পারিস কেউ আমাকে?"

তাতার বলল, "এখানে জল কোথায় পাব? বাঁধের ওপারে পোড়া বস্তি থেকে না হলে দূরের রেল কলোনি থেকে নিয়ে আসতে হবে জল।"

"কলোনি থেকে আনতে দেরি হয়ে যাবে অনেক। তোরা বরং আমাকে একটু ধরাধরি করে বস্তির দিকেই নিয়ে চল।"

শঙ্কু বলল, "তুমি যাবে? যেতে পারবে?"

"দেখি না চেষ্টা করে। ওখানে আমার মা আছে। মরবার আগে পায়ের ধুলোটা একটু নিয়ে যাই।"

শঙ্কু, দেবু ও তাতার ধরাধরি করে তুলল ক্যাবাকে।

ক্যাবা অতি কষ্টে বলল, "দ্যাখ, আমার পকেটে কিছু টাকা আছে। যদি আমি মরে যাই তা হলে টাকাটা আমার পকেট থেকে বার করে আমার মাকে দিয়ে দিস।"

তাতার বলল, "দেব। আমরা তো চিনি তোমার মাকে। কিন্তু কেন এইসব কাজ তোমরা করো বলো তো? দেখলে তো, খারাপ কাজ করার পরিণামটা কী? এত তাড়াতাড়ি যে এর রিটার্ন পাবে, সেটা আশা করোনি নিশ্চয়ই?"

ক্যাবা বলল, "আর তো এখন শোধরাবার সময় নেই রে। আমার অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু তোরা কারা? তোদের তো দেখিনি কখনও?"

"আমাদের তুমি চিনবে না। রোজ বিকেলে আমরা এই রেলবাঁধে বেড়াতে আসি।"

ক্যাবা বলল, "বুঝেছি। সোলেমানের মেয়েটার দেখাশোনা করিস তোরা। তাই না?"

"হ্যাঁ। কিন্তু ওই মেয়েটাকে তোমরা কোথায় পাচার করলে ক্যাবাদা? তুমি একবার বলো। আমরা যেভাবেই হোক তাকে উদ্ধার করব।"

"আমি কিছু জানি না রে। তবে আমিই ওকে এখান থেকে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছি। মঞ্জুদা ওকে…।"

"কী হল! বলো, বলো। মঞ্জুদা ওকে কোথায় রেখেছে?"

ক্যাবার কণ্ঠস্বর জড়িয়ে গেল। অস্পষ্টভাবে সে যে কী বলল, তা বোঝা গেল না।

ততক্ষণে বাঁধের ওপরে উঠে পড়ায় ওদের দেখতে পেয়ে বস্তির লোকজন সব হইহই করে ছুটে এল।

ডগার, মালিনীও এল ওদের দেখে।

তাতার ক্যাবার পকেট হাতড়ে টাকা-পয়সা যা ছিল সব বার করে নিল।

ক্যাবার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল পথের ধুলোয়। একফোঁটা জলও শেষ সময় মুখে পড়ল না ওর। ক্যাবার বৃদ্ধা মা সেই বাহাত্তুরে বুড়ি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলের বুকে। তার অন্তিম হাহাকারে আকাশ-বাতাস ভরে উঠল।

তাতার নোটগুলো ওর মায়ের হাতে দিয়ে বলল, "এই নিন। আপনার ছেলে এগুলো দিতে বলেছে আপনাকে।"

বুড়ি সেই নোটগুলো একবার মুঠো করে ধরল। তারপর হাউহাউ করে কেঁদে বলল, "না, না। এই পাপের অর্থ আমি আর নেব না। আমার ক্যাবাকে যদি কেউ ফিরিয়ে দিতে পারো তো ফিরিয়ে দাও। এ টাকা আমার চাই না।" বলেই টাকাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল বুড়ি।

দমকা বাতাসে একশো টাকা ও দশ টাকার নোট ঝরা পাতার মতো উড়তে লাগল। বস্তির ছেলে-ছোকরাগুলো ছুটল সেই টাকার পিছু-পিছু। তাতার, দেবু ও শঙ্কু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ওরা ডগার ও মালিনীকে নিয়ে ওদের বাড়িতে ফিরে এল।

সন্ধের পর ওপরের ঘরে বসে তাতার আর টিঙ্কু যখন দুপুরের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে, তেমন সময় হঠাৎ বাড়ির সামনে বাইকের শব্দ শোনা গেল।

ডগার লনেই ছিল। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে "আঁউ, আঁউ" করে ছুটে গেল সে।

তাতার ওপর থেকেই হেঁকে বলল, "ডগার! ফিরে এসো। আমাদের সেন্টুদা।"

ডগার তবু একবার "আঁউ, আঁউ" করে ডাকল।

সেন্টুদা বাইকটাকে গেটের ভেতরে ঢুকিয়ে লনের একপাশে রাখল।

ডগার গিয়ে শুঁকতে লাগল সেন্টুদাকে।

সেন্টুদা "মাসিমা, মাসিমা!" বলে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর।

ডগার তখন সেন্টুদার গায়ে গা ঘষে শুরু করল আত্মীয়তা। সেন্টুদা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল।

নন্দা দেবী সেন্টুদার গলা পেয়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন, "কী ব্যাপার সেন্টু! এতদিন আসোনি কেন?"

"সময় পাইনি মাসিমা। নাটক নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। তাতার কোথায়?"

"ওপরের ঘরে আছে। যাও না।"

"আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে। যা হোক কিছু খাবার, সেই সঙ্গে এক কাপ চা শিগগির নিয়ে আসুন।" বলেই তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল সেন্টুদা।

সেন্টুদাকে দেখে বুকে যেন বল পেল তাতার। বলল, "আমি ভাবতেই পারিনি তুমি আসবে।"

সেন্টুদা বলল, "দরজাটা বন্ধ করে দে। একটা সিগারেট ধরাই।"

টিঙ্কু দরজা বন্ধ করল।

সেন্টুদা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "তোর এই ঘরটা কিন্তু একসেলেন্ট। একেবারে আইডিয়াল যাকে বলে। এ-ব্যাপারে তুই কিন্তু খুব লাকি।"

তাতার বলল, "সিনেমা দেখলে?"

"দেখলুম। যতটা ভেবেছিলুম ততটা নয়। ওদিককার খবর কী বল। বুড়ির ছেলের পিছনে গোয়েন্দাগিরি করেছিলি?"

"করেছিলুম। তোমার অনুমানই সত্য।"

"কীরকম?"

সেন্টুদাকে সব কথা খুলে বলল তাতার।

বেশ মন দিয়ে তাতারের কথাগুলো শুনে সেন্টুদা বলল, "এবার বুঝতে পেরেছি ওরা কারা। শানপুরের লালজি কিন্তু মোস্ট ডেঞ্জারাস। আর তার থেকেও ডেঞ্জারাস ওই মঞ্জু লোকটা। ও পারে না এমন কোনও কাজ নেই।"

"তুমি ওদের চেনো?"

"আমার সঙ্গে পরিচয় নেই। তবে ওদের কথা বিভিন্নজনের মুখে অনেক শুনেছি। তা ছাড়া, মঞ্জু এখানকার লোকই নয়। ওর বাড়ি বিহারের কোথায় যেন।"

"সোনাই উদ্ধারের তা হলে কী হবে সেন্টুদা?"

"হবে রে বাবা, হবে। তার আগে দেখতে হবে মেয়েটাকে ওরা কোথায় রেখেছে। তোরা তো ধরেও ধরতে পারলি না লোকটাকে। কোনওরকমে ওই ভিকিটাকে যদি ধরতে পারতিস, তা হলে দু-চার ঘা চড়চাপড় দিলেই সব কথা বেরিয়ে আসত।"

"সেটা তো লালজির বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে গ্রেট করেও হতে পারে।"

সেন্টুদা হেসে বলল, "পারে। তবে সেরকম আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ আমার হাতে নেই। লালজির কাছে পৌঁছবি কী করে? লালমহলের গায়ে যে-বাড়িতে ও থাকে, সেই বাড়ির চৌহদ্দিতে চারটে হাউন্ড অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করে। তাদের নজর এড়িয়ে ওই বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করার সাধ্য যমেরও নেই।"

"বলো কী! যদি পুলিশ নিয়ে ঢুকি আমরা?"

"মেয়েটাকে ফিরে পাবার একটু সম্ভাবনাও যদি থাকত কোথাও, সেটুকুও তা হলে চলে যাবে। তা ছাড়া তুই তো জানিস, পুলিশের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ভাল নয়। ওই ওদের সঙ্গে হাত মেলালে আমাকে ছাড়তে হবে ভাই।"

"না, না, সেন্টুদা। আমরা পুলিশের কাছে যাব না।"

এমন সময় দরজায় টকটক শব্দ। মায়ের গলা শোনা গেল, "হ্যাঁ রে, শুধু-শুধু দরজা বন্ধ করে রেখেছিস কেন?"

তাতার ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

নন্দা দেবী লুচি হালুয়া আর চায়ের প্লেটটা সেন্টুদার হাতে দিয়ে বললেন, "এদিকের খবর সব শুনেছ তো? সোনাইকে চুরি করে নিয়ে গেছে। ওদের বস্তিতে আগুন লাগিয়েছে। কী অত্যাচার করেছে সব।"

সেন্টুদা খাবার খেতে-খেতে বলল, "এ আর নতুন কথা কী মাসিমা। এইরকম তো আজকাল সর্বত্র হচ্ছে।"

"তা তুমি যখন এসেছ তখন একটু চেষ্টা করে দ্যাখো না বাবা, মেয়েটাকে কোনওরকমে উদ্ধার করতে পারো কি না।"

"দেখছি, দেখছি। তাতার আমাকে সকালেই বলেছিল। তবে অন্য দু-একটা ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম বলে কিছু করতে পারিনি।"

"মেয়েটার জন্যে ভীষণ মনখারাপ হয়ে গেছে।"

সেন্টুদা খাবার খেয়ে চায়ে চুমুক দিল। হঠাৎ মনে হল, সেন্টুদা যেন খুব বেশি গম্ভীর হয়ে গেছে। সেন্টুদা যখন গভীরভাবে কোনও কিছু চিন্তা করে, তখন এইরকমই গম্ভীর এবং অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

তাতার একদৃষ্টে সেন্টুদার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সেন্টুদা একসময় শূন্য পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে হাতের রিস্টওয়াচে সময় দেখল। তারপর বলল, "আজ তা হলে আসি?" তারপর তাতারের দিকে চেয়ে বলল, "তুই কাল একবার পারিস তো সকালের দিকে আমার সঙ্গে দেখা করিস।"

তাতার ঘাড় নাড়ল। তারপর নীচে নেমে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল সেন্টুদাকে।

সেন্টুদা বাইক নিয়ে ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল। সেন্টুদার ভাব দেখে মনে হল, সোনাইয়ের ব্যাপারে কিছু-একটা চিন্তা করছে। এখন এই দুঃসময়ে সেন্টুদাই ওদের বল এবং ভরসা। সেন্টুদা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবল তাতার। তারপর কাউকে কিছুই না বলে চুপিচুপি এসে হাজির হল শঙ্কুদের বাড়ি।

শঙ্কুর মা বললেন, "কী হল তাতার? সোনাইয়ের কোনও সন্ধান পেলে?"

"না, মাসিমা।"

"তা হলে এমন অসময়ে?"

"শঙ্কুকে নিতে এলাম। ও আজ আমাদের বাড়ি থাকবে। আমরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে এক ঘরে শোবো আজ।"

শঙ্কুর মা হাসিমুখে বললেন, "হঠাৎ কী ব্যাপার!"

"ব্যাপার কিছুই নয়। ডগার আর মালিনীকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছি তো! তাই ওদের নিয়ে আজ আমরা একটু হইচই করতে চাই।"

"ও বুঝেছি। শঙ্কুকে বলো। যদি ও যেতে রাজি থাকে তা হলে আমার কোনও আপত্তি নেই।"

শঙ্কু তো এক লাফে লম্বা।

এইভাবে দেবুকেও ডাকা হল।

তাতার বলল, "শোন, আমার মনে হয় সোনাইয়ের ব্যাপারে বড্ড বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে একটি বস্তিতে আগুন লেগেছে। দু-দুটো খুন হয়ে গেছে। কাজেই খুনিরা পুলিশের হাতে ধরা পড়বে বলে যে এই হাওড়া শহরেই চুপ করে বসে থাকবে, তার কোনও মানে নেই। তা ছাড়া বেশি দেরি করলে সোনাইকে হয়তো দূরে কোথাও পাচার করে দিতে পারে ওরা। এখনই কী করেছে তা কে জানে? সেইজন্য ভাবছি আমরা আজ রাত্রি থেকেই আমাদের কাজ শুরু করে দিই।"

শঙ্কু বলল, "কীভাবে কী করবি?"

"ভাবছি ডগার আর মালিনীকে সঙ্গে নিয়ে আজ রাত্রে লালমহল অভিযান করলে ক্ষতি কী?"

দেবু ভয়ে-ভয়ে বলল, "তোর আইডিয়াটা মন্দ নয়। তবে শানপুর তো এখান থেকে অনেক দূর।"

শঙ্কু বলল, "হাওড়া থেকে দিল্লি যতদূরে ততদূর নিশ্চয়ই নয়। শানপুরে যাবই এবং লালমহল আক্রমণ করে উদ্ধার করবই সোনাইকে। ওর জন্য আমার জীবন দিয়ে দেব। কেননা, সেবারে ও না থাকলে আমাকে আর বেঁচে ফিরতে হত না।"

দেবু বলল, "কিন্তু আমরা যে যাব, তোর বাড়িতে জানতে পারবে না তো?"

"না। বাপি, মা ঘুমিয়ে পড়লে তবেই যাব। একটা নাইলনের দড়ি বারান্দার গ্রিলে বেঁধে নীচে নামব আমরা। তারপর ডগার, মালিনীকে নিয়ে কেটে পড়ব।"

শঙ্কু বলল, "ঠিক। তবে একটা কথা। একেবারে নিরস্ত্র থাকাটা কিন্তু উচিত হবে না আমাদের।"

তাতার বলল, "নিরস্ত্র থাকব কেন? ও-ব্যাপারে আমিও একটু ভেবে দেখেছি। আমার কাছে দুটো পেনসিল-কাটা ছুরি আছে। আর-একটা কিনে নিলেই তিনজনের তিনটে হবে।"

দেবু বলল, "কেনবার দরকার নেই। ওরকম ছুরি আমার কাছেও আছে। একটু দাঁড়া। এক্ষুনি নিয়ে আসছি।" বলেই এক ছুটে বাড়ির ভেতর ঢুকে একটা ছুরি নিয়ে তক্ষুনি ফিরে এল দেবু।

এর পর ওরা তিনজনে নিজেদের মধ্যে নানারকম কথা বলতে-বলতে তাতারের বাড়িতে এল।

তাতার মাকে বলল, "মা, আজ আমরা সবাই একসঙ্গে থাকব। তোমার কোনও আপত্তি নেই তো? তুমি ওদের জন্যও একটু খাবার তৈরি করো।"

"বেশ তো। এ তো খুবই ভাল কথা। শুধু আজ রাত্রে কেন, যে ক'দিন এইসব ঝামেলা না মেটে, সে-ক'দিন তোরা রোজই একসঙ্গে থাক না। তারপর সোনাইকে পাওয়া গেলে তখন ওরও একটা ব্যবস্থা করা যাবে। এত বড় দালানটা রয়েছে,একটা ক্যাম্প খাট পেতে দিলে দিব্যি মেয়ের মতো থাকবে ও। তা ছাড়া বাড়িতে একটা তেজী কুকুর-টুকুর থাকাও ভাল।"

এমন সময় কথা বলতে-বলতে তাতারের হঠাৎ কী যেন মনে হতেই শঙ্কু, দেবুকে টিঙ্কুর সঙ্গে ওপরে যেতে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ও।

মা ডাকলেন, "এই কোথা যাচ্ছিস? শোন!"

"আমি এক্ষুনি আসছি।"

"এই রাত-বিরেতে একা কোথাও যাবি না। দোহাই তোর। শোন, শুনে যা।"

"বলছি তো এক্ষুনি আসছি।"

"তোকে কোথাও যেতে হবে না।"

তাতার ডাকল, "ডগার!"

ডগার এইরকম একটা ডাকেরই প্রতীক্ষা করছিল বুঝি। তাই "আঁউ" করে একটা লাফ দিয়ে ছুটল তাতারের সঙ্গে।

তাতার অবশ্য দেরি করল না। মিনিট-দশেকের মধ্যেই ফিরে এল আবার। ওর হাতে কাগজে মোড়া একটা কী যেন। ঠোঁটের কোণে চোরা-হাসি।

দেবু, শঙ্কু অবাক হয়ে বলল, "কী রে! হঠাৎ কী হল তোর? কোথায় গিয়েছিলি?"

"একটা লোহার আংটা আর কুড়ি ফুটের মতো লম্বা নাইলনের দড়ি আনতে। না হলে কী নিয়ে অভিযান করব? রাত দুপুরে লালমহলে চড়াও হব কী করে?"

শঙ্কু, দেবু, তাতারের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না।

টিঙ্কু বলল, "দাদা! আমি যাব না?"

"না রে। পথের দূরত্ব অনেক। তা ছাড়া সবাই গেলে ঘর দেখবে কে?"

এরপর খেয়েদেয়ে ওরা প্রতীক্ষা করতে লাগল বাবা-মা'র ঘুমিয়ে পড়ার। বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়লে রাত একটু গভীর হলেই শুরু হবে ত্রিমূর্তির অভিযান। তাতারের দ্বিতীয় অভিযান। দেওয়াল-ঘড়ির টিকটিক শব্দে ওদের উত্তেজনা বাড়ল। রাস্তায় একটা কুকুর ডাকল, ঘেউ-ঘেউ-উ···।

রাত বারোটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গেই তৎপর হয়ে উঠল ওরা। শঙ্কু, দেবু, তাতার—তিনজনেই বারান্দার গ্রিলে নাইলনের দড়ি বেঁধে ঝুপঝাপ নেমে পড়ল নীচে।

ডগার, মালিনী নীচেই ছিল। তাই ওদের নিতে অসুবিধে হল না।

তাতারের হাতে টর্চ। তিনজনের কাছেই ছুরি। এই নিয়ে এই দুঃসাহসিক নৈশ-অভিযান শুরু করল ওরা।

ওরা নীচে নামলে গ্রিলের দড়িটা ওদের নিয়ে যাবার জন্য খুলে দিল টিঙ্কু। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইল চুপচাপ। একা শুতে একটু ভয় করল যদিও, তবুও সে-ভয়কে জয় করল ও।

এগিয়ে চলল তাতার-বাহিনী।

এই রাতের অন্ধকারে দূরে কোথাও যাওয়ার বিপদ, পথে কুকুরের তাড়া-খাওয়া, দুষ্টু লোকেদের হাতে পড়া, কিংবা পুলিশের মুখোমুখি হওয়া। তবু ওরা সাহসে বুক বেঁধে অন্ধকার গলিপথ ধরে এগিয়ে চলল। বেশ কিছুদূর গিয়ে বড় রাস্তায় আসতেই হঠাৎ একটা ট্যাক্সি নজরে পড়ল ওদের।

তাতার চেঁচাল, "ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!"

ট্যাক্সি-ড্রাইভার হাত নেড়ে বলল, "যাবে না।"

"প্লিজ। একটু দয়া করুন দাদা।"

ট্যাক্সিটা কাছে এনে ড্রাইভার বলল, "আমি এখন গাড়ি গ্যারাজে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এত রাতে তোমরা যাবে কোথায়?"

তাতার বলল, "সে-কথা বলা যাবে না। তবে আমাদের খুব

বিপদ। আমরা লালমহলের কাছে যাব। কত ভাড়া নেবেন বলুন ?"

ড্রাইভার একটু চিন্তা করে বলল, "ভাড়া দিতে হবে না, এইটুকু একটা ছোট্ট ট্রিপ, এর আর কী ভাড়া নেব ? তবে আমি কিন্তু অত দূর যেতে পারব না। ইছাপুর পানি ট্যাঙ্কির কাছে নামিয়ে দেব। ওখান থেকে লালমহল বেশি দূর নয়। যেতে পারবে ?"

"খুব পারব।"

"ও-রাস্তা কিন্তু খুব খারাপ।"

তাতার একটু হেসে ডগারের পিঠ চাপড়ে ডগারকে একবার দেখিয়ে দিল।

ড্রাইভার এক নজর তাকিয়েই ইঙ্গিত বুঝে গেল ওদের।

ফাঁকা রাস্তায় ছুটে চলল ট্যাক্সিটা। মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল পানি ট্যাঙ্কির কাছে।

লালমহল এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ওরা নির্ভয়ে এগিয়ে চলল। হাওড়া শহরের এই সমস্ত অঞ্চলে মাঝেমধ্যে দিনের বেলায় আলো জ্বললেও রাত্রিবেলা কখনও আলো জ্বলে না। এইটাই যা সুবিধে। ওরা তাই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে পথ চলার সুবিধে পেল।

সামান্য কিছু পথ গিয়েই বিখ্যাত লালমহল দেখতে পেল ওরা। একপাশে হোটেল। একপাশে দোতলা বাড়ি। দুটোই লালমহল। অবশ্য এই যে হোটেল, এটা আসলে হোটেল-কাম-রেস্টুরেন্ট। এখানে অনেক লোকের একত্রে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই।

ওরা পায়ে-পায়ে সেই দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দেখল বাড়ির সামনের সেই ফটকটা ভেতর থেকে বন্ধ। ফটকের ওপর বড়-বড় করে লেখা 'কুকুর হইতে সাবধান'। বাড়িটাও অন্ধকার। চারপাশ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বলে নীচের তলার অবস্থাটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে ওপরের দুটো ঘরে আলো জ্বলছে। বাড়িটা এমনই কায়দায় তৈরি যে, এ-বাড়িতে ঢুকতে গেলে পাঁচিল টপকাতেই হবে। আর পাঁচিল টপকাতে যাওয়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। কেননা, এ-বাড়ির প্রহরী-কুকুরের নজর এড়িয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করা একেবারেই অসম্ভব।

তবুও তাতার চিন্তা করল। তারপর একটু ভেবে মালিনীকে উঠিয়ে দিল পাঁচিলের ওপরে।

মালিনী পাঁচিলে উঠেই টুকটুক করে লাফিয়ে চারদিক ঘুরে এল একবার। তারপর ওদের কাছে এসে "মু,মু" করে কী যেন বলল।

মালিনীর সে-কথার অর্থ কেউ বুঝল না।

দেবু ও শঙ্কুকে পাঁচিলের কাছে ডেকে এনে ওদের কাঁধে ভর দিয়ে পাঁচিলে উঠল তাতার।

যেই না ওঠা অমনি চার-চারটে হিংস্র হাউন্ড বিকট চিৎকার করে ওকে হাঁ করে গিলতে এল।

শিউরে উঠল তাতার। সে কী দারুণ চিৎকার। সেই চিৎকারের শব্দে মনে হল হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনও স্তব্ধ হয়ে যাবে বুঝি। তবু ও নিজেকে সামলে নিল। কেননা, এরকম তো অপ্রত্যাশিত নয়। এর জন্য ও তৈরি হয়েই এসেছিল। সেন্টুদার মুখে এই হাউন্ডগুলোর কথা শুনেই ওদের মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা ও করে এনেছিল। সেই যে ওদের পাড়ার হিতুদা, যে নাকি সাইকেল আর মোটরগাড়ির হাওয়া খুলে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখত, তার কাছ থেকেই চার-চারটে বিষমাখানো ময়দার ডেলা গোপনে সংগ্রহ করে পকেটের মধ্যে

আকাশে ওড়ার কথা □ আট

পক্ষিমানব অটো লিলিয়েন্থাল

ঠিক একশো বছর আগে ১৮৮৯ সালে আবির্ভাব ঘটল জার্মান এঞ্জিনিয়ার ও আবিষ্কারক অটো লিলিয়েন্থালের। তিনি ওই সময়ে 'পাখিদের ওড়ার কৌশলই বিমান-বিজ্ঞানের ভিত্তি' নামে এক বই লেখেন। নিজের লেখা অনুযায়ী বিরাট-বিরাট গ্লাইডার তৈরি করলেন লিলিয়েন্থাল ও নিজেই তা নিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন। তিনি নিজের শরীরে গ্লাইডার বেঁধে একটি খাড়া পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপ দিতেন ও বাতাসে ভাসতে-ভাসতে নীচে নামতেন। এইভাবে পরীক্ষামূলক ওড়ায় তিনি ৮০০ ফুট অবধি দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পাখিদের মতো নমনীয় ডানার বদলে শক্ত ডানা ও ওড়ার শক্তির জন্য

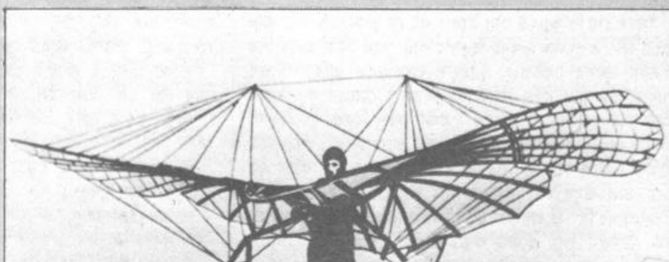

হালকা ছোট এঞ্জিন লাগানোর পরিকল্পনা করেন। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে গেল ১৮৯৬-এর ৯ অগস্ট। ওড়ার সময়ে ৫০ ফুট উচ্চতা থেকে মাটিতে পড়ে গুরুতর আহত হন লিলিয়েন্থাল ও পরদিন মৃত্যু হয় এই পক্ষিমানবের।

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

লুকিয়ে রেখেছিল। হাউন্ডগুলো হাঁ করে ছুটে আসতেই সেগুলো টপাটপ ছুঁড়ে দিল ওদের মুখে। ওরাও বলের মতো সেগুলো লুফে নিয়ে গিলে ফেলল গপাগপ।

আর-এক মুহূর্ত নয়। তাতার ধুপ করে লাফিয়ে পড়ল পাঁচিলের ওপর থেকে। তবে ভেতরে নয়। বাইরে। লাফিয়ে পড়েই শঙ্কু, দেবু ও ডগারকে নিয়ে ছুটে খানিকটা তফাতে গিয়ে একটু নিরাপদ দূরত্বে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বসে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল।

হাউন্ডগুলো চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই লালমহলের দোতলার আলো জ্বলে উঠল।

একজন নেপালি দরোয়ান গেট খুলে বাইরে এসে দেখল একবার। তারপর কাউকেই দেখতে না পেয়ে আবার গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

ওদিকে মালিনী তখন জোর খেলা দেখাচ্ছে পাঁচিলের ওপর। পাঁচিলময় ছুটোছুটি করে "কক, কক" শব্দে তেড়ে যাচ্ছে হাউন্ডগুলোকে। কখনও দাঁত খিঁচোচ্ছে, কখনও ভ্যাংচাচ্ছে, তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে। কী যে করছে না তা বলবার নয়। একবার পাঁচিল থেকে বারান্দায় লাফাচ্ছে। আর-একবার বারান্দা থেকে পাঁচিলে।

ওপরের বারান্দা থেকে কে যেন একজন "হ্যাট, হ্যাট" শব্দ করে বলল, "আরে ও কুছ নেহি। বান্দর।"

হাউন্ডগুলো তখনও গোঁ-গোঁ করে গর্জন করছে।

একটু পরেই ওপরের আলো নিভল। আর আলো নেভারও বেশ কিছুক্ষণ পরে স্তিমিত হয়ে এল হাউন্ডগুলোর কণ্ঠস্বর।

তবু আরও কিছুটা সময় চুপচাপ বসে রইল ওরা। তারপর তাতার বলল, "যাক, আর ভয়ের কিছু নেই। এবার নির্ভাবনায় কাজ করা যাবে। আমি পাঁচিল টপকে উঠোনে নেমেই ফটকের গেট খুলে দেব। তোরা ডগারকে নিয়ে ঢুকে পড়বি।"

দেবু, শঙ্কু সশঙ্কিত হয়ে বলল, "সে কী! ওই কুকুরগুলো?"

"ওগুলো আর চেঁচাবে না। তেড়েও আসবে না। ওদের আমি বিষ দিয়েছি।"

"বিষ দিয়েছিস? বিষ কোথায় পেলি? কই, এ-কথা আগে বলিসনি তো?"

"সব রহস্য কি আগেই ফাঁস করে? ওই যে তখন আমি দড়ি আর আংটা কিনতে গেলাম তখনই হিতুদার কাছ থেকে নিয়ে এলাম বিষ মাখানো ময়দার লেচিগুলো। হিতুদা তো রোজ রাত্রিবেলা ওর দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরে। ফাঁসিতলার মোড়ের কুকুরগুলো তখন বড্ড জ্বালাতন করে ওকে। যখন দারুণ বিরক্ত হয় হিতুদা, তখন দু-একটা এইরকম ডেলা ছুঁড়ে দেয় ওদের দিকে। সেইজন্যই আমিও এ-কাজ করলাম। ওই হিংস্র হাউন্ডগুলোকে জব্দ করার এর চেয়ে ভাল ওষুধ আর কোথায় পাব?"

তাতারের বিষ-প্রয়োগ অব্যর্থ। সেই বিষের প্রভাবে চারটি কুকুরই তখন উঠোনে শুয়ে ছটফট করছে।

যাই হোক, দেবু, শঙ্কুর কাঁধে ভর দিয়ে তাতার আবার পাঁচিলে উঠল।

ওকে দেখেই মালিনী দারুণ উত্তেজনায় মু মু করে ছুটে এল ওর কাছে। লালমহলে তখন গভীর নীরবতা।

তাতার মালিনীর হাতে আংটা লাগানো দড়িটা দিয়ে বারান্দার গ্রিল দেখিয়ে দিতেই মালিনী বুঝে গেল কী কাজ তাকে করতে হবে। দড়িটা হাতে নিয়ে সে এক লাফে বারান্দায় গিয়ে বেশ কায়দা করে আটকে দিল আংটাটা।

তাতার দু-একবার টেনে দেখল। তারপর ঝুলে পড়ল দড়ি ধরে। তবে এই ঝুলে পড়াটা বড় রিসকের। কারণ, এইভাবে ঝুলে পড়ার একটাই অসুবিধা যে, পাঁচিল ও দেওয়ালের ব্যবধানটুকু দোলার মতো, দুলে ঝুলতে হয়। পাঁচিল থেকে নীচের উঠোনে তাতার লাফিয়েও নামতে পারত। কিন্তু তাতে শব্দ হবার সম্ভাবনা ছিল। এতেও শব্দ হল একটু। তবে তা অত্যন্ত মৃদু। দড়ি ধরে দোল খেয়ে ও যখন ওদিকের দেওয়ালটাকে পা দিয়ে চেপে ধরল, তখন 'থপ' করে শব্দ হল একটা। তবে তা এতই মৃদু যে, কেউ শুনতে পেল না।

এবার দড়ি ধরেই উঠোনে নামল তাতার। কুকুরগুলো তখন চারদিকে বমি করে একাকার করেছে। মরণ-যন্ত্রণায় ছটফট করছে তখনও। দেখে মায়া হল তাতারের। অথচ এ ছাড়া কোনও উপায়ও তো ছিল না। উঠোনে নেমেই ও তাড়াতাড়ি গেটের দরজা খুলে দিতে গেল। কিন্তু না। গিয়ে দেখল, গেটের ডোর বোল্টে ভারী একটা তালা ঝুলছে। এ নিশ্চয় ওই নেপালি দরোয়ানটার কাজ। তাতার উঁকি মেরে দেখল পাশেই একটি ছোট্ট ঘরে ডিমলাইট জ্বেলে একটা তক্তপোশের ওপর আরামে ঘুমোচ্ছে দরোয়ানটা।

তাতার সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে এক মিনিট কী ভাবল। তারপর বাইরে থেকে দরজায় শিকল দিয়ে সেই ঝোলানো দড়ি বেয়ে চড়চড় করে উঠে গেল ওপরে।

মালিনীও ওর সঙ্গ নিল।

ওপরে অনেক ঘর। কিন্তু সব ঘরেই প্রায় তালা দেওয়া। এসব ঘরে কী যে আছে তা কে জানে। হয়তো এইরকমই একটি ঘরের ভেতরে বন্দিনী আছে সোনার মেয়ে সোনাই।

একটার পর একটা ঘরের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে মাত্র দুটো ঘরে ও আলো জ্বলতে দেখল। এই সব দেখে তাতারের মনে হল, এত বড় লালমহলে কোনও ফ্যামিলি থাকে না। লালাজির এই প্রাসাদ আসলে একটা শত্রুপুরী। সে যাক। যে-ঘর দুটিতে আলো জ্বলছে তার একটির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তাতার আস্তে-আস্তে সেই দরজাটার ডোর বোল্ট এঁটে দিল। তারপর অন্য যে ঘরটায় আলো জ্বলছিল সেই ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল তাতার। সেটিও বন্ধ। তবে ভেতর দিকে লক করা নয়। সেই ঘরের ভেতর থেকে কয়েকজন লোকের কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কথাগুলো আরও পরিষ্কারভাবে শোনার জন্য আঙুলের চাপ দিয়ে দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করতেই তাতার দেখল, সেই ভীষণদর্শন ন্যাড়া-মাথা লোকটি দরজার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

দরজা ঠেলতেই লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, "কে? কে ওখানে? দ্যাখ তো জুলি, মনে হল কে যেন উঁকি মারছে।"

কিন্তু দেখবে কে? তার আগেই তাতার দরজাটা টেনে ডোর বোল্ট এঁটে দিয়েছে।

লোকগুলো ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচাতে লাগল ভেতর থেকে, "খোল, খোল বলছি। দরজা খোল।"

তাতার হেঁকে বলল, "এ-দরজা আমি খুলছি না। একেবারে পুলিশ এসে খুলবে।"

ততক্ষণে পিছন দিক থেকে জনাচারেক ডাকাতের মতো লোক ছুটে এসে ধরে ফেলেছে ওকে। একা মালিনী আঁচড়ে-কামড়েও পেরে উঠল না ওদের সঙ্গে। দু'জন তাতারকে ধরল, বাকি দু'জন লাঠি-বন্দুক নিয়ে তেড়ে গেল মালিনীর দিকে।

একজন দু-এক ঘা লাঠির বাড়ি দিতেই মালিনী লাফিয়ে পড়ল পাঁচিলে। তারপর ছুটে গিয়ে "কক, কক" শব্দ করে সতর্ক করে দিল দেবু ও শঙ্কুকে। শঙ্কু, দেবু মালিনীর সঙ্কেত কিছুই বুঝল না। তবে ডগার কিন্তু বিপদের গন্ধ পেয়ে ঘন ঘন লেজ নাড়তে লাগল।

ছবি : অনুপ রায়

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল

১৮৭৫-'৭৬ সাল। জলপাইগুড়ি জেলায় তখন একটিও উচ্চ বিদ্যালয় নেই। শিক্ষার প্রসার বলতে সারা জেলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ক'টি টোল, সেখানে পণ্ডিতমশাইরা ছাত্রদের সংস্কৃত পড়াতেন। শুধু জলপাইগুড়ি জেলাই বা কেন, সারা উত্তরবঙ্গে সাধারণভাবে হয়তো সেই সময় দু-তিনটির বেশি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না। ১৮৭৬ সালে মাত্র ২০০ টাকা সরকারি অনুদান নিয়ে ক'জন শিক্ষানুরাগী মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে ওঠে এই বিদ্যালয়।

তাই জলপাইগুড়ি জেলার যাবতীয় অগ্রগতির ইতিহাসে এই বিদ্যালয়ের অবদান অপরিসীম। এই বিদ্যালয় স্থাপনের মাত্র ১৯ বছর আগে এই জেলার প্রবর্তন হয়। যে চা শিল্পকে নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার অর্থনীতি এত মজবুত তারও সূচনা হয় এই বিদ্যালয় স্থাপনের ১০ বছর পরে। সুদীর্ঘ ১১৩ বছরের এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কত উত্থান-পতন কত বিচিত্র ঘটনার নীরব সাক্ষী।

জলপাইগুড়ি শহরের প্রায় একপাশে মিউনিসিপ্যালিটির একটি সরু রাস্তার গা ঘেঁষে যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে স্কুলটি। চারদিকে বেশ শান্ত পরিবেশ, শহরের হইহল্লোড় চেঁচামেচি স্পর্শ করতে পারেনি। পেছনে তিস্তা নদীর বাঁধ, মাঝখানে বিশাল সবুজ মাঠ, মাঠের তিনপাশে স্কুল ভবন, এখানে-ওখানে পরিকল্পনামাফিক লাগানো কিছু গাছপালা— সব মিলিয়ে চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো স্নিগ্ধতা যেন পাহারা দিচ্ছে স্কুলটিকে সব সময়।

প্রধানশিক্ষক

কথা প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার জানালেন, "পড়াশোনা এবং খেলাধুলোর জন্য প্রথম থেকেই এই স্কুলের নামডাক। তাই ছাত্র ভর্তি নিয়ে আমাদের ভীষণ ঝামেলায় পড়তে হয়। সকলেই চান তাঁদের ছেলেকে এই স্কুলে পড়াতে, কিন্তু আমাদেরও তো ক্ষমতার একটা সীমা আছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র বাছাই-এর প্রশ্নটা এসে যায়— অনেক সময় তাতেও পারা যায় না।"

শ্যামাপ্রসাদবাবু এক সময় এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন, এর আগে তিনি কালিম্পং সরকারি

বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। এই স্কুলে আছেন ১৯৮৫ সাল থেকে। স্কুল সম্পর্কে তিনি বললেন, "এই স্কুলের বহু প্রাক্তন ছাত্র আজ দেশ-বিদেশে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে বিখ্যাত হয়ে আছেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও নৃতাত্ত্বিক ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল এই স্কুলেরই ছাত্র। এই স্কুলেরই ছাত্র প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার, দেবেশ রায়, কবি শামশের আনোয়ার, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী নির্মল বসু, অর্কপ্রভ দেব, আই-এ-এস- প্রমুখ। বর্তমানের দিকে তাকালে অতীতের সেই ধারাবাহিক ঐতিহ্য আমরা যে এখনও ধরে রাখতে পেরেছি তার প্রমাণ মেলে। মাধ্যমিকে প্রায় প্রতি বছরই আমাদের স্কুলের ছাত্ররা জেলায় একটা বিশেষ স্থান দখল করে নেয়।" স্কুলে খেলাধুলোর চর্চাও নিয়মিত হয়। স্কুলের নিজস্ব একটি মাঠও রয়েছে। খেলাধুলোর ক্ষেত্রে এই স্কুলের ছাত্ররা জেলায় বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। স্কুলে একটি বিশাল লাইব্রেরি আছে যার বইয়ের সংখ্যা আট থেকে দশ হাজারের মতো, এর মধ্যে বহু মূল্যবান বইও আছে। প্রধানশিক্ষক শ্যামাপ্রসাদবাবু জানালেন, "আরও অনেক বই ছিল। ১৯৬৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় প্রচুর বই এবং স্কুলের জরুরি কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যায়। তবু এখনও যা বই আছে তার সংখ্যাও কম নয়। লাইব্রেরিয়ান চেয়েও পাচ্ছি না। লাইব্রেরিয়ানের অভাবে অনেক মূল্যবান বই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে…"

স্কুলে একটি ছাত্রাবাস ছিল। দূরের ছেলেরা সেখানে থাকত। ১৯৭০-৭১ সালে রাজনৈতিক ঝামেলার জন্য ছাত্রাবাসটি বন্ধ হয়ে যায়। স্কুলে বর্তমান ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৮০০, শিক্ষকের সংখ্যা ৩৫ জন। স্কুলের পঠন-পাঠনের ব্যাপারে বলতে গিয়ে সহকারী প্রধানশিক্ষক সুশীলচন্দ্র ভৌমিক জানালেন, "আমরা ছাত্রদের সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে চিন্তাভাবনা করি সব সময়। যতটা পারি হাতে-কলমে বোঝানোর চেষ্টা করি। যার জন্য প্রতিটি ক্লাসে আমরা বিভাগ করি ভালমন্দ মিশিয়ে। যেমন ক্লাসের প্রথম ছাত্রকে দিলাম 'এ' বিভাগে। দ্বিতীয়কে দিলাম 'বি' বিভাগে। যাতে ভাল ছাত্রদের সঙ্গে থেকে অন্যান্য ছাত্রও ভাল হওয়ার একটা সুযোগ পায়। আমাদের যে ল্যাবরেটরি আছে অনেক কলেজেও তা নেই। ল্যাবরেটরি-অ্যাসিসট্যান্টও আছেন। সহকারী প্রধান শিক্ষক একটু আক্ষেপের সুরে বললেন, "আমাদের দুঃখ অন্য জায়গায়। আজকাল যে সব ছেলে পাশ করেই শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসেবে নিচ্ছে, তাদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব দেখা যাচ্ছে। সব ক্ষেত্রে নয় অবশ্য। আমি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতা করছি, আমাদের সময় এটা ছিল না। শিক্ষকতা করতে গেলে যে আদর্শ ও নীতিবোধ থাকা দরকার, কেন জানি না ইদানীং তার অভাব চোখে পড়ে।"

ইংরেজির শিক্ষক কমলকান্তি দে বললেন, "ইংরেজি নিয়ে একটু অসুবিধে হচ্ছে এটা ঘটনা— তবে আমরা এটাকে কোনও সমস্যা মনে করি না। ক্লাস সিক্স থেকে এখন ইংরেজি পড়ানো হয়। আগে টু, থ্রি থেকে পড়ানো হত তাতে তো ছাত্ররা একটু লাভবান হতই, তবে এখনকার পাঠক্রমে যেভাবে ইংরেজিকে ক্লাসে আনা হয়েছে একটু যত্ন নিয়ে পড়ালে খুব একটা অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। আমাদের স্কুলের ছাত্ররা ইংরেজিতে বরাবরই ভাল করে।"

এত বড় স্কুল, এতগুলি ঘর, এত সব জিনিসপত্র এগুলি কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন এই প্রশ্ন করাতে প্রধানশিক্ষক শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার একটু হেসে বলেন, "দেখুন, প্রথম কথা আমাদের হাতে কোনও ক্ষমতা নেই— সব-কিছুতেই সরকারের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। সামান্য মেরামতির কাজও আমরা করতে পারি না, পরিকল্পনা করে সরকারের কাছে পাঠাতে হয়। ওঁদের লোক (পূর্ত বিভাগ) এসে কাজগুলি করে দিয়ে যান।

স্কুলের প্রচুর জায়গা আছে, সেখানে আরও কিছু ঘর হতে পারে। সরকারকে জানিয়েছি, জানিনা এসব কবে হবে। অবশ্য এগুলি মূল সমস্যা নয়, এর জন্য আমাদের খুব যে একটা অসুবিধে হচ্ছে তাও নয়, বরং আমরা যা সুযোগ-সুবিধা পাই অনেক স্কুলই তো তা পায় না, বিশেষ করে গ্রামের স্কুলগুলি…।"

একদিন ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার ব্রত নিয়ে যে স্কুলের জন্ম, আজ ১১৩ বছর পরেও সেই ব্রত পালনের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে স্কুল এগিয়ে চলেছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে।

নীরদ রায়

ফোটো : অলক কুণ্ডু

দশম শ্রেণীর প্রথম ছাত্র

মোট ৭৩০ পেয়ে ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য এবার নাইন থেকে ফার্স্ট হয়ে ক্লাস টেন-এ উঠেছে। ইন্দ্রজিৎ সেভেন থেকে স্কুলে প্রথম হয়ে আসছে। মাঝখানে ক্লাস এইটে যুগ্মভাবে প্রথম হয় ওই একবারই। পড়াশোনার ব্যাপারে ইন্দ্রজিৎ বেশ সিরিয়াস, দিনে ছ-সাত ঘণ্টা পড়ে। তা ছাড়া সপ্তাহে তিনদিন করে দু-তিনজন শিক্ষকের কাছে ও পড়তে যায়। ইন্দ্রজিতের প্রিয় বিষয় ইংরেজি এবং অঙ্ক, ওর ধারণা মাধ্যমিকে আরও ভাল রেজাল্ট করবে, উত্তরবঙ্গে না হলেও জেলায় তো প্রথম হবেই। ইন্দ্রজিতের বাবা সুজিতকুমার ভট্টাচার্য স্থানীয় আনন্দচন্দ্র কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। ওরা এক বোন, এক ভাই। পড়াশোনার ব্যাপারে বাবার কাছে সব সময় সাহায্য নেয় না, প্রয়োজনে নেয়। ইন্দ্রজিৎ এখনও ঠিক করেনি ভবিষ্যতে সে কী হতে চায়। সবাই তো ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার হতে চায়, ওর চাহিদা একটু অন্যরকম— ও চায় বাবার মতো অধ্যাপক হতে।

শস্তা গল্প-উপন্যাস ওর ভাল লাগে না, সিরিয়াস প্রবন্ধের বই ওর প্রিয়, তা ছাড়া হালকা হাসির বই ভাল লাগে। যেমন শিবরাম চক্রবর্তী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের বই ও ভীষণ পড়ে। ছবি আঁকা একটা নেশা, কিন্তু ইদানীং পড়শোনার জন্য হচ্ছে না। ওর প্রিয় খেলা ফুটবল, তা ছাড়া ক্রিকেট, টেবল টেনিসও ভাল লাগে। ফুটবলে ওর প্রিয় প্রশান্ত ব্যানার্জি, ক্রিকেটে আজহারউদ্দিন, কপিলদেব। বাইরে ঘুরতে ওর ভীষণ ভাল লাগে।

গান ইন্দ্রজিতের ভীষণ প্রিয়, তবে সবার গান নয়, ওর প্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে। অনর্থক হইহুল্লোড় চেঁচামেচি ওর একদম পছন্দ নয়, বরং একটু নির্জনতাই ভাল লাগে। ইন্দ্রজিৎ পরিশ্রমে বিশ্বাসী, ওর ধারণা ঠিকমতো পরিশ্রম করতে পারলে ভাল ফল পাওয়া যাবেই।

ঠক
সর্দার, রসিকতা ঢের হয়েছে ! এবার বাঁধন খুলে আমাকে ছেড়ে দাও !
এই পাঁশুটে-মুখটা আমাদের হুকুম করছে ! ওর হুকুম শুনে মনে হয় যেন আমরা কুকুর ! পাঁশুটে-মুখটা মরবে ! আমার কথা শেষ !
রজন !··· খাসা মতলব !
খট
উহ্ ! গুলতি !
কাজ হয়েছে !
বিচ্ছু বাচ্চাটাকে সরিয়ে নিয়ে যাও ! ···আমাকে তাক করে গুলতি ছুঁড়ছে ! ফের করলে তোমার খুলির ছাল ছাড়িয়ে নেব !
কী আস্পর্দা ! মহান সর্দারের সঙ্গে এই ব্যবহার ! ···বজ্জাত ছেলে !
ওকে তিন চাঁদ আমার চোখের আড়ালে রাখবে, নইলে···
বাচ্চাদের গুলতি নিয়ে খেলতে দেওয়া উচিত নয়···
অ্যাঁ ! তুমিও ! সর্দারকে অসম্মান করবার আস্পর্দা তোমার হল কী করে !
আমি ?···
হ্যাঁ ! ···তুমি !
সর্দার ! তুমি আমার ভাই পাতাখেকো বাইসনকে মারলে ! ও নির্দোষ !

আমেরিকায় টিনটিন

দমাস
পাতাখেকো বাইসনের ভাই-এর এত আস্পর্দা যে সর্দারের গায়ে হাত তোলে ! মারো, ওকে মেরে ফেলো ।
ষাঁড়-চক্ষুর ভাই পাতাখেকো বাইসনকে সর্দার অন্যায়ভাবে মেরেছে । নিজের ভাইকে সাহায্য করেছে বলে ষাঁড়-চক্ষুকে যে ভীরু কুকুররা মারবে তারা মরবে !
চমৎকার ! ওরা লড়াই করুক । ততক্ষণে নিজেকে মুক্ত করি !
ব্যস ! হাতের বাঁধন খুলেছে ! এবার পা··· চমৎকার··· ছোটো !
কিন্তু আমার বিরুদ্ধে এদের খেপিয়ে দিল কে ? সেটা জানতেই হবে··· যে গুণ্ডাটাকে তাড়া করছি সেই কি ?
ওদের চেঁচামেচি থেমেছে । তার মানে টিনটিনের শাস্তি শেষ হয়েছে। দেখতে হচ্ছে···
সর্বনাশ ! ···ও পালিয়ে যাচ্ছে ! গোটা দলকে মেরে শুইয়ে দিয়েছে ! অসম্ভব কাণ্ড ! ···কী ছেলে বাবা !
বাঁচাও ! ···ওরা আমাকে তাড়া করেছে !
গুড়ুম
গুড়ুম
!
গুলির শব্দ কানে আসছে··· আশা করি টিনটিনের কিছু হয়নি ।
না, ইন্ডিয়ানরা নয় ! ববি স্মাইলস্ ! আমার জানা উচিত ছিল ! ···এখন বুঝতে পারছি ইন্ডিয়ানরা আমার ওপর কেন এমন খড়্গহস্ত হয়েছিল···
সর্বনাশ ! ···ও আবার তাক করছে !
গুড়ুম
?

এনিড ব্লাইটন অবলম্বনে **পঞ্চরত্ন** সোনার তরী মূল কাহিনী : ক্লদ ভয়লার লেখা : সার্জ রোজেনজাইগ আঁকা : বার্নার্ড দুফোসে

এনিড ব্লাইটন অবলম্বনে **পঞ্চরত্ন** সোনার তরী মূল কাহিনী : ক্লদ ভয়লার লেখা : সার্জ রোজেনজ্বাইগ আঁকা : বার্নার্ড দুফোসে

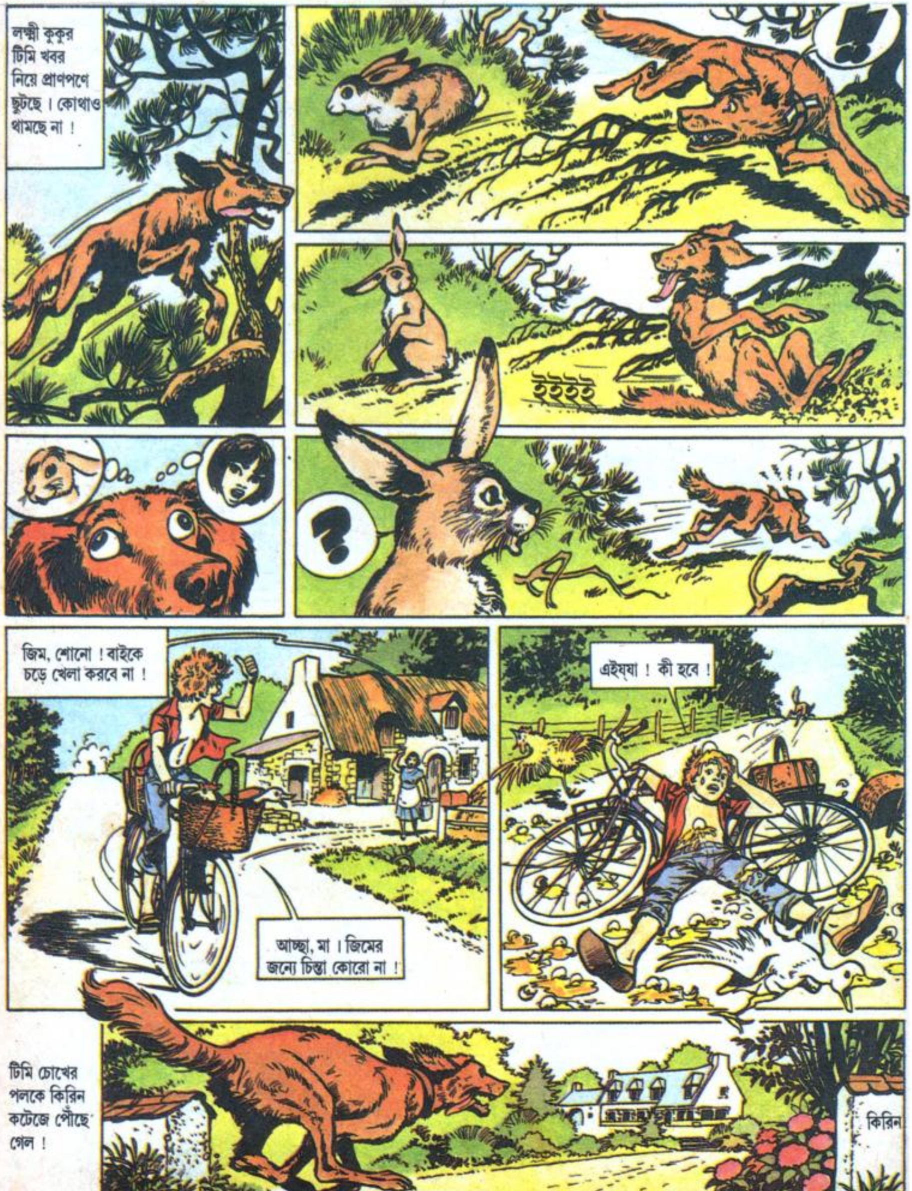

কুইজ

নিল ও'ব্রায়েন

রাষ্ট্রপুঞ্জের কথা

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিক । সেই সময় ভয়ঙ্কর এক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল অনেকের মনে । এই যুদ্ধের চাইতেও ভয়াবহ কোনও যুদ্ধ যদি দেখা দেয় ভবিষ্যতে ? বিভিন্ন দেশের মধ্যে কোনও বিবাদ বাধলে শান্তিপূর্ণভাবে তা মিটিয়ে ফেলার সঠিক পথ আছে কোথায় ! কেউ-কেউ ভাবলেন, আন্তর্জাতিক কোনও সংস্থা এই সমস্যা দূর করার চেষ্টা চালাতে পারে । এইরকম এক সংস্থা ছিল জাতিপুঞ্জ । কিন্তু পরস্পরের ঝগড়া মেটাবার কাজে সংস্থাটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারেনি । নতুন কোনও প্রতিষ্ঠান কি এই কাজে সফল হতে পারবে !

বলা যেতে পারে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই নতুন একটি সংস্থা—রাষ্ট্রপুঞ্জের (ইউ এন ও) ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল । ১৯৪৫ সালের জুন মাসে সানফ্রান্সিসকোয় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পঞ্চাশটি দেশের প্রতিনিধিরা সদস্যপদ গ্রহণের জন্য একটি পত্রে স্বাক্ষর প্রদান করেন । কয়েক মাস বাদে আনুষ্ঠানিক ভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা হয় । পরবর্তীকালে আরও অনেকগুলি দেশ এই সংস্থায় যোগ দেয় । সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কয়েকটি দেশও সদস্যপদ গ্রহণ করেছে । সংস্থায় সাফল্য এসেছে বেশ কিছু, তবে ব্যর্থতার পরিমাণও কম নয় । কারণ, সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা বেশ কঠিন কাজ ।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সদরদফতর নিউ ইয়র্কের ৩৯ তলাবিশিষ্ট সুদৃশ্য এক অট্টালিকায় । এই সংস্থার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ-দল পৃথিবীর নানা প্রান্তের উন্নয়নশীল দেশগুলির সাহায্যে এগিয়ে যায় নিয়মিতভাবে । রাষ্ট্রপুঞ্জ কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত । সাধারণ পরিষদ অন্যতম প্রধান বিভাগ । প্রতিটি সদস্য-দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেয় এখানে । আলোচনার বিষয়বস্তু বিশ্বের নানা সমস্যা । সাধারণ পরিষদ গঠিত হয় ১৫টি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে । সাধারণ পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চিন, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স । অন্যান্য সদস্য-দেশ প্রতিনিধি পাঠায় পালা করে । যুদ্ধ থামানো কিংবা যুদ্ধ যাতে না বাধে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে থাকে সাধারণ পরিষদ । সেক্রেটারি জেনারেলের ভূমিকাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ । সংস্থার কাজকর্ম ঠিকভাবে চলছে কি না—তা দেখার দায়িত্ব তাঁর । সংস্থার বিশেষ কয়েকটি শাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করে থাকে । এগুলি হল খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার । গরিব দেশগুলিকে প্রচুর সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে । অসুস্থদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হয় । পোকামাকড় মেরে খাদ্যশস্য বাঁচাবার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়ে থাকে । শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর রাখা হয় । প্রয়োজনমতো অর্থ ও বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে ।

রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজকর্ম কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পেছনে দু'টি বড় কারণ আছে । গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দেশের ধারণায় এই সংস্থাটি সম্পূর্ণ স্বাধীন নয় । রুশিদের মনে হয়েছে, প্রথম বিশ বছর সংস্থাটির ওপর মার্কিন প্রভাব ছিল সর্বাধিক । সুতরাং রাষ্ট্রপুঞ্জ নাকি রাশিয়ার স্বার্থের দিকে নজর দেয়নি তেমন । ছয়ের দশকে আবার আফ্রিকার বেশ-কিছু দেশ রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ করেছিল । ব্রিটিশদের তখন ধারণা হয়েছিল যে, অধিকাংশ সদস্যই ব্রিটেনের বিরোধী । রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি দেশের আগ্রহও কমে আসছে ধীরে ধীরে । ফলে, সংস্থাকে অর্থসাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ আর আগের মতো নেই । সংস্থার মোট টাকার সিংহভাগ আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে । তবে এই দেশটিই আবার রাষ্ট্রপুঞ্জের বিতর্কে সমালোচিত হয়েছে তীব্রভাবে ।

শান্তিরক্ষার কাজে রাষ্ট্রপুঞ্জ নিজস্ব সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছে বেশ কয়েকবার । কোথাও হয়তো যুদ্ধ বাধল, অমনি সেখানে হাজির হল রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তিবাহিনী । এই বাহিনী আনা হয় নিরপেক্ষ দেশ থেকে । সুতরাং সংশ্লিষ্ট সৈন্যদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচার-আচরণের অভিযোগ আনার সুযোগ তেমন নেই । শান্তিবাহিনীর একমাত্র কাজ হল যুদ্ধ থামানো । শান্তিরক্ষার কাজে রাষ্ট্রপুঞ্জ যে অভিযানগুলি চালিয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্যালেস্টাইন, ১৯৪৮ ; কাশ্মির ১৯৪৮ ; আরব-ইজরায়েল সীমান্ত-লড়াই, ১৯৫৬ । সাইপ্রাসের গ্রিক ও তুর্কি অধিবাসীদের সংঘর্ষ থামানোর কাজে রাষ্ট্রপুঞ্জ ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল ।

কুইজ

প্রশ্ন

(১) কলকাতার কোন দুই বিখ্যাত ফুটবলারের নামে রাস্তা আছে ? **সৌমেন দাস**,ঝাড়গ্রাম ।
(২) এসকেলেটর কী ? **জয়দীপ ঘটক**, টি· ভি· বি কলেজ, রানিগঞ্জ ।
(৩) ১৯৮৯ সালে কম্পিউটারের বিচারে বিশ্বের সেরা ব্যাটস্‌ম্যান কে ? **ফিরোজ ও জামিল**, হুগলি ।

(৪) Goodbuy শব্দটি কী থেকে এসেছে ? **পাপান মাইতি**, ঝাড়গ্রাম ।
(৫) R.O.M-এর পুরোটা কী ? **কৌশিক জানা**, মেচেদা ।
(৬) 'দাই হ্যান্ড গ্রেট অ্যানার্ক' কার লেখা ? **শাম্ব ও লোহিত দত্ত**, বেলডাঙা ।
(৭) সেফটিপিন কে আবিষ্কার করেন ? **বিচিত্রা আচার্য**, রানি বিনোদমঞ্জরী রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম ।
(৮) হন্ডুরাসের রাজধানীর নাম কী ? **শান্তনু কুণ্ডু**, কলকাতা-৫ ।

(৯) ব্যারি ব্যাম ব্যাম কার লেখা ? **সাত্যকি রায়**, মেচেদা ।
(১০) বর্তমানে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল-টিমের অধিনায়ক কে ? **অঙ্কুর সামন্ত**, বর্ধমান ।
(১১) উত্তর প্রদেশের রাজধানীর নাম কী ? **সন্দীপ মিত্র**, সোনারপুর ।
(১২) ভারতের সর্বোচ্চ গল্‌ফ কোর্স কোথায় ? **ননীগোপাল রায়**, শিলিগুড়ি ।
(১৩) গল্‌ফ বল সাধারণত কী

দিয়ে তৈরি হয় ? **রিনা দে**, চেতলা ।
(১৪) গাঙ্গুর কোন রাজ্যের অন্যতম প্রধান উৎসব ? **কৌশিক দাস**, এ· ভি· বি হাই স্কুল, দুর্গাপুর
(১৫) কোন দেশের জনসংখ্যা সর্বাধিক ? **কিংশুকরঞ্জন দাস**, হাওড়া জেলা স্কুল ।
(১৬) আর· এস· এস·-এর প্রতিষ্ঠাতা কে ? **অনির্বাণ বর্ধন**, এ· ভি· বি হাই স্কুল, বর্ধমান।

(১৭) বম্বে প্যালেস কে বানিয়েছেন ? **অঙ্কুর ঘোষ**, হিন্দু স্কুল ।
(১৮) 'পাঞ্জাব-কেশরী' কাকে বলা হয় ? **অভিজিৎ পাল**, দুর্গাপুর ।
(১৯) কোন বিশ্ববিখ্যাত সম্রাট বেড়ালকে ভয় পেতেন ? **সৌগত মাহিন্দার**, সালকিয়া ।
(২০) মহাভারতের হস্তিনাপুর এখন কোথায় ? **অঞ্জন নন্দী**, রসুলপুর ।
(২১) 'গেট ওয়ে অব ইন্ডিয়া' কোথায় ? **মানস ভুঁইয়া**, নদীয়া ।
(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) বার্সিলোনা ।
(২) চিয়ার্ট ।
(৩) ১৯৯ রান, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ।
(৪) বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' ।

বিদ্যাসাগর

(৫) রিদ্‌ম ।
(৬) জয়পুর ।
(৭) লোকসভায় ।
(৮) প্রক্সিমা সেন্টরি ।
(৯) টি· এস· এলিয়ট ।
(১০) দেবিকারানি ।
(১১) ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস ।
(১২) নীল ।
(১৩) বাতাসের

সার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান

আর্দ্রতা-পরিমাপক যন্ত্র ।
(১৪) শৈলেশ দে ।
(১৫) হুইস্কার ।
(১৬) রেইনম্যান ।
(১৭) জর্জ মাইকেলের ।

টি· এস· এলিয়ট

(১৮) সার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান ।
(১৯) টমাস আলভা এডিশন ।

কুইজ

বিষয় : গ্রেট ব্রিটেন

প্রশ্ন

(১) লন্ডনের আগে ইংল্যান্ডের রাজধানী কোথায় ছিল ?
(২) শেক্‌সপিয়রের সময়ের বিখ্যাত একটি থিয়েটার সম্প্রতি লন্ডনে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেটির নাম কী ?
(৩) ব্রিটিশ ক্রাউনের রত্নরাজি কোথায় রাখা হয়েছে ?
(৪) 'গ্রেস গেট্‌স' কোথায় ?
(৫) 'দি ওল্ড লেডি অব থ্রেড়নিডল স্ট্রিট' কী ?
(৬) অধিবেশন বসার আগে পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষে অনুসন্ধান চালানো হয় কেন ?
(৭) উইম্বলডন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ চলার সময় প্রথাসম্মত কোন খাদ্যটি খাওয়া হয়ে থাকে ?
(৮) রানি বাকিংহাম প্রাসাদের ভবনে আছেন কি না, কীভাবে তা জানা যায় ?
(৯) স্কটল্যান্ডের একটি হ্রদ লক নেস বিখ্যাত কেন ?
(১০)পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দাদের মজা করে 'ঘটি' বলা হয়ে থাকে। ওই একই নিয়মে ব্রিটেনে একটি সম্প্রদায়কে 'ট্যাফি' বলা হয়। কারা তারা ?
(১১) এক সন্ত নাকি আয়ারল্যান্ড থেকে সব সাপ উৎখাত করেছিলেন। সেই সন্তের নাম কী ?
(১২) প্রথম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নাম কী ?
(১৩) কোন ইংরেজ সর্বপ্রথম জলপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন ?
(১৪) একজনমাত্র ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে গুপ্তহত্যা করা হয়েছে। কে তিনি ?
(১৫) লন্ডনের বিমানবন্দর দুটির নাম কী ?
(১৬) ইংরেজদের ক্রিকেটে 'গোলাপের যুদ্ধ' কী ?
(১৭) মাউন্টব্যাটেন পরিবারের পদবিটি কীভাবে এসেছে ?
(১৮) ইংল্যান্ডের প্রতীকচিহ্ন সিংহ। কোন পৌরাণিক প্রাণী স্কটল্যান্ডের প্রতীক ?
(১৯) 'পোয়েট'স কর্নার' কোথায় ?
(২০) 'চিপি' থেকে ইংরেজরা কী কিনতে পারেন ?

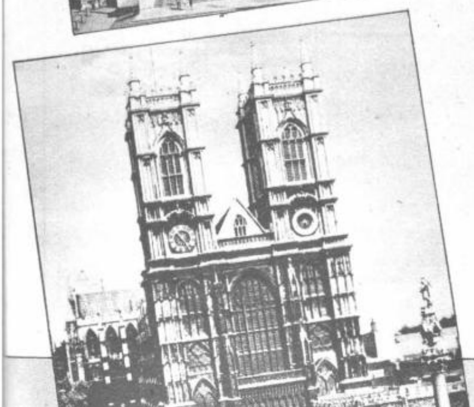

উত্তর : (১) উইনচেস্টার। (২) 'রোজ'। (৩) টাওয়ার অব লন্ডন-এ। (৪) লর্ডসের ক্রিকেট-মাঠে। বিখ্যাত ক্রিকেটার ডঃ ডব্লিউ· জি· গ্রেসের নামে নাম। (৫) দি ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের একটি নাম। (৬) গাই ফক্‌স একদা অধিবেশন চলার সময় পার্লামেন্ট উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে ভল্টের মধ্যে বারুদ লুকিয়ে রেখেছিল। ষড়যন্ত্রটি ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল অপরাধীদের। সেই ষড়যন্ত্রের কথা মনে রেখে অনুসন্ধানের কাজ আজও চালানো হয়। (৭) স্ট্রবেরি ও ক্রিম। (৮) অট্টালিকায় 'রয়াল স্ট্যান্ডার্ড' ওড়ে। (৯) এটিকে এক সমুদ্র-দানবের বাসভূমি হিসেবে ধরা হয়েছে। (১০) ওয়েলশ্‌ম্যান—উৎস ডেভিড-ওয়েলসের পৃষ্ঠপোষক সন্ত। (১১) সেন্ট প্যাট্রিক। (১২) রবার্ট ওয়ালপোল। (১৩) সার ফ্রান্সিস ড্রেক। (১৪) স্পেনসার পার্সিভাল। (১৫) হিথ্‌রো ও গ্যাট্‌উইক। (১৬) ইয়র্কশায়ার বনাম ল্যাঙ্কাশায়ারের একটি খেলা। এই খেলায় দল দুটির প্রতীকচিহ্ন ছিল যথাক্রমে সাদা ও লাল গোলাপ। পঞ্চদশ শতকের ঐতিহাসিক সেই গোলাপের যুদ্ধের নামে এই নাম। (১৭) এঁদের মূল পদবি ছিল 'ব্যাটেনবার্গ'। এটি জার্মান শব্দের মতো বলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পদবি পালটে করা হয় 'মাউন্টব্যাটেন'। (১৮) ইউনিকর্ন। একশৃঙ্গ প্রাণিবিশেষটির দেহ ঘোড়ার মতো। (১৯) ওয়েস্টমিন্‌স্টার'স অ্যাবেতে। বেশ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিকের সমাধিস্থল ওখানে, সেই থেকে এসেছে বিশেষ ওই নামটি। (২০) ফিশ অ্যান্ড চিপ্‌স।

গল্পে ভরা, তথ্যে ভরা দুটি জীবনী গ্রন্থ

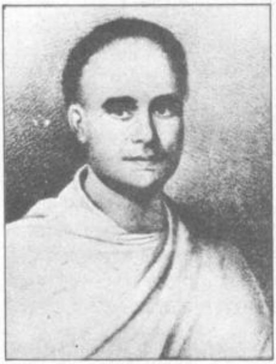

দশ হাজার কপি নিঃশেষ

ইন্দ্র মিত্র-এর

প্রামাণিক জীবনী-গ্রন্থ

বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা

দাম ১০·০০

বিদ্যাসাগর—এক প্রেরণা-যোগানো মনীষীর নাম। বালক বিদ্যাসাগরের জীবনের বহু মজাদার ঘটনার মধ্য দিয়ে আশ্চর্য এক জীবনীচিত্র উপহার দিয়েছেন ইন্দ্রমিত্র। সকলেই জানেন যে, অধ্যবসায়ী গবেষক ইন্দ্র মিত্র যাচাই না করে কোনও তথ্য কখনও ব্যবহার করেন না। ছোটদের হাতে এ-বই তাই নির্ভাবনায় তুলে দেবার যোগ্য।

ইন্দ্রমিত্রের

আরেক অসামান্য বই

শরৎ কথামালা

দাম ১২·০০

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বিস্তর কথা ও কাহিনী ছড়িয়ে আছে চারদিকে। যেগুলো নির্ভেজাল সত্যি, অথচ এমনই চমকপ্রদ ও কৌতুকস্নিগ্ধ যে মনে হয়, গল্প শুনছি। সেই জাতীয় শরৎ-কথামালাই এ-গ্রন্থের দুই মলাটের মধ্যে শুনিয়েছেন ইন্দ্র মিত্র, সেই সঙ্গে শুনিয়েছেন শরৎচন্দ্রের একটি নির্ভরযোগ্য জীবনী।

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩১-৪৩৫২

আরও 'আনন্দ'-উপহার

নানা স্বাদের উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
নৃসিংহ রহস্য ১০·০০
গৌরের কবচ ১০·০০
হিরের আংটি ১০·০০
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ১০·০০
বক্সার রতন ১০·০০

শেখর বসুর
সাত বিলিতি হেরে গেল ৮·০০
বারোটি কিশোর ক্লাসিক ২০·০০

সুখরঞ্জন দাশগুপ্তের
রেল চলে ঝমাঝম ৩০·০০

সন্তোষকুমার ঘোষের
দুপুরের দিকে ৮·০০

সুবোধ ঘোষের
সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৮·০০

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের
কথায় কথায় ১০·০০

সুনির্মল বসুর
ছন্দের টুং টাং ৮·০০
শহুরে মামা ও কানাকড়ি ১০·০০

তারাপদ রায়ের
ডোডো-তাতাই পালাকাহিনী ১০·০০
একটি কুকুরের উপাখ্যান ১০·০০

আনন্দমেলা

কুইজ প্রতিযোগিতা

নিল ও'ব্রায়েন

প্রশ্ন

(১) ইয়ুথ হস্টেল্‌স আন্দোলন কোন দেশে প্রথম শুরু হয়েছিল ?
(২) ক্রিকেট-দুনিয়ায় কাকে 'মিঃ মিলিয়ন্‌স' নামে ডাকা হত ?

(৩) ইংরেজি ছবি 'ব্যাক টু দা ফিউচার'-এর অনুপ্রেরণায় দূরদর্শনের একটি সিরিয়াল তৈরি হয়েছে। টিভি সিরিয়ালটির নাম কী ?
(৪) বঙ্গ-বিভাগ ঘোষণা করা হয়েছিল ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫। রবীন্দ্রনাথ এই দিনটিকে কীভাবে পালন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ?
(৫) কলকাতার ৩০০ বছর হতে চলল। কোন শহর এ-বছর তার ৩৫০তম বর্ষ উদযাপন করছে ?
(৬) উত্তর মেরু হল ৯০° (উ)। চৌম্বকীয় উত্তর মেরুর অক্ষাংশ কত ?
(৭) 'সিনদে ডাক' কী ?
(৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রাণীর নাম বলো।
(৯) 'দা প্রিন্সেস রিমেমবার্স' কোন ভারতীয়ের আত্মজীবনী ?
(১০) সার এডউইন আর্নল্ড-এর 'দা লাইট অব এশিয়া' কবিতাটি কার জীবন নিয়ে লেখা ?
(১১) কোন কুকুরকে মাঝেমধ্যে 'জার্মান বুলডগ' বলা হয় ?
(১২) বাইবেল-এ 'দা ডটার অব জিয়ন' বলতে কী বোঝায় ?

১৯ এপ্রিলের কুইজ প্রতিযোগিতার ফল আগামী সংখ্যায়

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী

*(১) এই প্রতিযোগিতার উত্তর খামে আলাদাভাবে পাঠাতে হবে। খামের ওপর **'আনন্দমেলা কুইজ প্রতিযোগিতা'** অবশ্যই লিখে দিতে হবে।*
(২) উত্তর ১৬ অগস্টের মধ্যে আনন্দমেলার দপ্তরে (৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১) পৌঁছতে হবে। এর পরে, উত্তর গ্রহণ করা হবে না।
(৩) তিনটি পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রতিটি পুরস্কার হল, আনন্দ পাবলিশার্সের ১০০ টাকার বইয়ের কুপন।
(৪) সম্পূর্ণ নির্ভুল একাধিক উত্তর পাওয়া গেলে উত্তরপ্রাপ্তির সময়, সুন্দর হস্তাক্ষর, সঠিক বানান, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিবেচনা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ নির্ভুল উত্তর পাওয়া না গেলে সর্বাপেক্ষা কম ভুলের উত্তরদাতা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হতে পারেন। এক্ষেত্রে পুরস্কার আনন্দ পাবলিশার্সের ৭৫ টাকার বইয়ের কুপন। বিচারক কুইজ মাস্টারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এ বিষয়ে কোনওরকম যোগাযোগ করা হলে উত্তরদাতার 'এন্ট্রি' বাতিল বলে গণ্য হবে।
(৫) উত্তরের সঙ্গে নীচের ফর্মটি যথাযথভাবে পূরণ করে, কেটে পাঠাতে হবে। একজন একাধিক উত্তর পাঠাতে পারেন। তবে আলাদা-আলাদা খামে পাঠাতে হবে এবং উত্তরের সঙ্গে থাকবে যথাযথভাবে পূরণ করা ফর্ম।
(৬) আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের কোনও কর্মী বা তাঁদের আত্মীয়পরিজন এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বিবেচিত হবেন না।

আনন্দমেলা

ফর্ম

নাম ______________________

পিতার নাম ______________________

পুরো ঠিকানা ______________________

____

বয়স ____________

স্বাক্ষর

ধাঁধা

রথের দিন আমাদের ছুটি থাকে। কিন্তু ছোট্‌কার থাকে না। এই একটা ছুটির দিন, ছোট্‌কাকে সারাটা দিন 'মিস' করি। অবশ্য দিনের বেলার অনুপস্থিতি সন্ধেবেলায় কিছুটা পুষিয়ে যায়। খাবার টেবিলে গরম-গরম পাঁপড়ভাজা সামনে নিয়ে যখন জমাটি গল্পগুজব শুরু হয়। সে আড্ডায় বাড়ির সবাই এখন যোগ দেয়। মধ্যমণি ছোট্‌কা।

অথচ আগে বোধ হয় ছোট্‌কার ছুটি থাকত। কেননা, আমার আবছা-আবছা মনে পড়ে, ছোট্‌কা আমাদের বিকেলবেলা নিয়ে বেরোত রথের মেলায়। আমাদের মানে, ছোড়দিকে আর আমাকে। কখনও-বা গৌরীও— আমার মামাতো বোন— থাকত। সে কী বিশাল মেলা। সব পেয়েছির মেলা যাকে বলে আর কি। পুতুল, বাঁশি, পাখি, মাছ, গাছগাছালি থেকে শুরু করে গেরস্থালির হরেক সরঞ্জাম। কী ভালই না লাগত ঘুরে ঘুরে দেখতে। এখন মেলায় যাওয়া হয় না, কিন্তু ঘরে বসেই, ছোট্‌কার ভাষায় বলতে গেলে, 'রথ দেখা কলা বেচা' চলে। রথ দেখা তো সহজ, ঘর থেকে না বেরোলেও চোখে পড়ে। কিন্তু 'কলা বেচা' যে আসলে ধাঁধা, সেটা বলে দিল ছোট্‌কা। অন্তত আমাদের বাড়ির ক্ষেত্রে ধাঁধা। রথের সন্ধেবেলা ছোট্‌কার মুখে শোনা ধাঁধা দিয়েই শুরু করছি এবার।

প্রথম ধাঁধা ॥ রথের মেলায় দেখা হয়ে গেল এক পরিবারের নানা বয়সীদের সঙ্গে। বলতে গেলে, সবাই এসেছেন রথের মেলায়। সম্পর্কের হিসেবে তালিকা বেশ দীর্ঘ। এক ঠাকুর্দা, এক ঠাকুমা। দুই বাবা, দুই মা। চার ছেলেমেয়ে। তিন নাতি-নাতনি। এক ভাই, দুই বোন। দুই ছেলে, দুই মেয়ে। এক শ্বশুর, এক শাশুড়ি ও এক পুত্রবধূ। সম্পর্কের হিসেব যাই হোক, মাথা-গুনতিতে কিন্তু মাত্র সাতজন। হিসেবটা আসলে কীভাবে মিলছে, বলতে পারো? প্রায় পাঁপড়ভাজার মতোই মুচমুচে ও সুন্দর এই ধাঁধা। বলা শক্ত নয় মোটেও। সুতরাং চটপট বলে ফেলো।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ মাইনে আর ওভারটাইম মিলিয়ে একজন হাতে পান মাসে বারোশো টাকা। ওভারটাইমের টাকার থেকে সাতশো টাকা বেশি তাঁর মাইনে। ওভারটাইম কত? মাইনেই-বা কত?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ পথ প্রতিজ্ঞায় গিয়ে মিশেছে?

গতবারের উত্তর ॥ (১) ১৭৩+৪=১৭৭, ৮৫+৯২=১৭৭। (২) নীলাম্বর, অন্যগুলি সমুদ্রের প্রতিশব্দ। (৩) বাগানে।

সত্যসন্ধ

মজার খেলা

অর্ধচন্দ্র আকাশে যখন থাকে, দেখতে দারুণ চমৎকার লাগে। এমনকী, আমরা যখন গাছপালা পাহাড় নদী বাড়ি ঘরের ছবি আঁকি, অনেকেই এঁকে দিই মেঘের ফাঁকে আধখানা চাঁদের ছবি। কিন্তু বাংলা ভাষায় 'অর্ধচন্দ্র' শব্দটার একটা অন্য মানে রয়েছে। সেটা কী বলো তো? যারা জানো, তারা তো জানোই। যারা জানো না, তারা কি আন্দাজ করেও বলতে পারবে সেই মানেটা? খুব অপমানজনক ব্যাপার। না,না, না-পারাটা নয়, অর্ধচন্দ্রের সেই মানেটা। অর্ধচন্দ্র মানে হল, গলাধাক্কা। আসলে গলাধাক্কা দিয়ে কাউকে বার করতে হলে, আঙুলগুলোকে অনেকটা আধখানা চাঁদের মতো করেই গলায় বসাতে হয়, তাই না? কে জানে সেই ছবি থেকেই হয়তো তৈরি হয়েছে এমন একটা মানে।

আমাদের এবারের মজার খেলায় একটা অর্ধচন্দ্র আঁকতে হবে। তাই এইসব কথা মনে এল। এটা মোটেও গলাধাক্কার খেলা নয়। তবে হ্যাঁ, বুদ্ধিতে একটু ধাক্কা লাগে বইকী।

নীচের ছবির মতো একটা ছবি এঁকে নাও কাগজে।

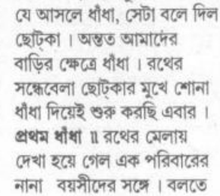

এবার কী করতে হবে শোনো। দুটো মাত্র সরলরেখা এমনভাবে টানতে হবে, বা আঁকতে হবে যাতে কিনা অর্ধচন্দ্রটা ছ'টা ভাগে ভাগ হয়ে যায়। সমান ভাগ নয়, যে-কোনও মাপের হতে পারে এক-একটা ভাগ। এই খেলাটা নিজের জন্য আগে, তারপর বন্ধুদের জন্য।

একটা সমাধানের চেহারা এখানে রইল। কিন্তু সেটা দেখবে সব শেষে। কেমন?

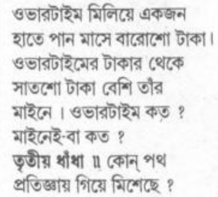

মজারু

কত কথা

আকাশকুসুম, উড়োজাহাজ, নভোমণ্ডল, সুবিন্দু— এই চারটি শব্দের অর্থ নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। 'সুবিন্দু' শব্দটি নিয়ে যদি কারও ধন্ধ থাকে তবে জেনে নাও, এর মানে হল দর্শকের ঠিক মাথার উপরে কল্পিত আকাশবিন্দু। এখন এই চারটি শব্দ নিয়ে তোমাদের করণীয় কী বলছি। এদের চারটি তিন অক্ষরের প্রতিশব্দ খুঁজে বার করে খাতায় লিখে রাখো।

২। চটপট বলতে হবে: (ক) পাহাড়ে ওঠার সময় কোন পাখির দেখা মেলে? (খ) কোন পাখি গর্জন করে? (গ) কোন পাখি কখনও ফুল, কখনও যন্ত্র?

৩। 'খবরদার, আর এক পা এগোলে মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।' দেখতে অবিকল সত্যিকারের এক খেলনা-পিস্তল তাক করে

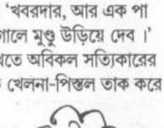

তুমি এক ট্রেন-ডাকাতকে থমকে দিলে। এখন দ্যাখো তো তোমার বলা এই 'খবরদার' শব্দটির মধ্যে পর-পর মোট কতগুলি এবং কোন কোন শব্দ পাও!

উত্তর: ১। খপুষ্প, খপোত, খগোল, খমধ্য। ২। (ক) চড়াই। (খ) বাজ। (গ) বক। ৩। মোট ছ'টি শব্দ পাওয়া যাবে, যথা— খ (আকাশ), খবর, বর, বরদা, দা (কাটারি), দার।

কথক

ধাঁধানো ছবি

ছবির মজায় এবারে দ্যাখো কিটুর মেষ-শাবকটি হারিয়ে গেছে। কোন রাস্তায় গেলে কিটু তার মেষ-শাবকটি খুঁজে পাবে ? প্রথমে তোমরা খুঁজে বার করো, তারপর কিটুকে বলে দিও।

চিত্রক

হাসিখুশি

"আমি এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি, দেওয়ালের ভিতর দিয়ে বাইরের দৃশ্য সব দেখা যায়।"
"চমৎকার আবিষ্কার। জিনিসটার নাম কী দিয়েছ ?"
"জানালা।"

"হ্যাঁ রে রাণ্টু, মা কী করে টের পেল রে তুই আজ চান করিসনি ?"

"আর বলিস না, তোয়ালেটা ভেজাতে ভুলে গেছিলাম।"

কিসের ফোটো

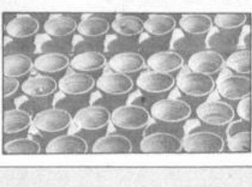

ফোটো : রবিন বিশ্বাস

গত সংখ্যায় ছিল জলের কল-এর ফোটো

ট্যানগ্রাম

গত সংখ্যায় সাতটি টুকরো দিয়ে একটা হাঁসের ছবি দিয়েছিলাম। তোমরা বাড়িতে বানানোর চেষ্টা করে সফল হয়েছ কিনা এবারের হাঁসের ছবি দেখে চটপট মিলিয়ে নাও। না পারলে এবারের ছবি দেখে বানিয়ে ফ্যালো। সঙ্গে রইল আরও দু'টি হাঁসের ছবি। এই সংখ্যায়

দিলাম একটি নৌকোর ছবি। কীভাবে সাতটি টুকরো দিয়ে নৌকোটি বানানো যাবে, দেখে নিও আগামী সংখ্যায়। তার আগে বাড়িতে নিজেরাই চেষ্টা করে দ্যাখো না, পারো কি না।

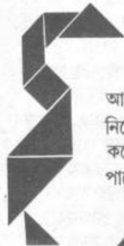

প্রবীর

আঁকিবুকি

পড়ুয়ার ছবি

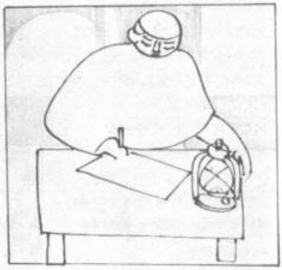

ত্রিভুজ এবং বৃত্ত দিয়ে গত সংখ্যায় আমরা এঁকেছি একজন বসে পড়ছে। এবারেও আঁকার পাতায় দ্যাখো, একজন পড়ুয়া বসে পড়াশোনা করছে, টেবিলে হ্যারিকেন। তোমরা চেষ্টা করে দ্যাখো, পড়ুয়ার অন্য কোনও আকার ফুটিয়ে তুলতে পারো কি না।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের প্রিয় সঙ্গী

মুনিয়া পাখীর সোনার ঝাঁপি
জগদীশ যোশী
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া
দাম : ৫ টাকা
ফুলেরা ও আমি
মনোরমা জাফা
দাম : ৫ টাকা

ছোটদের জন্য বাজারে বইয়ের অভাব নেই, অভাব শুধু ভাল বইয়ের। বেশির ভাগ বইয়েরই বিষয়, ছাপা, ছবি, বাঁধাই এত নিম্নমানের যে, হাতে নিলে মন খারাপ হয়ে যায়। সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া। তাঁরা ছোটদের জন্য চমৎকার উপহারের ডালি সাজিয়েছেন।

জগদীশ যোশীর আঁকা ও লেখা 'মুনিয়া পাখীর সোনার ঝাঁপি' বইটি বিষয় এবং ঝরঝরে ভাষার গুণে ছোটদের কাছে যে আদরের হয়ে উঠবে এতে কোনও সন্দেহ নেই। বইটির গল্প শুরু হয়েছে এইভাবে, "মস্তবড় একটা গাছে বাস করত ছোট্ট পাখী মুনিয়া।

একবার বর্ষাকালে অনেকদিন ধরে বৃষ্টি হল। তাই মুনিয়া তার গাছ ছেড়ে বেরোতেই পারল না। সেই বৃষ্টিতে সে ভিজে তো গেলই, তা ছাড়া তার ক্ষিধেও পেয়েছিল খুব। বৃষ্টি থামলে মেঘের ফাঁকে সূর্য উঁকি দেয়, আর সারা আকাশ জুড়ে ফুটে ওঠে এক সুন্দর রামধনু।" পাতায়-পাতায় অসাধারণ সব ছবি চোখ জুড়িয়ে দেয়। বইটির চমৎকার অনুবাদ করেছেন বোলান গঙ্গোপাধ্যায়।

এরকমই আর-একটি বই মনোরমা জাফার লেখা 'ফুলেরা ও আমি' (অনুবাদ সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়)। পাতায়-পাতায় রংবাহারি ফুলের ছবি মন ভরিয়ে দেয়। মোহন, রীতা, সোহন ও জীনৎ— কেউ জমায় ডাকটিকিট, কেউ জমায় নানা রঙের পালক, কেউ-বা জমায় ঝিনুক, শামুক, শাঁখ, আবার কেউ-বা জমায় কত দেশের কতরকমের মুদ্রা— কয়েনস, আমাকেও একটা নতুন কিছু জমাতে হয়... আমার হোক ফুলের সংগ্রহ। ...এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলবার মতো ভারী সুন্দর বই। বড় হরফে পরিষ্কার, ঝকঝকে ছাপা এই রংচঙে বই দুটি অনায়াসে ছোটদের প্রিয় সঙ্গী হতে পারে।

কাজল চক্রবর্তী

জঙ্গল ও মানুষের গল্প

পাহাড়ীবাবার দাঁতাল হাতী
সুধীর করণ
এ.মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
দাম : ১৭ টাকা

আটটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে সুধীর করণের 'পাহাড়ী বাবার দাঁতাল হাতী' একটি উপভোগ্য গল্পগ্রন্থ। এখানে নানা জীবজন্তু, মজাদার মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছে। অরণ্যবাসী মানুষের আদিম বিশ্বাস, গ্রামবাসীদের বিবাদ-বিসম্বাদ, যা দেবতা অপহরণেও প্রণোদিত করে; শৈশবের নানা অলীক বিশ্বাস, ভয়াল অরণ্যের ও জীবজন্তুদের জীবন্ত বর্ণনা বইটিকে আকর্ষক করে তুলেছে। ছোটনাগপুরের দুর্ভেদ্য অরণ্যে 'একটা টাঙি কাঁধে নিয়ে সারা বন কেউ যদি ঘুরে আসতে পারে তা হলে, সে হচ্ছে ঐ গঞ্জন মাহাতো।' তার ওপর বনের দেবতা বাসুৎবীরের ভর হয়, সব জীবজন্তু তার বশ এই আদিম বিশ্বাস সেখানকার মানুষের এবং এই বিশ্বাসের শিকার হয়েছেন আধুনিক মনস্ক নায়ক। বনের মানুষ 'বিরহড়'রা যেদিন ভাত পায়, সেদিন তাদের পরব। আফ্রিকার সেরেংগাটুর অঞ্চলের আবলুশ কাঠ রঙের পনেরো-ষোলো বছরের শিকারি মেগাম্বো টারজানের মতো রূপকথার রাজ্য মাড়িয়ে দাঁতাল হাতি শিকার করে আসে ও বানরদের কথা বুঝতে পারে;

ওর বংশের বৃদ্ধরা একটা অসহায় সময়ে নিজেরাই কুমিরের মুখে আত্মসমর্পণ করে। এই অঞ্চলেই কোনও আদিম যুবকের বিশ্বাস যে সিংহবংশের সিংহী তার সম্পর্কে 'দিদি' বলে ধৃত শিকারও ছেড়ে দেয়। 'অরণ্যপথে দাঁতাল হাতী'-তে বনজঙ্গল জীবন্ত হয়ে গিলতে আসে। দাঁতাল হাতির আক্রমণ ও অসহায় মানুষগুলির তৎকালীন আচরণ, জিপের হর্ন বেজে-যাওয়া গল্পটিকে রুদ্ধশ্বাস করে রেখেছে। 'জোচ্চোর-জুতোচোর'— এ জোচ্চোর রিমঝিমের ওপর পাঠকের রাগের বদলে সহানুভূতিরই উদ্রেক হয়— অদ্ভুত মজার কৌশলে সে বহুদিনের স্বপ্নের জুতোজোড়া পেয়েছে। অভাবী মানুষের কাছে যে ধর্মীয় উপদেশ অর্থহীন, তা লেখক এখানে দেখিয়েছেন।

দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

বড় হয়ে ওঠার কাহিনী

এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সুনীতি মুখোপাধ্যায়
প্রত্যয় প্রকাশনী
দাম : ১২ টাকা

গ্রামের এক দরিদ্র পঙ্গু ছেলের কঠিন কঠোর সাধনায় বিকশিত হয়ে ওঠা থেকে আন্তর্জাতিক উৎসবে অংশ নেওয়া, সংবর্ধনা লাভ, হরবোলা হিসেবে খ্যাতি অর্জন এই গল্পের মূল বিষয়। টানটান গদ্য, সহজ-সরল ভাষা, সুললিত শব্দ প্রয়োগ এবং ছোট ছোট টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে একটি বালকের নিজেকে তৈরি করার কাহিনী।
ঠিকমতো প্রেরণা, উৎসাহ ও সুযোগ পেলে যে-কোনও খঞ্জ মানুষও যে গিরি লঙ্ঘন করতে পারে তারই ইঙ্গিত এ-গ্রন্থের পাতায়-পাতায়।

সিদ্ধার্থ সিংহ

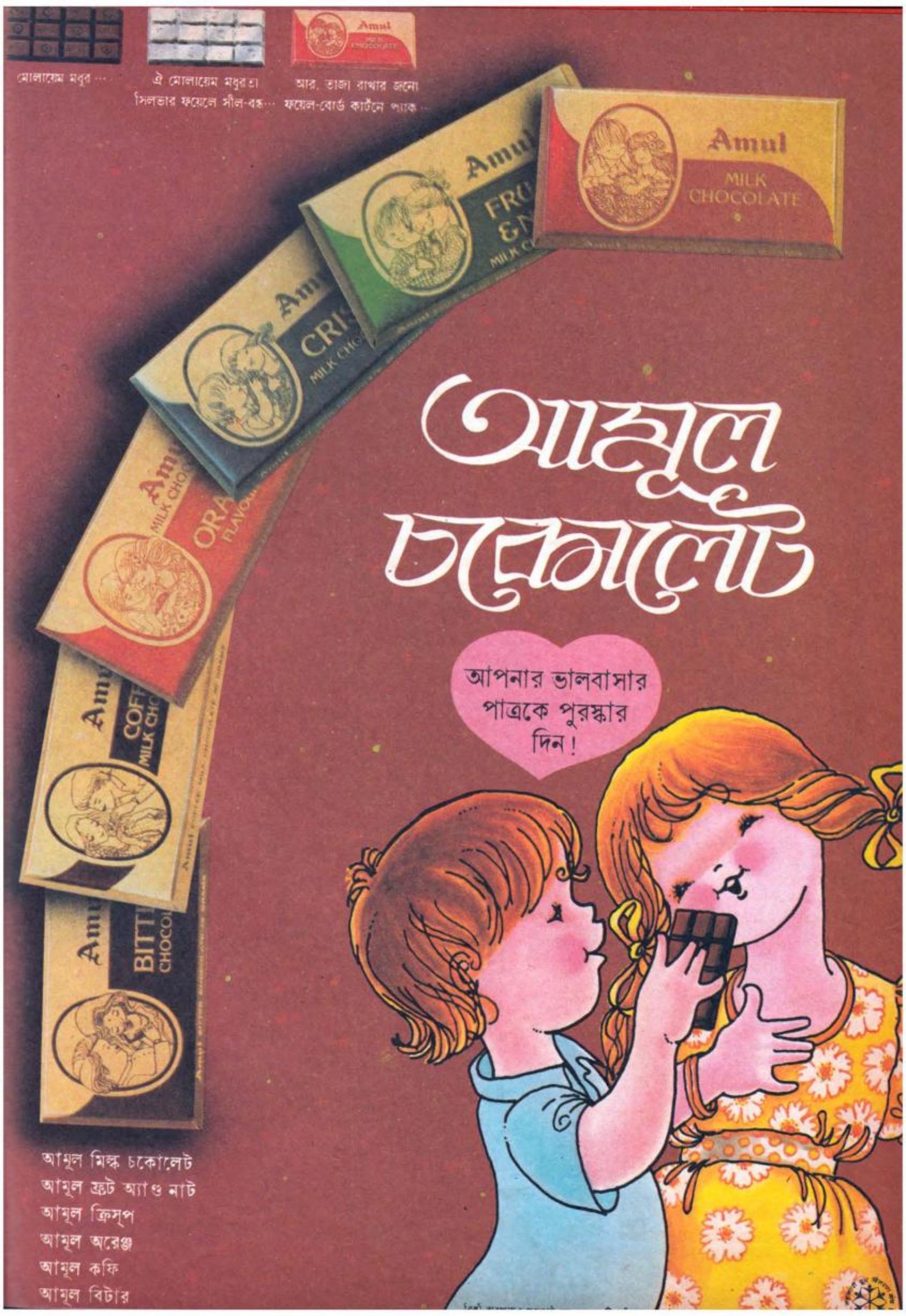
মোলায়েম মধুর ···
ঐ মোলায়েম মধুরতা সিলভার ফয়েলে সীল-বন্ধ···
আর, তাজা রাখার জন্যে ফয়েল-বোর্ড কার্টনে প্যাক···
Amul
MILK CHOCOLATE
আমূলে চকোলেট
আপনার ভালবাসার পাত্রকে পুরস্কার দিন!
আমূল মিল্ক চকোলেট
আমূল ফ্রুট অ্যাণ্ড নাট
আমূল ক্রিস্প
আমূল অরেঞ্জ
আমূল কফি
আমূল বিটার

যখন তরুণ হৃদয় হয় স্পন্দিত,
মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত
ট্রেন্ডীর সময় পলেপলে হয় ছন্দিত
NEW
ALLWYN
TRENDY
QUARTZ
অলউইন ট্রেণ্ডী কোয়ার্টজ
ম জ বু ত আ র হা ল্কা
জ ল থে· কে সু র ক্ষি ত
ন্যা য্য দা ম যু ক্ত
Time
ALLWYN
পুরুষদের মডেল : টা. ৩৩২ । বার ও তারিখযুক্ত : টা. ৩৭৩ ।
মহিলাদের মডেল : টা. ৩১৯ । আলাদা রঙবেরঙের স্ট্র্যাপ -
প্রতিটি টা. ১৩.২০ । স্থানীয় কর আলাদা ।